হরিশংকর জলদাস

আমি মৃণালিনী নই

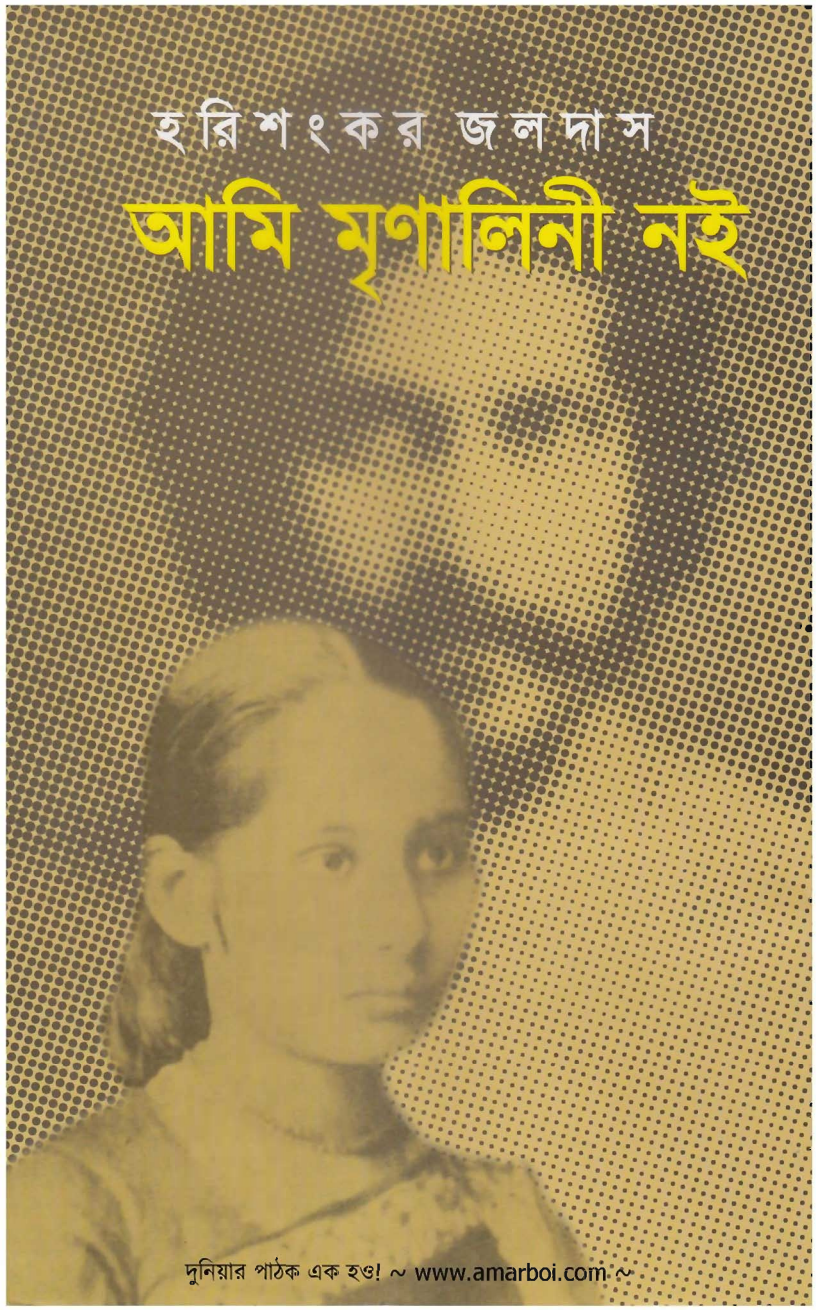

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনীর আত্মকথনের আশ্রয়ে তুলে ধরেছেন এ সময়ের কথাশিল্পী হরিশংকর জলদাস। পড়তে গিয়ে মনে হবে, উপন্যাস নয়, মৃণালিনীর সত্যিকার আত্মস্মৃতি এটি। সবলতা-দুর্বলতায় মেশানো রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা পর্ব শুধু নয়, ভবতারিণী থেকে মৃণালিনীতে পরিণত হওয়া এক নারীর জীবনের চাওয়া-পাওয়া, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-সংক্ষোভও উঠে এসেছে কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসের এই উপন্যাসের পরতে পরতে। সহজ-সরল অথচ গভীর আগ্রহসঞ্চারী তাঁর কাহিনির বুননভঙ্গি।

ISBN 978 984 90660 0 2
9 789849 066002
Taka 300.00

আমি মৃণালিনী নই হরিশংকর জলদাস

প্রথমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনীর আত্মকথনের ভঙ্গিতে লেখা এই উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিয়ের রাত থেকে শুরু করে নিজের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্বামী রবিবাবুর সংগোপন জীবনের নানা কথা অকপটে তুলে ধরেছেন মৃণালিনী। সবলতা-দুর্বলতায় মেশা রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক দীর্ঘ অধ্যায় আটপৌরে ভাষায় উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। পাশাপাশি উঠে এসেছে ভবতারিণী থেকে মৃণালিনীতে পরিণত হওয়া রবি ঠাকুরের সহধর্মিণীর চাওয়া-পাওয়া, পূর্ণতা-অপূর্ণতা এবং তাঁর নারীজীবনের হাহাকার-দীর্ণতার কথাও। এই উপন্যাস আমাদের কথাসাহিত্যের এক মাইলফলক-স্বরূপ সাহিত্যকৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিকৃতি : রাশেদ মাহমুদ

হরিশংকর জলদাস

জন্ম ১২ অক্টোবর ১৯৫৫, চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেপল্লিতে। জীবনের প্রায় মধ্যাহ্নে লিখতে বসা। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *জলপুত্র, দহনকাল, কসবি, রামগোলাম, হৃদয়নদী* ও *মোহনা*। দুটো ছোটগল্পের বই *জলদাসীর গল্প* ও *লুচ্চা*। বাংলা একাডেমি থেকে বেরিয়েছে তাঁর ডক্টরাল থিসিস *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন*। অন্যান্য গদ্যগ্রন্থ *কৈবর্ত কথা, নিজের সঙ্গে দেখা, জীবনানন্দ ও তাঁর কাল, লোকবাদক বিনয়বাঁশী*। হরিশংকরের কথাসাহিত্যে চরিত্ররা প্রান্তজন—জেলে, বারাঙ্গনা, মেথর ও কোটনা। সাহিত্যকর্মের জন্য পেয়েছেন 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার', 'প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার', 'সিটি আনন্দ আলো পুরস্কার' ও 'মানবাধিকার সম্মাননা পদক'। কথাসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন ২০১২ সালে।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মৃণালিনী নই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মৃণালিনী নই

হরিশংকর জলদাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমা প্রকাশন

আমি মৃণালিনী নই
গ্রন্থস্বত্ব : হরিশংকর জলদাস
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০১৪
মাঘ ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৩০০ টাকা

Aami Mrinalini Nai
A Novel in Bangla by Harishankar Jaladas
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 300 only

ISBN 978 984 90660 0 2

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

প্রত্যুষ শংকর
যে আমার উত্তরাধিকারী—
মননের এবং রক্তের,
ঐতিহ্যের এবং সত্তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

যে রাতে বউ হয়ে ঠাকুরবাড়িতে এলাম, আমার বয়স নয় বছর নয় মাস। রবিবাবুর বাইশ বছর সাত মাস। অসাধারণ রূপবান সে। লম্বাটে মুখ। নাকের নিচে সরু গোঁফ। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথিকাটা। কানের পাশে ঈষৎ বাঁকানো চুল। এসবের মধ্যে মায়াময় দুটো চোখ। বিয়ের আসরে তো জড়োসড়ো অবস্থা আমার। কত আত্মীয়স্বজন আমাদের চারপাশে! সবাইকে চিনি না, বাপের বাড়ির দু-চারজন ছাড়া। সে রাতে আমার খিদেও পেয়েছিল বেশ। কিন্তু খিদের কথাটি মুখ ফুটে বলবার উপায় নেই। ঠাকুরবাড়ির পরির মতন মেয়েগুলো আমাকে ঘিরে রেখেছিলেন। খিদের কথা তাঁদের বলি কী করে? এঁদের মাঝখানে আমার খুব ভয় ভয় করছিল।

মা বলেছিল, 'ভব, অনেক বড় পরিবারে তোর বিয়ে হচ্ছে রে মা। তাঁদের হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। ক-ত ধনদৌলত তাঁদের। ও বাড়ির মানুষগুলো? পুরুষগুলো কার্তিক ঠাকুরের মতো সুন্দর। আর মেয়েরা? মেয়েরা একেকজন স্বর্গের অপ্সরী। সবাই শিক্ষিত। কী লেখাপড়া তাঁদের! ওঁদের সামনে তুই কিছুই না, মা। সাবধানে কথা বলিস মা ওঁদের সঙ্গে। কোন সময় আবার কী ভুল ধরে বসেন।'

বিয়ের আসরে মায়ের ওসব কথা বারবার মনে পড়ছিল আমার। আমার বড় লজ্জাও লাগছিল তখন। খিদেকে ছাপিয়ে লজ্জা আমাকে চুরচুর করছিল। লজ্জায় ভেঙেচুরে যাচ্ছিলাম আমি।

একসময় রবিবাবুর চারদিকে সাতপাক ঘোরানো হলো আমাকে। সাতপাক ঘোরানোর ব্যাপারটি যে আসলে কী, আমি জানতাম না। ঘুরতে ঘুরতে এক মহিলার কণ্ঠ ভেসে এল আমার কানে, 'পাঁচ পাক হয়েছে, আর দুই পাক বাকি। সাতপাক হলেই তো বিয়ে সিদ্ধ হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই সময় আর একটা বয়স্ক গলা শুনতে পেয়েছিলাম। চাপা অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, 'কী রকম কালাকোলা একটা বউ ঠিক করলেন বড়ঠাকুর মশাই! কোথায় আমাদের রবি আর কোথায় কী নাম যেন বউটির...।'

উলুধ্বনির মধ্যে মহিলাটির কণ্ঠ হারিয়ে গেল। তাঁর শেষের কথাটি শুনতে পাইনি আমি। কিন্তু মহিলাটির মন্তব্য আমার বুকে দেগে বসেছিল সে রাতে। আমার সাধারণ মানের চেহারার বিবরণকে ছাপিয়ে বারবার আমার কল্পনার চোখে দিব্যকান্তি রবিবাবুর চেহারা ভেসে উঠতে লাগল। আমার কৌতূহলী মন বড় আকুলিবিকুলি করছিল সে সময়। আহা! রবিবাবুকে যদি একবার দেখতে পেতাম! কিন্তু দেখব কী করে? আমার যে লম্বা ঘোমটা। বিয়ের আসরে তো আর ঘোমটা তুলে স্বামীকে দেখা যায় না। তক্কে তক্কে ছিলাম আমি। যদি সুযোগ আসে, তাহলে এক পলকের জন্য হলেও আমি রবিবাবুকে দেখে নেব। সে সুযোগ আসতে খুব দেরি হলো না।

সাতপাক ঘোরানোর পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো দালানে। ওখানকার একটা বড় কক্ষে কনে সম্প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সম্প্রদানের কাজ শেষ হলে পাশের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে। অনেক নারী তখন সে ঘরে। সবাই নানা রকম মন্তব্য করছেন। কারও কথা বুঝছি, কারও কথা বুঝছি না। কী সুন্দর নরম কণ্ঠ তাঁদের! আমরা গাঁয়ে যে উচ্চারণে কথা বলি, এঁদের উচ্চারণ সেরকম নয়। অনেক শব্দের মানে আমি বুঝতে পারছিলাম না।

শুরু হলো ভাঁড়কুলো খেলা। ভাঁড়ের চালগুলো চালা আর ভরার নামই ভাঁড়কুলো খেলা। ওই খেলা খেলতে গিয়েই রবিবাবু দুষ্টুমি শুরু করল। ভাঁড়কুলো খেলা না খেলে ভাঁড়গুলো উপুড় করে দিতে লাগল রবিবাবু।

তার এরকম পাগলামো দেখে একজন মহিলা বলে উঠলেন, 'ও কী করিস, ও কী করছিস, রবি? খেলা ছেড়ে ভাঁড়গুলোই উপুড় করে দিচ্ছিস যে তুই? ভাঁড়গুলো উল্টেপাল্টে গেল যে!' উনি যে ছোট কাকিমা, ওঁর নাম যে ত্রিপুরাসুন্দরী, পরে তা জেনেছিলাম আমি।

কাকিমার অভিযোগ শুনে কী রকম যেন ভেজা ভেজা গলায় রবিবাবু বলেছিল, 'জানো না, কাকিমা—সব যে ওলটপালট হয়ে গেল। সবকিছুই যখন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, ভাঁড়গুলো আর সোজা রেখে লাভ কী! তাই ওগুলোকে এলোমেলো করে দিলাম।'

রবিবাবুর এই কথার মানে সে রাতে বুঝতে পারিনি আমি। হেঁয়ালি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেঁয়ালি লেগেছিল ওসব কথা। সে রাতের কথাগুলোর মানে আমি একদিন বুঝতে পেরেছিলাম। তবে তা বিয়ের চার মাস পরে। নতুন বউঠান কাদম্বরীর আত্মহত্যার পরে।

সে রাতে রবিবাবুর কথার মর্মার্থ আমি না বুঝলেও ছোট কাকিমা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী। বুঝতে পেরেছিলেন বলে রবিবাবুর মন্তব্যের পিঠে আর কথা জুড়ে দেননি। তিনি দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টেছিলেন। কাকিমা বলে উঠেছিলেন, 'তুই একটা গান কর, রবি।'

'আমি!' কৃত্রিম বিস্মিত কণ্ঠে রবিছোট কাকিমাকে বলেছিল।

'হ্যাঁ, তুই-ই তো গাইবি। তোর মতন এমন গাইয়ে থাকতে আর কে গাইবে বল?' নরম গলায় কথাগুলো বলেছিলেন ছোট কাকিমা।

কী আশ্চর্য! একটুও সংকোচ বোধ করল না রবিবাবু! আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গান শুরু করল। গানের কথাগুলো এই এত দিন পরেও আমার স্পষ্ট মনে আছে। ছোটবেলায় লেখাপড়া করিনি তেমন। দূরত্বের কারণে স্কুলের পড়াশোনা খুব বেশিদূর এগোয়নি আমার। পড়াশোনা যা-ই হোক, স্মৃতিশক্তি ছিল আমার প্রখর। যা একবার শুনতাম, ভুলতাম না। রবিবাবুর গাওয়া গানের কলি এই এত বছর পরেও আমি ভুলিনি। রবিবাবু গেয়ে উঠেছিল—

আ মরি লাবণ্যময়ী,
কে ও স্থির সৌদামিনী
পূর্ণিমা-জোছনা দিয়ে
এইটুকু মার্জিত বদনখানি।

গাওয়া শেষ হতে না হতেই ভিড় থেকে কে যেন বলে উঠলেন, 'ও রকম ম্যাদামারা গান বাসরঘরে চলবে না। রসে ভরা গান চাই।'

সবাই চকিতে তাকাল বক্তার দিকে। মলিন বসন, অন্তত ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের তুলনায়। রংটাও কালোর দিকে। নারীটিকে কেউ চিনতে পারলেন না। অচেনা মহিলা ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকল কী করে? জিজ্ঞাসু চোখে এ ওর দিকে, ও এর দিকে তাকাতে লাগলেন। ছোট কাকিমা কী যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন মলিন বসনের মহিলাটিকে, ওই সময় বাড়ির পুরোনো ঝি বলে উঠল, 'উনি কন্যাপক্ষের আত্মীয়া। কন্যাপক্ষের সঙ্গে এসেছেন যশোর থেকে।'

'ও' বলে ছোট কাকিমা থেমে গেলেন।

'ম্যাদামারা মানে কী?' প্রশ্নটি কানে ভেসে এসেছিল আমার। প্রশ্নটি কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন, ঘোমটার আড়াল থেকে বুঝতে পারলাম না।

সমস্বরে নারীরা বলে উঠলেন, 'ঠিকই তো, ম্যাদামারা মানে কী?'

প্রশ্ন শুনে আমার আত্মীয়া ভ্যাবাচেকা খেয়ে মাথা নিচু করে ছিলেন। নইলে আমার কানে এ কথাটি ভেসে আসত না : 'মাথা নিচু করে থাকলে চলবে না। ম্যাদামারা শব্দটির অর্থ বলতে হবে। অবোধ্য শব্দ ব্যবহার করে আমাদের রবিকে অপমান করা চলবে না।'

কথাটির অর্থ আমি জানি। কিন্তু এই মুহূর্তে বলার উপায় নেই। একে তো ঘোমটা টানা, তার ওপর নতুন বউ। আমি ঘামতে শুরু করলাম। আমার সামনে আমার আত্মীয়া অপ্রস্তুত অবস্থায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। কী করা, কী করা!

রবিবাবুই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। রবিবাবু বলল, 'আমি জানি কথাটির অর্থ।'

'তা হলে বল, বল কথাটির মানে কী?'

'শব্দটির একটা গূঢ়ার্থ আছে। সবার সামনে তা বলা যাবে না। সবার সামনে বলা যাবে, এরকম একটা অর্থও আছে শব্দটির। তা বলছি।' সমবেত মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে রবিবাবু বলেছিল।

বউদি শ্রেণীর একজন বলে উঠলেন, 'গূঢ়ার্থটিই বল। আমরা শুনতে চাই।'

'না বউদি, এখানে নয়। তোমাকে একান্তে বলব। ম্যাদামারা শব্দটির প্রচলিত অর্থটিই বলি, এর অর্থ তেজোহীন, মানে রসকষহীন।' বলল রবিবাবু।

আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

ওই বউদি আবার বলে উঠলেন, 'তাহলে রসের গানই গাও একটা।'

'গাইব?' অনুমতি চাওয়া কণ্ঠ রবিবাবুর।

সবাই বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, রসের গান শোনাও।'

রবিবাবু গাইতে শুরু করল—

হৃদয়কাননে ফুল ফোটাও
আধো নয়নে সখী চাও চাও।
ধীরি ধীরি আমার প্রাণে এসো হে
মধুর হাসিয়ে ভালোবেসে হে।

এ সময় বাঁ হাত দিয়ে ঘোমটাটা একটু আলগা করলাম। এরকম মোহন কণ্ঠ আমি আগে কখনো শুনিনি। বালিকা বয়সের সকল লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে আমি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকলাম রবিবাবুর দিকে। এক মুহূর্তে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণ অবয়ব আমার হৃদয়ে আঁকা হয়ে গেল।

ওই সময় হঠাৎ করে কেন জানি আমার নিজের চেহারার কথা মনে পড়ল। কালাকোলা টিনটিনে আমি। দেখতে মোটেই ভালো না। অন্তত ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য বউয়ের তুলনায়। এ বাড়িতে, মানে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল আমাকে সকালবেলায়। তখন থেকে এ বাড়ির অনেক নারীকে দেখেছি আমি। এঁদের অনেকে যে এ বাড়ির বউ, তা তাঁদের সাজসজ্জা দেখেই বুঝেছি। ওই দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এ বাড়ির বউদের রূপের পাশে আমি শাঁকচুন্নি ছাড়া আর কিছুই নই। এ বাড়িতে আসার আগেই শুনেছি, ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বউরা অপ্সরীর মতন দেখতে। তাঁরা নাকি দুধ দিয়ে স্নান করেন, ক্ষীর সর ছানা বেটে রূপটান মাখেন। তাঁদের ক-ত ক-ত গহনা! ক-ত বিচিত্র পোশাক-আশাক!

আর আমি রূপহীন এক বালিকা। ক্ষীণকায়। বৈচিত্র্যহীন চোখ। মাজা রং। মাথার চুল উস্কখুস্ক। ছোটবেলা থেকে মা অবিরাম যত্ন করে গেছে চুলের। মাথায় নারকেল তেল ঘষতে ঘষতে বলত, 'চুল হলো মেয়েদের অঙ্গের ভূষণ। ঘন কালো দীর্ঘ চুল মেয়েদের সৌন্দর্য বাড়ায়। তেল ঘষে চুল বেঁধে দিচ্ছি আমি। বেণি খুলিস না।'

মায়ের এই উপদেশ শুনতে হবে বলে শুনতাম আমি। তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে দুরন্তপনা বেড়ে যেত আমার। সঙ্গীদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে বেণি বড় যন্ত্রণা দিত আমাকে। বারবার মুখে এসে লাগত। এক টানে বেণি খুলে ফেলতাম আমি। ঘরে যখন ফিরতাম—এলোমেলো চুল আমার, ধুলায় ধূসরিত।

মা বলত, 'এত উপদেশ তোর কানে গেল না, ভব? মাথাটাকে তো কাকের বাসা বানিয়েছিস। যেদিন কাকেরা ওই বাসায় ডিম পাড়বে, সেদিন বুঝবি।'

মায়ের শেষের কথায় আমি ভয় পেয়ে যেতাম। সত্যিই কাকেরা আমার মাথায় ডিম পারবে নাকি! মাকে জিজ্ঞেস করতাম, 'মা, সত্যি সত্যি কাকে আমার মাথায় ডিম পাড়বে?'

মা আমার প্রশ্নের কোনো জবাব দিত না। স্মিত হেসে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যেত।

গান একসময় শেষ হলো। বিবাহ-উত্তর মেয়েলি ব্যাপারগুলো ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এল। খিদেটা প্রকট হয়ে উঠল আমার। প্রায় সারা দিনের এবং অর্ধরাত্রির ক্লান্তি আমার শরীর-মনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ওই সময় আমার মনে হলো, বিয়ের রাতের আনুষ্ঠানিকতা তো শেষ। এবার বুঝি খেতে পাব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার বুঝি একটু শুতে পারব। দুচোখ ভরে ঘুম আসছিল তখন আমার।

দূরসম্পর্কের বউদি এবার বলে উঠলেন, 'বউকে এবার বাসরঘরে নিয়ে যাও।'

ত্রিপুরাসুন্দরী বললেন, 'তা কী করে হয়?'

বউদি বললেন, 'বিয়ে হয়েছে রবির, বাসররাত হবে না?'

জ্ঞানদা বউদি বললেন, 'বাসররাত এখন নয়। ছোট বউ এখনো নাবালিকা। ও উপযুক্ত হয়ে উঠুক। তারপর ফুলশয্যা। এটাই এ বাড়ির নিয়ম।'

অনেক দিন পর আমি জানতে পেরেছি, আমার ভাশুরদের প্রায় সকলের বালিকার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। কারও সাত, কারও নয়, কারও বা দশ বছর বয়স। বালিকাবধূরা শারীরিকভাবে অসমর্থ। তাই অক্ষম শরীরে কোনো বধূকে ঋতুমতী হবার আগে তার স্বামীর সঙ্গে রাত যাপন করতে দেওয়া হয়নি। আমার প্রাতঃস্মরণীয় শাশুড়িমাতা এই নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। বিয়ের আসর থেকেই তিনি তাঁর বালিকা পুত্রবধূদের নিজের কাছে নিয়ে যেতেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে নববধূরা জীবন ও দেহ সম্পর্কে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতেন। প্রথমবার ঋতুমতী হবার পর ওই বধূ স্বামী-সম্মিলনে সক্ষম হয়ে উঠেছেন বলে আমার শাশুড়িমাতা বিশ্বাস করতেন। এবং সেই মতে দ্বিরাগমন বিবাহ, মানে ফুলশয্যার আয়োজন করা হতো। এতে বধূরা তিক্ত অভিজ্ঞতা মানে দুঃসহ শারীরিক বেদনা থেকে রেহাই পেতেন।

ছয়-সাত বছর বয়সে নাকি আমার শাশুড়িমাতার বিয়ে হয়েছিল। তাঁর সময়ে হয়তো ঠাকুরবাড়ির এরকম নিয়ম ছিল না। নিজের জীবনের বেদনাময় অভিজ্ঞতার কারণেই হয়তো তিনি ঠাকুরবাড়িতে এই নিয়মের প্রচলন করেছিলেন।

কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা হলো না। হলো না—আমার শাশুড়িমাতা আমার বিয়ের এগারো বছর আগে মারা গেছেন বলে, হলো না—রবিবাবুর অনড় ইচ্ছের কারণে। রবিবাবু চাইছিল ওই রাতেই ফুলশয্যা হোক। তাই তার প্রবল ইচ্ছের কাছে জ্ঞানদা বউদিকে হার মানতে হলো।

সে রাতে জ্ঞানদা বউদির কথা শুনে রবিবাবু নিচু স্বরে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল, 'সব সময় একই আইন চলে না, বউদি। ব্যতিক্রম বলেও একটা কথা আছে। আজকে সেই ব্যতিক্রমটা হোক।'

বউদি স্তম্ভিত চোখে হয়তো রবিবাবুর দিকে তাকিয়েছিলেন। অনূঢ়ারা তখন ওই কক্ষ ছেড়ে চলে গেছে। এখন আমাদের চারদিকে বয়স্ক বউদিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং মশকরামনস্ক নারীরা।

রবিবাবু কণ্ঠকে খাদে নামিয়ে বলেছিল, 'রাগ করলে, বউদি? তোমার বিস্ময়মাখা রাগী চোখ কিন্তু তা-ই বলছে।'

জ্ঞানদা বউদি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। চোখে-মুখে শান্তভাব ফিরিয়ে আনলেন তিনি। ওদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে আমার ঘোমটা তখন কপাল পর্যন্ত উঠে এসেছে। আমার অবুঝ চোখ দুটো তখন রবিবাবু থেকে জ্ঞানদা বউদি আবার জ্ঞানদা বউদি থেকে রবিবাবুতে ঘুরছে।

জ্ঞানদা বউদি আমার ওপর এক পলক করুণ দৃষ্টি ফেললেন। তারপর মুখে কৃত্রিম হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'তা-ই হোক তবে।' তারপর সমবেত নারীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা রবির ফুলশয্যার আয়োজন করো।'

এরপর আমাকে বাসরঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফুলশয্যার আগে অবশ্য আমাকে খাবার দেওয়া হয়েছিল।

দুই

আমাদের বিয়ের রাতে রবিবাবুর জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মারা গিয়েছিলেন। সৌদামিনী দেবী শ্বশুরঠাকুরের পঞ্চম সন্তান; কিন্তু কন্যাদের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে সৌদামিনী দিদি শ্বশুরঠাকুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন না। তাঁর জন্মের আগে তাঁদের আরেকটি কন্যা জন্মেছিলেন, শৈশবেই মারা যান তিনি। এ জন্য সৌদামিনী দিদি ঠাকুর-পরিবারে জ্যেষ্ঠ কন্যাসন্তানের মর্যাদা পেয়েছিলেন। নয় বছর বয়সে দিদির বিয়ে হয়। প্রথামতো ঘরজামাই ছিলেন সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। বড়বাজারের বিখ্যাত গাঙ্গুলি পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। কুলীনের সন্তানকে ফুসলে বা চুরি করে এনে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হতো। সারদা দাদাবাবুর বেলায় এরকম কিছু হয়েছিল কি না, কে জানে? এরকম হবার সম্ভাবনাই বেশি। কুলীন পরিবারের সারদাপ্রসাদের সঙ্গে পিরালি কন্যার স্বাভাবিক বিয়ে সম্ভব ছিল না। তবে অনেক পরে এ বিয়ে সম্পর্কে আমি ভিন্ন একটি কথাও শুনেছিলাম। সারদাপ্রসাদের বাবা যাদবচন্দ্র ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অনন্যোপায় হয়ে ঋণমুক্তির আশায় ধনাঢ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় মেয়ের সঙ্গে নিজের বড় ছেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারদাপ্রসাদের বিয়ে দিয়েছিলেন। রবিবাবুর জন্মেরও পাঁচ বছর আগে বড়দির সঙ্গে দাদাবাবুর বিয়ে হয়েছিল।

ঘটনা যা-ই হোক, বিয়ের পর সারদাপ্রসাদকে কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ঘরজামাই হতে হয়েছিল। শ্বশুরঠাকুরের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। খুব বিশ্বাস করতেন তাঁকে শ্বশুরঠাকুর। শ্বশুরঠাকুর দাদাবাবুকে ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বৈষয়িক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একবার তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে নিতেন শ্বশুরঠাকুর। তিনি সংগীতরসিক ছিলেন। ভালো সেতার বাজাতে জানতেন নাকি তিনি। রবিবাবুর মুখে শুনেছি, দাদাবাবুর গৃহের সাংগীতিক পরিমণ্ডল খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার ওপর। রবিবাবু ভীষণ পছন্দ করত দাদাবাবুকে। এরকম প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ রবিবাবু এবং গোটা ঠাকুর-পরিবারকে বেদনার্ত করে তুলেছিল।

জমিদারির কাজ দেখতে শিলাইদহ গিয়েছিলেন তিনি, সেখানেই আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুর রাতে বিয়েবাড়িতে তাঁর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছায়নি। পরদিন পৌঁছালে গভীর শোকের কারণে আমাদের বিবাহোত্তর সমস্ত আনন্দানুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

এ ধরনের অবস্থায় নববধূর ওপর সকল দোষ এসে বর্তায়। কুলক্ষণা বলে নববধূটির দুর্নাম রটে। শ্বশুরবাড়িতে তাকে অপদস্থ হতে হয়। কিন্তু আমার বেলায় সেরকম কিছুই হয়নি, অপয়া বলেও কেউ কানাঘুষা করেনি। আমার বিয়ের অনেক আগে থেকেই ঠাকুরবাড়ি এসব কুসংস্কার বা অমানবিকতার চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

সময় যেতে লাগল। সময়ান্তরে শোক কমে আসে। ঠাকুরবাড়িও ধীরে ধীরে দাদাবাবুর মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে লাগল। একরাতে, খাবারের পাট চুকে যাবার পর জ্ঞানদা বউদি আমাকে শোয়ার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। যাবার আগে ঘরে উঁকি দিয়ে বিছানায় আধশোয়া রবিবাবুকে বললেন, 'পৌঁছে দিয়ে গেলাম ভবকে। অযত্ন কোরো না।'

'অযত্ন! অযত্ন করব কোন সাহসে!' বলে রবিবাবু বলতে লাগল—

ধরাতলে দীনতম ঘরে, যদি জন্মে প্রেয়সী আমার,
নদীতীরে কোন এক প্রচ্ছন্ন কুটিরে অশ্বত্থ ছায়ায়,
সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারি লাগিয়া যতনে।

বউদি মুচকি হেসে গৃহান্তরে গেলেন। রবিবাবু এসে কপাটে হুড়কো দিল। আমার হাত ধরে বিছানার ধারে নিয়ে গেল। দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম ভব, মানে ভবতারিণী, তাই না?'

আমি একটু চমকে তার দিকে তাকালাম। রবিবাবুর তো আমার নাম না জানার কথা নয়! বিয়ের পর প্রায় কুড়ি দিন কেটে গেল। এত দিন পর এরকম অভিনব প্রশ্ন কেন? তার এরকম প্রশ্নের কী উত্তর দেব আমি? আমি চুপ করে থাকলাম।

রবিবাবু আমার উত্তরের অপেক্ষা করল বলে মনে হলো না। আমার দিকে মায়াময় চোখ তুলে বলল, 'আজ থেকে তুমি ভবতারিণী নও। তুমি আমার মৃণালিনী। আজকের পর এ বাড়ি থেকে তোমার ভবতারিণী নাম ঘুচে গেল। সবার কাছে তুমি মৃণালিনী নামে পরিচয় দেবে।'

আমি অবাক চোখে রবিবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মুখে কিছু বলবার সাহস হলো না। রবিবাবু ক-ত বড় কবি! এ ক'দিনে দেখেছি—বাড়ির সবাই তাকে মান্য করে। এরকম একজন মানুষের কথার কী উত্তর দেব আমি? আমার মনে একটু কাঁপন লাগল বলে মনে হলো। সেই বালিকা বয়সেও আমার মন বলে উঠল—এ কী বলছে রবিবাবু! ভবতারিণী না, মৃণালিনী! এ বাড়িতে আজ থেকে আমার পরিচয় হবে মৃণালিনী নামে! তাহলে আমার মা-বাবার দেওয়া নামের কী হবে? কত আদর করে তারা আমার নাম রেখেছে ভবতারিণী। মা মধুর কণ্ঠে ডেকেছে—ভব, ভবতারিণী। বাবা যখন কালেভদ্রে আমাদের গ্রামের বাড়ি ফুলতলিতে যেত, আমাকে বুকে জড়িয়ে সোহাগে-আদরে আচ্ছন্ন করে ফেলত আর গভীর মমতাভরা কণ্ঠে ডাকত, 'মা ভব, ভবতারিণী আমার। কেমন আছো মা তুমি? মা তোমাকে বকেনি তো?'

আমি বাবার গলা জড়িয়ে ধরতাম আরও নিবিড়ভাবে। আর আজ আমার বাবা-মায়ের সেই ভালোবাসা জড়ানো নামটি কেড়ে নিচ্ছে রবিবাবু! আমার মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শিদের আদরের সম্বোধন ভবতারিণী মৃণালিনী নামের মধ্যে হারিয়ে যাবে!

আমি এই সময় রবিবাবুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম। বলছে, 'তুমি মৃণালিনী শব্দের অর্থ জানো তো?'

কীভাবে জানব আমি মৃণালিনী শব্দের অর্থ? ফুলতলিতে ছিল তো মাত্র একটি পাঠশালা। ওই পাঠশালাতে প্রথম বর্গ পর্যন্ত পড়েছি আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজনিন্দার ভয়ে দূরের পরীক্ষাকেন্দ্রে মা-বাবা আমায় পরীক্ষা দিতে যেতে দেয়নি। আমার পড়াশোনা তো ওই প্রথম বর্গ পর্যন্তই। আমি 'মৃণালিনী' শব্দের অর্থ জানব কী করে?

আমি ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়লাম।

রবিবাবু বললেন, 'অবশ্য এটি সংস্কৃত শব্দ। অর্থ তোমার জানার কথা নয়।' তারপর একটুক্ষণ কী যেন ভাবল সে। তারপর আবার বলল, 'মৃণালিনী শব্দটির অর্থ পদ্ম। পদ্মের সঙ্গে রবির একটা সম্পর্ক আছে। রবি শব্দের অর্থ তো তুমি নিশ্চয়ই জানো?'

আমি নিচু স্বরে বললাম, 'সূর্য'।

'ঠিক। রবি মানে সূর্য। ভোরবেলাকার সূর্যের আলো পদ্মের ওপর পড়লে পদ্ম পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। রবি ছাড়া মৃণালিনী যেমন অপ্রস্ফুটিত থাকে, তেমনি মৃণালিনীবিহীন রবিও অপূর্ণ।' বলে রবিবাবু নিবিড়ভাবে আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিল সে রাতে। রবিবাবুর বুকে স্থান পেয়েও ওই সময় আমার বারবার মনে পড়ছিল রবিবাবুর কথা, আজ থেকে তুমি ভবতারিণী নও। আজ থেকে এ বাড়িতে তোমার ভবতারিণী নাম ঘুচে যাবে। কেন ঘুচে যাবে? কেন আমার পিতৃমাতৃদত্ত নামের অস্তিত্ব থাকবে না আর? কেন আমার পূর্বতন অস্তিত্ব ঠাকুরবাড়ির করাল গ্রাসে হারিয়ে যাবে? সে রাতে এরকম করে হয়তো আমি ভাবিনি, কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা হয়তো এরকমই কিছু ছিল।

বিয়ের মাস খানেক পরে আমার দায়িত্ব নিলেন জ্ঞানদা বউদি। উদ্দেশ্য, মৃণালিনীকে চৌকস করে তোলা, রবির উপযুক্ত করে তোলা। সত্য দাদা আর জ্ঞানদা বউদি তখন ঠাকুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন, থাকেন ২৩৭ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে। সত্যেন্দ্রনাথ দাদা শ্বশুরঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র। অতুলনীয় রূপবান। আইসিএস এই পুত্রের জন্য শ্বশুরঠাকুরের মনে ভালোবাসাময় একটা জায়গা ছিল। ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে যশোরে মেয়ে জ্ঞানদানন্দিনীকে পুত্রবধূ করে এনেছিলেন। সত্য দাদা আইসিএস পাস করার পর বোম্বেতে কার্যভার গ্রহণ করলে ঠাকুর-পরিবারে বিলেতের ছোঁয়া লাগল, সর্বভারতীয় ছোঁয়া লাগল। অন্তঃপুরের জ্ঞানদানন্দিনীর গায়েও সর্বভারতীয় আধুনিকতার হাওয়া এসে লাগল। এই হাওয়া শ্বশুরঠাকুরের পছন্দ নয়। ঠাকুর-পরিবারের রক্ষণশীলতার প্রাচীরে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরুক, এটা কখনো তিনি চাননি। তাঁর কাছে সমাজসংস্কারের চেয়ে ধর্মসংস্কার অনেক বড়। জ্ঞানদা বউদি স্বাধীনচেতা। তিনি স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে চাইতেন। শ্বশুরঠাকুর জ্ঞানদা বউদির এই ব্যাপারটিকে সহজভাবে নেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নিয়ে উভয় পক্ষের মন-কষাকষি। তবে মনোমালিন্যের এই ব্যাপারটিকে প্রকাশ্যে আনতে রাজি ছিলেন না জ্ঞানদা বউদি আর সত্য দাদা। অনেকটা পিতার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁরা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছেড়েছিলেন। লোয়ার সার্কুলার রোডে থাকা শুরু করেছিলেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির মর্যাদার বিষয়ে এই দম্পতি খুব সচেতন ছিলেন। তাই বিয়ের মতো অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করতেন তাঁরা। রবিবাবুর বিয়ের ব্যাপারটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে জ্ঞানদা বউদির কাছে তার বিয়ের ব্যাপারটি একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল। বিয়ের প্রথম দিকে বিষয়টি আমি ভালো করে বুঝে উঠতে পারিনি। কাদম্বরী বউঠানের মৃত্যুর পর রবিবাবু আর তাঁকে নিয়ে নানা টুকরাটাকরা কথা আমার কানে আসতে লাগল। আমি একটু একটু করে বুঝতে শুরু করলাম। তবে তা অনেক পরের কথা।

জ্ঞানদা বউদি আমার দায়িত্ব নিলেন, মানে আমার আগাপাছতলা বদলে ফেলার দায়িত্ব নিলেন। কী করে চুল বাঁধতে হয়, কী করে শাড়ি পরতে হয়, কী করে ব্লাউজ পরতে হয়—সবকিছু শেখাতে লাগলেন তিনি। ঠাকুরবাড়িতে শাড়ি পরার ঢং আর ব্লাউজের আকৃতিতে পরিবর্তন আনেন এই জ্ঞানদা বউদিই। তাঁরই প্রভাবে আমার কথা বলার ভঙ্গি বদলে যেতে লাগল। উচ্চারণের কায়দা রপ্ত করতে লাগলাম আমি তাঁরই তত্ত্বাবধানে। তাঁরই বাড়িতে আমি একটি দুটি করে ইংরেজি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলাম। গেঁয়ো খোলস ছাড়িয়ে ভবতারিণীর ভেতর থেকে মৃণালিনীকে নির্মাণ করতে না পারা পর্যন্ত বুঝি জ্ঞানদা বউদির মনে শান্তি নেই। দিনরাত তালিম চলে আমার। মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আসি আমি। আসি মানে জ্ঞানদা বউদিই সঙ্গে করে নিয়ে আসেন আমাকে। রবিবাবুর সঙ্গে ওই সময় দেখাসাক্ষাৎ হয় আমার। বউদির তাগাদায় আবার ফিরে যাই সার্কুলার রোডে।

ন-পিসিমার প্রথম কন্যা হিরণ্ময়ীর বিয়ে। গায়েহলুদের অনুষ্ঠানে এসেছি আমরা। দুপুরে ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে মেয়েদের জমায়েত। খাওয়ার পরে প্রদর্শনীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা মিউজিয়ামে প্রদর্শনী চলছে। কলকাতাতে এই প্রথম প্রদর্শনী। বনেদি ঘরের মানুষজন এই প্রদর্শনী দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িও কম কিসে? এ বাড়ির মেয়েরা সেই প্রদর্শনী দেখতে আগ্রহী। শ্বশুরঠাকুর অনুমতি দিয়েছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সেই প্রদর্শনী দেখতে যাওয়ায় আপত্তি নেই তাঁর। সেদিন দুপুরে খেতে খেতে দুটো বেজে গিয়েছিল। জ্ঞানদা বউদি তাগাদা দিচ্ছিলেন, 'চলো চলো, দেরি কোরো না। তৈরি হয়ে নাও তোমরা। গোটা কলকাতার মানুষজন নাকি ভিড় করেছে প্রদর্শনীতে। মিউজিয়াম নাকি উপচে পড়ছে মানুষজনে। দেরি হলে সেই গাদাগাদি ভিড় ঠেলে ঠেলে প্রদর্শনী দেখতে হবে।'

বলতে বলতে আমার ওপর চোখ পড়েছিল বউদির। প্রায় চমকে উঠে বলেছিলেন, 'ও মা, ছোটকে সাজিয়ে দিলে না যে কেউ এখনো! আয় ছোট, তুই আমার সঙ্গে আয়। নিজের হাতে তোকে সাজিয়ে দিই।' বলেই ডান হাতটি ধরে আমাদের শোবার ঘরের দিকে টেনে নিয়ে গেলেন আমাকে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে সাজিয়ে ফেললেন বউদি। বাসন্তী রঙের শাড়ি পরালেন। শাড়ির জমিতে লাল লাল ফুল। জরির কাজ করা পাড়। হাতে-গলায়-কানে স্বর্ণের গহনা। আমার এসব জবরজং পোশাক-আশাকে অস্বস্তি লাগছিল। অল্পবয়স আমার, ক্ষীণকায়। কেমন বোঝার মতো লাগছিল অলংকার। আমি উসখুসে গলায় বললাম, 'ভারী ভারী লাগছে।'

'ভারী লাগলেও পরতে হবে। মহর্ষিবাড়ির বউ তুই, আমাদের সবার প্রিয় রবির বউ। তা ছাড়া নতুন বিয়ে হয়েছে তোর। এই প্রথম তোকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছি। কলকাতায় খোঁটা দেবার লোকের অভাব নেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে তোকে। কোনো কিছু কমতি দেখলে নানা কথা ছড়াবে। এ সময় তুই অলংকার পরবি না তো কে পরবে?'

আমি বুঝলাম অলংকার পরার গুরুত্ব কোথায়? কলকাতার অন্যান্য বনেদি পরিবারকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্যই আমাকে মূলত জবরজং শাড়ি আর অলংকার পরানো।

চুল বেণি করে হলুদ ফিতে দিয়ে বাঁধলেন তিনি। সেই বেণি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মস্ত বড় খোঁপা করলেন। সাজানো শেষে আমাকে নিয়ে গেলেন মেয়েমহলে। সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দেখো তো তোমরা। মৃণালিনীকে কেমন লাগছে বলো তোমরা।'

সমস্বরে সবাই বলে উঠলেন, 'চমৎকার, অসাধারণ লাগছে ছোট বউকে।'

ওইসময় কোত্থেকে সেখানে উপস্থিত হলো রবিবাবু। উপস্থিত হয়েই চড়া সুরে গান ধরল, 'হৃদয়কাননে ফুল ফোটাও...।'

জ্ঞানদা বউদি বললেন, 'রবি, দুষ্টুমিটা চাগিয়ে উঠেছে বুঝি!'

রবিবাবু খলবল করে উঠল, 'মেজো বউদি, কেড়ে তো নিয়ে গেছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃণালিনীকে, বুঝলে না তো মৃণালিনী ছাড়া রবির অস্তিত্ব যে টলমল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে, জোছনা বিলায় এখানে-ওখানে, অরণ্যে বাগানে সরোবরে। রবির অভাবে শতদল না ফুটলে সরোবরের কী মূল্য? সরোবরের শোভাই যে মৃণালিনী।'

'বেশ দুষ্টু হয়ে উঠেছ দেখছি। রবি ছেড়ে চাঁদে নজর। স্বার্থ বাগাবার জন্য চাঁদ বানাচ্ছ নিজেকে।' বললেন বউদি।

রবিবাবু বলল, 'বউদি, জানো না, চাঁদের আলো রবির কাছ থেকে ধার করা? চাঁদের জোছনা মানে তো রবির কিরণ। রবি ছাড়া চাঁদ যেমন ম্লান, তেমনি মৃণালিনীও অবিকশিত।'

মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বউদি বললেন, 'মুখে কথা আটকাচ্ছে না, না? মৃণালিনী, মৃণালিনী বলে তড়পাচ্ছ!'

রবিবাবু এবার অনুনয়ের সুরে বলল, 'তোমরা যাও না কেন প্রদর্শনীতে। মৃণালিনী থাকুক। তুমি তো আবার ওকে সার্কুলার রোডের বাড়িতে নিয়ে যাবে।'

'তিন মাসে বেশ পেকে উঠেছ দেখছি। আরে রবি, গড়েপিটে তোমার উপযোগী করে তোলবার জন্যই তো ছোটকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া।' মুখে কৃত্রিম অভিমান ছড়িয়ে জ্ঞানদা বউদি আরও বললেন, 'আমার কী লাভ রে ভাই!'

হেমলতা তাগাদা দেয়, 'আমরা প্রদর্শনীতে যাব না? আপনিই তো বলেছেন, দেরি হলে ঢুকতে অসুবিধে হবে।'

জ্ঞানদা বউদি বললেন, 'চলো, চলো সবাই। এই রবি, সামনে থেকে সরে দাঁড়াও, নইলে মেজদার কাছে নালিশ করব কিন্তু।'

রবিবাবু মুখ কাঁচুমাচু করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। বউদি আমার হাত ধরে সামনের দিকে পা বাড়াতে যাবেন, ঠিক তখনই হেমলতা বলে উঠল, 'নতুন কাকিমা প্রদর্শনীতে যাবেন না, মেজো কাকিমা?'

যাত্রামনস্ক জ্ঞানদা বউদি হেমলতার প্রশ্নটি প্রথমে বুঝতে পারেননি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কথা বলছ, হেম?'

'কেন কাদম্বরী কাকিমা! আমাদের নতুন কাকিমা কাদম্বরী যাবেন না প্রদর্শনীতে?' হেমলতা আবার জিজ্ঞেস করল।

আমাদের বিয়ের প্রায় আট বছর পরে শ্বশুরঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে হয় হেমলতার। রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারের মেয়ে এই হেমলতা। আত্মীয়তাসূত্রে আমাদের বিয়ের অনেক আগে থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেমলতার যাতায়াত ঠাকুরবাড়িতে। জ্ঞানদা বউদি প্রথম থেকেই ভালো চোখে দেখতেন না হেমলতাকে।

প্রশ্ন শুনে হেমলতার দিকে চমকে তাকাল রবিবাবু। তার চোখেমুখে বিচলিত ভাব। চকিতে হেমলতার ওপর থেকে জ্ঞানদা বউদির দিকে চোখ ঘোরাল সে। বউদির চোখ থেকে তখন আগুন ঝরছে। হিংস্রতা আর ঘৃণার মাখামাখি সে চোখে। জ্ঞানদা বউদি একপলক তাকালেন হেমলতার দিকে। তিনি বড় বুদ্ধিমতী। আমার মনে হলো অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'শুনলাম, নতুনের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। অসুস্থ শরীর নিয়ে ও কি প্রদর্শনীতে যেতে পারবে?'

'মেজো কাকি, আমি খাওয়ার আগে তেতলায় তাঁর ঘরে গিয়েছিলাম। মনমরা হয়ে পালঙ্কের ওপর বসে আছেন। শরীর খারাপ কি না জিজ্ঞেস করেছিলাম। চমকে আমার দিকে ফিরে নতুন কাকি বলেছিলেন, কই না তো! আমার শরীর খারাপ হতে যাবে কেন? তাই বলছিলাম, নতুন কাকি আমাদের সঙ্গে গেলে ভালো হতো না? মনমরা ভাবটি কেটে যেত তাঁর।'

রবিবাবুর চোখে চোখ রেখে অস্ফুট স্বরে মেজো বউদি বলেছিলেন, 'না, ভালো হবে না। আমাদের সঙ্গে যাওয়া তার মানাবে না।'

'কেন, কেন মানাবে না, কাকিমা?' নাছোড় গলায় হেমলতা জিজ্ঞেস করল।

চাপা স্বরে প্রায় গর্জন করে বউদি বললেন, 'ওই বাজার সরকারের মেয়েটি আমাদের সঙ্গে না গেলেই মঙ্গল।'

তাঁর এই কথাটি অন্যরা তেমন করে শুনতে পেল না। আমি বউদির খুব কাছাকাছি ছিলাম বলে তাঁর চিবানো গলার কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলাম। তারপর সবাই শুনতে পান মতো করে বউদি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী বলো, রবি? যাবে কাদম্বরী আমাদের সঙ্গে?'

রবিবাবুকে বেশ বিচলিত দেখলাম। মেজো বউদির প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে একবার মেজো বউদির দিকে আবার আমার দিকে তাকাতে লাগল রবিবাবু। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম—পাতলা একটা ব্যঙ্গের হাসি মেজো বউদির চোখেমুখে খেলা করছে। অনেকটা স্বগতকণ্ঠে বউদি আবার বললেন, 'হেথা হতে যাও পুরাতন, হেথা শুরু নতুনের খেলা।'

এ বাড়ির বালিকাবধূ আমি। আমার বয়স দশ বছর পুরাতে যাচ্ছে মাত্র। জ্ঞানগম্যিই বা কত তখন আমার! মেজো বউদির কথা, রবিবাবুর নীরবতা—এসব কিছুরই মর্মোদ্ধার করতে পারছি না আমি। ভালো করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকাতেও পারছি না দুজনের দিকে।

এই সময় ঘরের বাইরে যেতে উদ্যত হলেন বউদি। হেমলতা একগুঁয়ে। বয়স কম বলে তেজ বেশি। যেখানে এ বাড়ির সব বউ-কন্যা যাচ্ছেন, সেখানে কাদম্বরী যাবেন না কেন? জ্ঞানদা বউদি যে নতুন বউঠানের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যে বলছেন, সেটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন মিথ্যে বলছেন, সেটা বুঝতে পারছি না। নতুন বউঠানকে বাজার সরকারের মেয়ে সম্বোধনই বা করলেন কেন মেজো বউদি?

মুখের ওপর কথা বলার অভ্যেস ছিল হেমলতার। দৃঢ়কণ্ঠে সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে নতুন কাকি যাবেন না আমাদের সঙ্গে?'

জ্ঞানদা বউদি কঠোর চোখে হেমলতার দিকে তাকালেন। নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললেন, 'না, নতুন বউ আমাদের সঙ্গে যাবে না।'

'কেন, মেজো কাকি?'

'সব কথা ছোটদের শুনতে নেই।'

হেমলতার জেদ চেপে যায়। ছোট বলে অবহেলা! সে তো এমন ছোট নয় যে বউদির অবহেলার মর্মার্থ বুঝছে না। 'উনি তো এ বাড়ির বউ। প্রদর্শনীতে তাঁরও তো যাবার অধিকার আছে।' বড়দের ভঙ্গিতে বলল হেমলতা।

জ্ঞানদা বউদি এবার নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'চুপ থাকো মেয়ে; বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি! যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। কথা না বাড়িয়ে এসো আমার সঙ্গে।'

'মেজো বউদি, যাক না নতুনদি আমাদের সঙ্গে!' জ্ঞানদা বউদির দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে ওই সময় বলেছিলাম আমি।

মেজো বউদি স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, তাকিয়েই থেকেছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। কী যেন বলতে গিয়ে বলছেন না, আবার বলার কথাটি তাঁর ভেতর খলবল করে উঠছে যেন। সেই খলবলিয়ে ওঠা কথাটির আঘাত তাঁর চোখেমুখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিপুল চেষ্টায় তিনি সেই আঘাতের চিহ্ন মুখাবয়ব থেকে মুছে ফেলতে ব্যস্ত।

জ্ঞানদা বউদির ভেতরের দ্বন্দ্বের ব্যাপারটি আমি সেদিন যে ভালো করে বুঝতে পেরেছিলাম, তা নয়। কিন্তু বালিকা বয়সের ভবতারিণী, গ্রাম থেকে উঠে আসা ভবতারিণী সেদিন কিছু যে বুঝতে পারেনি, তা নয় কিন্তু। সেদিন আমি জ্ঞানদা বউদির চোখেমুখে ক্ষোভ-ক্রোধ দেখেছিলাম, সেদিনের স্মৃতির সঙ্গে রবিবাবুর সঙ্গে এত দিনের দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতাকে মিশিয়ে আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইটুকু বুঝতে পেরেছি—রবিবাবুর সঙ্গে নতুন বউঠানের কোনো একটা গন্ডগুলে ব্যাপার ছিল। সেই ব্যাপারটি ঢাকবার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল রবিবাবুর চোখেমুখে। আর সেই ব্যাপারটিকে জ্ঞানদা বউদি সাংঘাতিক ঘৃণা করতেন। যা হোক, বিষয়টি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করবার বয়স ও অভিজ্ঞতা তখন আমার ছিল না। নতুন বউঠানের প্রদর্শনীতে যাওয়ার প্রস্তাবটি দিয়ে আমি মেজো বউদির দিকে তাকিয়েছিলাম।

বউদি এর মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। খাদে নামা কণ্ঠে বউদি বললেন, 'নতুন এসেছ এ বাড়িতে। গ্রামের মেয়ে তুমি। অনেক বেশি সহজ-সরল। বলতে গেলে এ বাড়ির কিছুই জানো না তুমি। এর বাইরে জৌলুষ, ভেতরটা অনেক জটিল।' তারপর কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। মিষ্টি হেসে আমার হাত ধরে বললেন, 'এ ব্যাপারে তোমার কথা না বলাই ভালো, ছোট।'

এতক্ষণে রবিবাবু কথা বলে উঠল, 'মেজো বউদি যা বলছে, তা মেনে নাও। যাও যাও, প্রদর্শনীতে যাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে তোমাদের।'

আমার মনে হলো বিষয়টি হালকা করার জন্যই রবিবাবু কথাগুলো বলল।

'হ্যাঁ তাই, চলো সবাই।' আদেশের সুরে বললেন বউদি।

এই সময় স্পষ্ট গলায় অনেকটা উদ্যত ভঙ্গিতে হেমলতা বলল, 'আমি কিন্তু যাব না। নতুন কাকিমাকে ফেলে আমি ওই প্রদর্শনীতে যাব না।'

'তুমি যাবে না বলে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের প্রদর্শনীতে যাওয়া বন্ধ থাকবে নাকি?' ক্ষোভের সঙ্গে বউদি বললেন।

'বন্ধ থাকবে না, তা আমি জানি। কিন্তু আমি না গিয়ে একটা প্রতিবাদ তো করতে পারলাম।' শক্তকণ্ঠে হেমলতা বলল।

ব্যঙ্গ হেসে জ্ঞানদা বউদি বললেন, 'প্রতিবাদ! কীসের প্রতিবাদ! আর প্রতিবাদ করার তুমিই বা কে?'

জ্ঞানদা বউদির কথা শুনে হেমলতার চোখ স্থির হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সে চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। ওই অবস্থাতেই হেম বলল, 'আমি যে এ বাড়ির কেউ নই, সে আমি জানি। কিন্তু আপনার, কাকাদের, অন্যান্য কাকির ভালোবাসা পেয়ে পেয়ে আমার আহ্লাদ বেড়ে গিয়েছিল। আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম যে এ বাড়ির সঙ্গে আমার রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই।' তারপর নিবিড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেমলতা বলেছিল, 'আপনিই আমাকে সেই সত্য কথাটি মনে করিয়ে দিলেন মেজো কাকিমা। আমার ভুল হয়ে গেছে, অন্য বাড়ির মেয়ে হয়ে এ বাড়ির সিদ্ধান্তের ওপর কথা বলা আমার উচিত হয়নি। আমাকে ক্ষমা করে দিন।' বলেই মাথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচু করেছিল হেমলতা।

হেমলতার কথা শুনে জ্ঞানদা বউদি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অন্য কেউ হলে হেমলতার এরকম কথা শুনে একটু লজ্জিত হতেন, নিদেনপক্ষে চোখেমুখে করুণার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলতেন, 'এসব কী বলছ তুমি, মেয়ে? তুমি তো আমাদেরই মেয়ে! রাগের মাথায় কী বলতে কী বলে ফেলেছি, তাতে তুমি মনে কষ্ট পেয়ে বসে আছো! ওসব মন থেকে ঝেড়ে ফেলো। চলো চলো, আমাদের সঙ্গে চলো।' অথবা বলতেন, 'ওই দেখ মেয়ে, সামান্য একটা কথা বললাম, তাতেই তোমার চোখে জল!' তারপর হেমলতার মাথায় হয়তো ডান হাতের গভীর একটা স্পর্শ ঢেলে দিয়ে বলতেন, 'দেখো হেম, আমি তো বয়সে তোমার বড়, সম্পর্কে কাকিমা। বয়স এবং সম্পর্কের দোহাই দিয়েও তো তোমাকে বকার অধিকার আছে আমার। ধরে নাও, বয়োজ্যেষ্ঠের জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমাকে আমি দু-একটা কথা বলেছি। তাতেই তোমার মুখ ভার?' তারপর হয়তো নিজের আঁচল দিয়ে হেমলতার চোখমুখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলতেন, 'যদি তুমি আমার কথায় ব্যথা পেয়ে থাকো, আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।'

কিন্তু এসবের কিছুই করলেন না বউদি। আমার দিকে তাকিয়ে 'এসো' বলে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি মাথা নিচু করে সামনের দিকে পা বাড়াতে যাব, ওই সময় হেমলতার কণ্ঠ শুনতে পেলাম। হেমলতা নিচু স্বরে বলছে, 'একদিন না একদিন এ বাড়ির কেউ হয়ে আমি দেখাবই দেখাব।'

সেদিন আমরা হেমলতাকে রেখে, নতুন বউঠানকে বাদ দিয়ে প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম।

সেদিনের উচ্চারিত কথাটি হেমলতা বাস্তবায়িত করে ছেড়েছিল। তবে তা আমাদের বিয়ের আট বছর পরে। ওই দিনের ওই ঘটনার পরও হেমলতা ঠাকুরবাড়িতে আসা বন্ধ করেনি। নিত্য আসা-যাওয়ায় এ বাড়ির সবার সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হতো, কথাবার্তা হতো। দিন গেছে, বয়স বেড়েছে তার। দশ থেকে বারো, বারো থেকে পনেরো, সতেরো। আসা-যাওয়ার নানা সময়ে দ্বিপেন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে হেমলতার।

দ্বিপেন্দ্রের স্ত্রী সুশীলা। একটু রোগাটে। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে দুটো সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিল সুশীলা। এক পুত্র, এক কন্যা—দিনেন্দ্রনাথ আর নলিনী। এই দুই সন্তানকে রেখে একদিন সুশীলা মারা গেল। তাতে কী! স্ত্রীর মৃত্যুর এক মাস পাঁচ দিন পর দ্বিপেন্দ্রনাথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেমলতাকে বিয়ে করে ফেলল। এই বিয়ের ব্যাপারটি খুব ভালোভাবে নেয়নি ঠাকুর-পরিবার। ঠাকুরবাড়ির পুরুষেরা কম বয়সে স্ত্রী মারা গেলে সাধারণত দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতেন না। কিন্তু দ্বিপেন্দ্রনাথ সে নিয়ম মানেনি। জ্ঞানদা বউদি সুশীলাকে খুব ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসা এত গভীর ছিল যে দ্বিপেন্দ্রর ঘরে সুশীলার জায়গায় অন্য কোনো নারীকে স্থান দিতে নারাজ ছিলেন জ্ঞানদা বউদি।

এই বিয়ের পর হেমলতার প্রতি মেজো বউদির অবহেলা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

তিন

জ্ঞানদা বউদি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেজো বউ। শ্বশুরঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্রের স্ত্রী। অনেক ভেবেচিন্তে, বুঝেশুনে, অনেক আহ্লাদ করে তাঁর আইসিএস পুত্রের জন্য জ্ঞানদা বউদিকে পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন শ্বশুরঠাকুর। যশোরের অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা তিনি। অল্প বয়সে ঠাকুর-পরিবারে এসেছিলেন। একদিন তিনি হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন, 'ছোট, তুই তো আমার তুলনায় অনেক বেশি বয়সে শ্বশুরবাড়িতে এসেছিস। আমি তো এসেছিলাম সাত বছর বয়সে। আমার দুধদাঁত পড়েছিল এই ঠাকুরবাড়িতে।'

তাঁর মুখেই শুনেছি, বিয়ের আগে লেখাপড়া কিছুই জানতেন না তিনি। ঠাকুরবাড়িতে এসেই তাঁর যা কিছু বিদ্যার্জন।

বউদিকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব বর্তেছিল রবিবাবুর সেজো দাদা মানে ভাশুর হেমেন্দ্রনাথের ওপর। তাঁরই তত্ত্বাবধানে বউদির অক্ষরজ্ঞান। বউদির কাছে শুনেছি, তাঁর চেয়ে ছয় বছরের বড় ছিলেন সেজো ভাশুর। খানিকটা ডাকাবুকো ও বদরাগী ধরনের লোক ছিলেন নাকি তিনি। বউদি বলেছেন, 'মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে তার সামনে বসতাম আর একেকবার ধমক দিলে চমকে উঠতাম। আমার যা কিছু বাংলা শেখা তার সবটুকুই সেজো ঠাকুরপোর কাছ থেকে।'

ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য অযোধ্যানাথও ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের পড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। একাদকে সেজো ঠাকুরের আন্তরিকতা, অন্যদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অযোধ্যানাথের নিষ্ঠা—এ দুয়ের কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন জ্ঞানদা বউদি। মেজো বউকে নিয়ে শ্বশুরঠাকুরের খুব গর্ব ছিল। সাত বছর বয়সের বালিকাবধূটি কালে কালে অসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন। শিক্ষিতা, রুচিমান, ব্যক্তিত্বসম্পন্না। এরকম পুত্রবধূ কলকাতার ক'জনের বাড়িতে আছে!

ভাশুর সত্যেন্দ্রনাথও কম কিসে? ঠাকুর-পরিবারের প্রথম এন্ট্রান্স পাস। দৃষ্টিকাড়া তরুণ। ষোলো বছর বয়স। বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথকে আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করিয়েছেন শ্বশুরঠাকুর। সত্যেন ভাশুরের আঠারো হয়নি তখনো। তাতে কী? ষোলো বছর বয়সে কি বিয়ে করানো যায় না? সামাজিক কোনো বাধা আছে নাকি? যদি না থাকে, তাহলে সত্যেনদাকে ওই ষোলোতেই বিয়ে করাবেন বলে ঠিক করে ফেলেছেন শ্বশুরঠাকুর। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত নেননি। শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন কী করে? শাশুড়িঠাকরুন আছেন না ঘরে! তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়?

এক রাতে শাশুড়িঠাকরুনের সামনে কথাটা পাড়লেন শ্বশুরঠাকুর। সে রাতে শাশুড়িঠাকরুন বেশভূষায় একটু আগোছালো ছিলেন। কারণ, শ্বশুরঠাকুরের শাশুড়িমাতার ঘরে আসার কথা নয়। যে রাতে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন বোধ করতেন শ্বশুরঠাকুর, সে রাতে নিজের কামরায় ডেকে পাঠাতেন স্ত্রীকে, তাও গভীর রাতে, ছেলেমেয়েরা সব ঘুমিয়ে গেলে। যে রাতে শ্বশুর ডেকে পাঠাতেন, সে রাতে শাশুড়িঠাকরুন একখানি ধোয়া সুতিশাড়ি পরতেন। আর দেহে একটুখানি আতর মাখতেন।

কিন্তু সে রাতে আচমকা শ্বশুরঠাকুর শাশুড়িমাতার কক্ষে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। খাওয়াদাওয়ার পর শোয়ার আয়োজন করছিলেন শাশুড়িমাতা। দরজায় শ্বশুরঠাকুরকে দেখে চমকেই উঠেছিলেন তিনি। মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে দরজার দিকে দু'কদম এগিয়ে গিয়েছিলেন শাশুড়িমাতা।

স্মিত মুখে কৌচে বসতে বসতে শ্বশুরঠাকুর বলেছিলেন, 'কেমন আছ তুমি শাকম্ভরী?' শ্বশুরঠাকুর স্ত্রীকে শাকম্ভরী নামেই সম্বোধন করতেন। শাকম্ভরী শাশুড়িমাতার মেয়েবেলার নাম।

'আজ্ঞে হ্যাঁ...' অনেকটা কাঁপা কণ্ঠে শাশুড়িঠাকরুন এই দুটো শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর মনে একটা প্রশ্ন তোলপাড় করছিল তখন—যিনি প্রয়োজনে ডেকে পাঠান, তিনি কেন সশরীরে আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন? তাঁর সঙ্গে সাংসারিক তেমন কথাবার্তা হয় না। তিনি তেমন প্রয়োজনও বোধ করেন না। পারিবারিক নীতিনির্ধারণের ব্যাপারে শ্বশুরঠাকুর একাই সিদ্ধান্ত নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয়ই কোনো কারণে তিনি আজকে তাঁর কক্ষে এসেছেন। কিন্তু সেই কারণ কী হতে পারে—তার কোনো কূলকিনারা পাচ্ছেন না শাশুড়িঠাকরুন। ওই সময় শ্বশুরঠাকুরের কণ্ঠ ভেসে এল তাঁর কানে। স্বরটা বেশ মোলায়েম। এই রকম মোলায়েম স্বরে কখনো শাশুড়িঠাকরুনের সঙ্গে কথা বলেন না তিনি। ভেতরে ভেতরে বেশ আশ্চর্য হলেন শাশুড়িঠাকরুন। ভাবলেন, আজকে বোধ হয় কর্তার মন বেশ ভালো। অথবা এমন একটা সংকটে পড়েছেন, একা চিন্তা করে তার থেকে উদ্ধার পাচ্ছেন না তিনি।

শ্বশুরঠাকুর বললেন, 'কী আজ্ঞে হ্যাঁ করছ তুমি?' বেশ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন তিনি।

এবার সত্যি সত্যি আশ্চর্য হলেন শাশুড়িমাতা। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখলেন কর্তার প্রশান্তভাব, চোখে সামান্য কৌতুকের আভা।

'কিছু খেতে দেবে না তুমি আমাকে? বেশ গরম পড়েছে? নেবু আছে? শীতল জলে নেবুর রস মিশিয়ে দাও। খেতে ইচ্ছে করছে খুব।' শ্বশুরঠাকুর সহজ আদুরে কণ্ঠে বললেন।

একত্রিশ বর্ষীয়া শাশুড়িমাতার মাথা থেকে আঁচলটা খসে পড়ল। বয়স কম হলে কী হবে, চুলে পাক ধরেছে তাঁর। চুল অনেকটা পাকা। ডান হাতে তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল তুলে দিলেন তিনি। পাশের কক্ষের দিকে পা বাড়ালেন। পৃথুলা শরীর। তাড়াতাড়ি পা বাড়াতে গিয়ে শাড়িতে পা আটকে পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। ডান হাতে ত্বরিত কপাট ধরে নিজেকে পতন থেকে রক্ষা করলেন।

পেছন থেকে শ্বশুরঠাকুর বলে উঠলেন, 'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তুমি? আস্তেধীরে দাও। আমি কিছুক্ষণ থাকব তোমার ঘরে। কথা আছে।'

নেবু কাটতে কাটতে শাশুড়িমাতা ভাবছেন, নিশ্চয়ই বড় ধরনের কোনো কারণ আছে। নইলে এত মিষ্টি কথা কেন? তিনি তো কখনো এরকম করে মিষ্টি কথা বলেন না। যেবার তিনি জগদ্ধাত্রীপুজো বন্ধ করলেন, সেবার কী আকুতিমিনতিই না করেছিলেন শাশুড়িমাতা। কিন্তু শ্বশুরঠাকুরের মন তাতে বিন্দুমাত্র গলেনি। ঈশ্বরচিন্তায় উন্মত্ত তিনি। পিতামহী অলকা দেবীর মৃত্যুতে তাঁর ভাবান্তর হয়েছিল। ওই সময় থেকে ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর এই ব্যাকুলতা গতানুগতিক পথে এগোয়নি। পৌত্তলিকতার বিরোধিতা শুরু করলেন তিনি। জগদ্ধাত্রীপুজো বন্ধ করায় আত্মীয়স্বজন বিরূপ হলেন তাঁর ওপর। শুধু জগদ্ধাত্রীপুজো বন্ধ করে শ্বশুরঠাকুর ক্ষান্ত হননি, পারিবারিক দুর্গাপুজোও তুলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিবারের প্রায় সকল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদস্যই এর বিরোধিতা করেছিলেন। প্রবল বিরোধিতা কলহের রূপ নেয়। এই সময় হত্যে দিয়ে পড়েছিলেন শাশুড়িঠাকরুন শ্বশুরঠাকুরের সামনে। বলেছিলেন, 'ক্ষান্ত হোন, আপনি প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা করবেন না। ঠাকুর-পরিবারে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই প্রথা। আপনি ধর্মপ্রথায় হাত দেবেন না। জগদ্ধাত্রীপুজো বন্ধ করেছেন, এরপর দুর্গাপুজো বন্ধ করলে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যাবে।' সেদিন বেশ সাহসী হয়ে উঠেছিলেন শাশুড়িঠাকরুন।

সেদিন কঠোর চোখে শ্বশুরঠাকুর তাকিয়ে থেকেছিলেন শাশুড়িমাতার দিকে। কঠিন কণ্ঠে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি বলেছিলেন, 'তুমি গৃহিণী, ঘর নিয়ে থাকো। বাহির নিয়ে মাথা ঘামাবে না। লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করো না। বুঝতে পারছি তুমিও ওদের দলে গিয়ে ভিড়েছ।'

এই কথা শুনে শাশুড়িমাতা কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। ডান হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তারপর দূরাগত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দুর্গাপুজো এ বাড়িতে চলতে থাকবে, কিন্তু পুজোর সময় আমি এ বাড়িতে থাকব না।'

এরপর দুর্গাপুজো এলেই দেশ ভ্রমণের নাম করে ঠাকুরবাড়ি থেকে দূরে থাকতেন তিনি।

এসব আমার জানার কথা নয়, আমার যখন একটু বোধবুদ্ধি হলো, তখন মেজো বউদি এসব ঘটনা একটু একটু করে আমায় বলেছিলেন।

এ ছাড়া ত্রিপুরাসুন্দরী ও যোগমায়া দেবীর সঙ্গে শ্বশুরঠাকুরের শরিকি বিবাদ একসময় প্রকট হয়ে উঠেছিল। মন বিষিয়ে উঠেছিল শ্বশুরঠাকুরের। দুঃখে এবং অভিমানে বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকতেন তিনি। যখন বাড়িতে থাকতেন, বড় নিশ্চুপ থাকতেন।

লেবুর রস মেশানো শীতলজল নিয়ে এলে গ্লাসটি হাত বাড়িয়ে নিলেন শ্বশুরঠাকুর। তারপর নরম কণ্ঠে বললেন, 'বসো।'

গুটিসুটি মেরে খাটের এক কোনায় বসলেন শাশুড়িমাতা। খালি গ্লাসটি পাশের টুলে নামিয়ে রেখে শ্বশুরঠাকুর বললেন, 'তোমার সঙ্গে একটা বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য এসেছি।' বলে তিনি চুপ মেরে গেলেন।

শাশুড়িমাতার প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছিলেন শ্বশুর। কিন্তু তিনি কোনো প্রশ্ন করলেন না। স্বামীর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলেন। সে চোখে ভয় ও বিস্ময়।

শ্বশুরঠাকুর বোধ হয় বিষয়টা আঁচ করতে পারলেন। বললেন, 'ভয়ের কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, বিস্ময়েরও না। বলছিলাম কি, আমাদের সত্যেন তো বড় হয়ে উঠল। এন্ট্রান্স পাস দিয়েছে সে। এবার তো তার বিয়ে দিতে হয়—কী বলো তুমি?'

শাশুড়ির বুক থেকে যেন জগদ্দল পাথর নেমে গেল। 'ও, এই কথা! কী ভয় পেয়েছিলুম রে বাপু...।' মনে মনে বললেন শাশুড়িমাতা।

'হ্যাঁ, বিয়ে তো সত্যেনকে করানো উচিত। বয়স তো তার কম হলো না—!'

'কত হলো বলো তো সত্যেনের বয়স।' শ্বশুরঠাকুরের কণ্ঠে ঠাট্টার ছোঁয়া। শাশুড়ি মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বিড়বিড় করে অস্পষ্ট স্বরে কী যেন বললেন।

'তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না।'

এবার শাশুড়িমাতার কণ্ঠ স্পষ্ট হলো, 'আমি তো সত্যেনের বয়সের হিসাব মেলাতে পারছি না। কত হবে তার বয়স? বারো-তেরো।'

হা হা করে হেসে উঠলেন শ্বশুরঠাকুর, 'নিজের ছেলেদের বয়সেরও হিসেব রাখো না তুমি! সত্যেনের বয়স বারো-তেরো নয়। পনেরো বছর পুরিয়ে গেছে তার বয়স। এন্ট্রান্স পাস দিয়েছে সে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।' একটু থেমে গর্বের কণ্ঠে আবার বললেন, 'শুধু পাস দেওয়া নয়, ভালোভাবে পাস দিয়েছে, দশ টাকার বৃত্তিও পেয়েছে।'

আনন্দ আর বিস্ময়ভরা চোখে শাশুড়িমাতা শ্বশুরঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাবছেন, তাঁর ছেলে এত বড় পাস দিয়েছে! তাও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে! এত বড় আনন্দের খবর। কেউ তো তাঁর কাছে পৌঁছায়নি! নিজেও তো ছেলের পড়াশোনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারতেন! তিনি নিজেও এ জন্য দায়ী। আবার নিজেকে দায়ী করতেও তাঁর দ্বিধা হচ্ছে। কী করে সন্তানদের ভরণপোষণ আর লেখাপড়ার খোঁজখবর রাখবেন তিনি? প্রায়ই তো অসুস্থ থাকতে হয় তাঁকে। আঁতুড়ঘরেই তো তাঁর জীবন কাটল। এই একত্রিশ বছরের জীবনে কটা দিনই বা তিনি আঁতুড়ঘরের বাইরে থাকতে পেরেছেন? দশ বছরেরও কম বয়সে প্রথম সন্তান এসেছিল তাঁর পেটে। এরপর গত তেইশ বছরে কম সন্তান হলো না তো তাঁর! এগারোটি সন্তান জন্ম দিতে হলো তাঁকে। গেল বছরেই তো স্বর্ণকুমারী জন্মাল। এখনো তো তিনি গর্ভবতী। কথাটি মনে পড়ায় শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের পেট ঢাকতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি।

'যা-ই হোক, আমি ঠিক করেছি, সত্যেনের বিয়ে দেব এবার। তোমার অমত নেই তো?' শ্বশুরঠাকুর জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন তার দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার অমত থাকবে কেন? এ তো আনন্দের খবর।' নিচু স্বরে শাশুড়িমাতা বললেন।

'এবার বলো মেয়ে কোথায় পাব?'

স্পষ্ট গলায় শাশুড়িমাতা এবার বলে উঠলেন, 'যশোর ছাড়া আর কোথায়? কলকাতা বা অন্য জায়গার কুলীনরা তো আমাদের হেয় চোখে দেখে। দ্বিজকেও যশোর থেকে বিয়ে করিয়েছেন। সত্যেনের জন্যও ওখানে খোঁজ নিলে কেমন হয়?'

'ভালোই তো। ওই নরেন্দ্রপুর গ্রামেই মানুষ পাঠাই তাহলে। দ্বিজেনের বউ সর্বসুন্দরীকেও তো ওই গ্রাম থেকে আনা হয়েছে। আমাদের সত্যেনের জন্য যেনতেন বউ নির্বাচন করলে চলবে না। বাছা কন্যা হতে হবে। সুশীলা, সুন্দরী।' শাশুড়িমাতার প্রথম দিকের কথাকে এড়িয়ে কথাগুলো বললেন শ্বশুরঠাকুর।

অনেক ভেবেচিন্তে বুঝেশুনে পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য যশোরের অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে নির্বাচন করেছিলেন শ্বশুরঠাকুর। কালে কালে ঠাকুরবাড়ির এই বউটির কথা গোটা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বড় ভালোবাসতেন শ্বশুরঠাকুর মেজো বউকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ভালোবাসা টেকেনি। গভীর একটা ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল উভয়ের মাঝখানে।

প্রথাগতভাবে ঠাকুরবাড়ি ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। এই পরিবারে তেজি প্রতিবাদী নারীর দেখা যেমন মিলেছে, তেমনি সর্বংসহা নারীরও অভাব ছিল না। শ্বশুরঠাকুরের মা দিগম্বরী দেবী। অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন নাকি তিনি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মুখ নাকি তাঁরই মুখের আদলে তৈরি করা হতো। নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ এই নারীটি ছিলেন দোহারা গড়নের। দ্বারকানাথ ঠাকুরমশায় বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। বৈষ্ণবীয় আহার আর আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। বড় সুখে দিন কাটছিল দিগম্বরী দেবীর।

সময়ের ব্যবধানে ধনাঢ্য হয়ে উঠলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর মশায়। সামাজিক মর্যাদার জন্য ইউরোপীয় অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হতো তাঁকে। সেখানে থাকত মদ্য ও মাংসের আধিক্য। কালক্রমে তিনিও এইসব লোকাচারবিরুদ্ধ ব্যসনে আসক্ত হয়ে পড়লেন। এরপর দ্বারকানাথ ঠাকুর মশায় বিলেত গেলেন। কালাপানি পাড়ি দেওয়ার অপরাধ করলেন তিনি। স্বামীর ভ্রষ্টাচারে গভীরভাবে আহত হলেন দিগম্বরী দেবী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডেকে বিধান চাইলেন। তাঁরা ব্যবস্থা দিলেন। ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বামীসঙ্গ-সহবাস ত্যাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন তিনি। দূর থেকে স্বামীর সেবা করতেন। কিন্তু গায়ে স্বামীর স্পর্শ লাগলেই স্নান করতেন।

আবার এই পরিবারে বাস করে গেছেন আমার শাশুড়িমাতা। দিগম্বরী দেবীর মতো প্রতিবাদ করতে শেখেননি। ভেতরে অস্বস্তি আর বেদনাকে পুষে রেখে সংসার করে গেছেন। দিগম্বরী দেবীর মতো শাশুড়িমাতার ধর্মজীবনের সংস্কারেও আঘাত এসেছিল। কিন্তু শাশুড়ির মতন স্বামী-সহবাস বর্জন করেননি তিনি। আবার আধুনিকতাকেও মেনে নিতে পারেননি। স্বামীর অনুপস্থিতিতে জ্ঞানদা বউদির মতো লাটসাহেবের পার্টিতে একলা যাওয়া বা কাদম্বরী বউঠানের মতো ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাওয়ার মনোবল শাশুড়িমাতার চরিত্রে ছিল না। শ্বশুরঠাকুরের ধর্মসংস্কারকে তিনি মনেপ্রাণে সমর্থন যেমন করতে পারেননি, তেমনি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করতে পারেননি। মেজো বউদির মধ্যে দিগম্বরী দেবীর বৈশিষ্ট্য। তিনি আত্মবিশ্বাসী, প্রতিবাদী। চোখ বুজে অন্যায়কে মেনে নেওয়ার ধাঁচ মেজো বউদির মধ্যে নেই। তিনি সাপকে সাপ আর লাঠিকে লাঠি বলতে শিখেছেন। শিক্ষার আলো আর স্বামীসংসর্গে তিনি যথার্থ একজন আধুনিক নারীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ভাবলে অবাক লাগে—তাঁর সংস্পর্শে থেকেও কিন্তু আমি তাঁর মতো হতে পারিনি। কী এক অজ্ঞাত কারণে আমি হয়ে গেছি আমার শাশুড়িমাতার মতো। সহনশীল, ভেতরে ভেতরে গুমরে মরা এক নারী। অথচ শাশুড়িমাতার সঙ্গে আমার কখনো দেখাই হয়নি। আমার বিয়ের এগারো বছর আগে তাঁর দেহান্ত হয়। হয়তো তাঁর কথা শুনে শুনে আমার মধ্যে তাঁর একটা অবয়ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নিজের অজান্তে আমার মধ্যে আমি আমার শাশুড়িমাতাকে গড়ে উঠতে দিয়েছিলাম। তাই মেজো বউদির কাঠিন্য, একরোখা মনোভাব আমার ভেতরে দানা বাঁধতে পারেনি। এখানে একটু ভুল বললাম—আমার মধ্যে যে কাঠিন্য আর প্রতিবাদ ছিল না, এমন নয়। তবে আমি তা দিগম্বরী দেবী বা মেজো বউদির মতন প্রকাশ্যে দেখাইনি। আমার প্রতিবাদ ছিল অনেকটা অপ্রকাশিত; কিন্তু যার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ, তা সে বুঝেছিল। বলেন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিক ঘটনা আর শান্তিনিকেতনের জন্য আমার সব অলংকার বেচে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে আমি রবিবাবুকে আমার প্রতিবাদের ভাষা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। তবে তা অনেক পরে।

মেজো বউদির এই যে আধুনিক হয়ে ওঠা, তার পেছনে কিন্তু মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের অবদান বিশাল। শুধু অবদান নয়, প্রশ্রয়ও ছিল। বউদির মুখেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই রকম প্রশ্রয়ের একটা গল্প শুনেছিলাম।

বিয়ের পর সাত বছর কেটে গেছে। মেজদা আইসিএস পাস করে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ইংল্যান্ড যাত্রায় সত্যেনদার সঙ্গী ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মনোমোহন ঘোষও দেশে ফিরে এসেছেন। এর মধ্যে জ্ঞানদা বউদির রূপের কথা গোটা কলকাতায় চাউর হয়ে গেছে। মনোমোহন আবদার করলেন মেজদার কাছে—বউ দেখাতে হবে।

এ এক অসম্ভব আবদার। ঠাকুরবাড়ির কড়া নিয়ম—কোনো পরপুরুষের সঙ্গে বাড়ির মেয়ের সাক্ষাৎ চলবে না। শ্বশুরঠাকুরের কঠোর নির্দেশ লঙ্ঘন করার মানসিক জোর কার আছে? ফাঁপরে পড়লেন মেজদা। তিনি বিচলিত বোধ করতে লাগলেন। অন্তঃপুরে অবরোধ প্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ি থেকে ও বাড়িতে যেতে হলে ঘেরাটোপমোড়া পালকির সঙ্গে প্রহরী ছোটে, অনেক অনুনয়ের পর গঙ্গাস্নানের অনুমতি পেলে বেহারারা পালকিসুদ্ধ মেয়েদের জলে চুবিয়ে আনে।

এরকম পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বন্ধুর আবদার রক্ষা করা সম্ভব নয়। মেজদা আবার ভাবেন—তিনি তো ইংল্যান্ড থেকে আইসিএস পাস করে এসেছেন। ইংল্যান্ডে কী দেখে এসেছেন তিনি? সেখানে নারী-পুরুষের মেলামেশা দেখেননি তিনি? শিক্ষা তো তাঁর ভেতরের কুসংস্কারকে ঝেঁটিয়ে বের করে দেওয়ার কথা! তাহলে বন্ধুর প্রস্তাবে তিনি এত দ্বিধান্বিত কেন? বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর সাক্ষাতে অপরাধটা কোথায়?

ডানে-বাঁয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়েন মেজদা। বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর সাক্ষাৎ ঘটাবেনই তিনি। কিন্তু কেমন করে? পিতা যে ঘরে! সদ্য হিমালয়ভ্রমণ শেষ করে বাড়িতে অবস্থান নিয়েছেন তিনি। তাঁর উপস্থিতিতে বন্ধুকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে প্রচুর লোকজন—দাসদাসী, আত্মীয়স্বজন। পিতার কাছে মুহূর্তেই সংবাদ পৌঁছে যাবে। লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে তখন। কী করা, কী করা! হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মেজদার মাথায়। হ্যাঁ, গভীর রাতেই বন্ধুকে অন্দরমহলে নিয়ে যেতে হবে।

একরাতে মেজদা কথাটা পাড়লেন জ্ঞানদা বউদির সামনে। বিস্মিত হয়েছিলেন জ্ঞানদা বউদি। আগের অন্তঃপুরিকারা কেবল শাড়ি পরলেও শ্বশুরঠাকুর বেশবাসে পরিবর্তন এনেছেন। কেবল একখানা শাড়ি শরীরে জড়িয়ে শিক্ষক, পূজারী ব্রাহ্মণ জাতীয়-অনাত্মীয় পুরুষের সামনে বের হওয়ায় অসুবিধা আছে। শ্বশুরঠাকুরের পরিকল্পনায় নারীদের গায়ে শাড়ির পরিবর্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওস্তাগরের তৈরি পেশোয়াজ-জাতীয় পোশাক উঠল। সে রাতেও মেজো বউদি ওই পোশাকই পরেছিলেন। স্বামীর প্রস্তাবে নিজের অজান্তে পরিধেয়কে টানতে শুরু করলেন মেজো বউদি।

শ্বশুরঠাকুর ঠাকুরবাড়ির যে মেয়েদের গায়ে সূর্যের রশ্মি পড়তে দেন না, সে গায়ে পরপুরুষের দৃষ্টিপাত পড়া! অসম্ভব। প্রস্তাব শুনেই চমকে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন মেজো বউদি। চুপচাপ তাকিয়েই ছিলেন। মেজো বউদি কথা বলছেন না দেখে মেজদা আবার বলেছিলেন, 'ভয় পেলে নাকি? কিছু বলছ না যে?'

'ভয় তো পেয়েছি, তবে তা প্রথাকে নয়, শ্বশুরঠাকুরের কড়া হুকুমকে।' জ্ঞানদা বউদি বললেন।

'চুপিসারে নিয়ে আসব মনোমোহনকে। কেউ টের পাবে না।' নিচু স্বরে বললেন মেজদা।

'কেউ না কেউ তো টের পেয়ে যাবে আর তা শ্বশুরঠাকুরের কানেও পৌঁছাবে। তখন কী অবস্থার সৃষ্টি হবে—তুমি ভেবে দেখেছ?'

'তখনকার ব্যাপার তখন দেখা যাবে। এখন তুমি রাজি কি না, বলো।' মেজদা বললেন।

জ্ঞানদা বউদি মেজদার কথার সরাসরি জবাব দিলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মাত্র। গবাক্ষের ওপারে আঁধারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার তো নিশ্চয়ই মনে আছে—তুমি যখন ইংল্যান্ডে পরীক্ষা দিতে গেলে, তখনকার কথা। লন্ডনে বসবাসকালে তোমার মন চঞ্চল হয়ে উঠল আমার জন্য। সাহস করে তুমি পিতাকে চিঠি লিখলে। সেই চিঠিতে তুমি আমাকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলে।' মেজো বউদির কথা বলা হঠাৎ থেমে গেল। কী যেন ভাবলেন তিনি। তারপর বেশ উষ্ণ গলায় আবার বলতে শুরু করলেন, 'অনুমতি দেওয়া তো দূরের কথা, উপরন্তু তিনি তোমাকে জানালেন—অন্তঃপুরের মানমর্যাদার ওপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস যাতে তুমি না দেখাও।'

'হ্যাঁ, আমার মনে আছে সেসব কথা। ছয়-সাত বছর আগের ঘটনা এটি। এখন আমি ব্রিটিশ সরকারের আইসিএস। বয়স হয়েছে আমার। আমার অধিকার সম্পর্কে আমি বুঝতে শিখেছি। নারী-অধিকার হরণের মধ্যে ঠাকুরবাড়ির মানমর্যাদা রক্ষিত—এটা আমি বিশ্বাস করি না। বাবা কী ভাববেন, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না এখন। ভাবছি—তোমাকে নিয়ে, তোমার ধারণা বিশ্বাস নিয়ে।' গরগর করে কথাগুলো বলে গেলেন মেজদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজো বউদি বলেছিলেন, 'ধারণা বা বিশ্বাস বলতে বোধ হয় তুমি মনোমোহন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা বোঝাতে চাইছ। মনোমোহন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।' একটু থেমে তিনি আবার বলেছিলেন, 'তবে আমার একটা অনুরোধ তোমার কাছে। কোনো ভজকটের দরকার নেই। এই সাক্ষাতের কথা শ্বশুরঠাকুরের কানে যাক, তা আমি চাই না। অত্যন্ত সংগোপনে তুমি তাঁকে নিয়ে আসবে। যেন কাকপক্ষীও টের না পায়।'

হাসতে হাসতে মেজদা বললেন, 'আরে ভাই, রাতের বেলা আনব, গভীর রাতে। ওই সময় কাকপক্ষী জেগে থাকে নাকি?'

'রাতের বেলা কাকপক্ষীকে ডেকে উঠতে শোনোনি কখনো? আরে, তস্করদের আনাগোনা টের পেলে ঘুমন্ত কাকও ডেকে ওঠে।' খিলখিল করে হেসে উঠেছিলেন মেজো বউদি।

গভীর রাতেই বন্ধু মনোমোহনকে নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে এসেছিলেন মেজদা। কথা-সাক্ষাৎও হয়েছিল মেজো বউদির সঙ্গে মনোমোহন বাবুর। সেই রাতে বউদির হাতে জলখাবার খেয়ে বড় তৃপ্তি পেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু বেদনার ঝড় উঠেছিল শ্বশুরঠাকুরের মনে। বলরামই শ্বশুরঠাকুরকে বলে দিয়েছিল সব। বলরাম শ্বশুরঠাকুরের খাস ভৃত্য। সে রাতে শ্বশুরঠাকুরকে শোয়ার সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে নিজের কামরায় শুতে গিয়েছিল বলরাম। মূল সিঁড়ির গোড়ার একটি কামরায় থাকে সে। কিন্তু ঘুম আসছিল না তার। পেটটা একটু গরম হয়েছিল। রাতের রান্নাটা ভালো হয়েছিল বলে খাওয়াটাও বেশি হয়ে গিয়েছিল তার। বদহজমের ঢেকুর উঠতে থাকল। একসময় পেট মুচড়ে উঠল বলরামের। বাহ্যকর্ম সেরে দরজার কপাট লাগাতে যাবে—ওই সময় সিঁড়িতে চোখ পড়ল তার। একটু দূরে রেড়ির একটা বাতি জ্বলছে। রাতে সিঁড়ির গোড়ায় বাতি জ্বালিয়ে রাখা ঠাকুরবাড়ির রেওয়াজ। অস্পষ্ট আলোয় দুজন মানুষকে সিঁড়ি ডিঙিয়ে পা টিপে টিপে ওপরে উঠতে দেখল বলরাম। 'কে, কে ওখানে' বলে চিৎকার দিতে যাবে, ঠিক ওই সময় তার নজর পড়ল মেজদার ওপর। মেজদাকে চেনা গেল বটে, কিন্তু সঙ্গের লোকটি কে? মাথাটি চাদরে ঢাকা! চোখ দুটো আর নাকের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে শুধু। বলরাম মনোমোহনকে চিনতে পারল না। চেনার কথাও নয়। আগেও তো কখনো দেখেনি তাকে। ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয় কোনো গুমর আছে। তা না হলে দাদার পদক্ষেপে এত দ্বিধা কেন? এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। উদ্বিগ্ন চোখমুখ। তিনি একটা সিঁড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙছেন তো তাঁর পেছনের লোকটিও একটা সিঁড়ি ভাঙছেন। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে সঙ্গীকে হাতের ইশারায় কী যেন বলছেন মেজো দাদা। কী করবে এখন বলরাম? সে স্পষ্ট বুঝল—সঙ্গের লোকটি মেজদার সম্মতিক্রমেই ঠাকুরবাড়িতে ঢুকেছে। কিন্তু কেন? সে এখন চিৎকার দিয়ে উঠবে? বলবে—চোর চোর? নিজের অজান্তেই জিবে কামড় খেল বলরাম। 'হরি হরি' ঠাকুরবাড়ির মেজো ছেলেকে চোর সাব্যস্ত করতে যাবে কেন সে? মহর্ষির সবচেয়ে আদরের সন্তান মেজদা। তাহলে এত গভীর রাতে মেজদা করছেনটা কী? ভাবতে ভাবতে একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিল বলরাম। তাকিয়ে দেখল—মেজদারা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরতলায় উঠে গেছেন। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না বলরাম। পা টিপে টিপে ওপরে উঠল। দেখল, দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন মেজো বউদি, মুখে স্মিত হাসি। তাঁর সামনে মেজদা আর সঙ্গীটি। যা বোঝার বলরাম বুঝে গেল। নিজের কামরায় ফিরে এল সে। গোটা রাত ঘুমাতে পারল না। নানা রকম দুশ্চিন্তায় তার রাত কাটতে লাগল। শারীরিক অসুস্থতা সে টের পাচ্ছে না এখন। এরকমই হয়—বড় বিপদ ছোট বিপদকে ভুলিয়ে দেয়। বলরামের মানসিক দুশ্চিন্তা তার শারীরিক পীড়াকে লোপাট করে দিল।

ভোরসকালে সে শ্বশুরঠাকুরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করা শ্বশুরঠাকুরের আজীবনের অভ্যেস। কিন্তু সেই সকালে তিনি একটু দেরিতে শয্যা ত্যাগ করলেন। কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করে বলরাম শ্বশুরঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়াল। রাতেই সে ঠিক করে রেখেছিল—ঘটনাটির আদ্যোপান্ত মহর্ষিকে খুলে বলবে। নিশ্চয়ই মেজদা কোনো গর্হিত কাজ করেছেন! নইলে গভীর রাতে অচেনা এক তরুণকে নিয়ে বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগোনো কেন? মেজো বউদিও বা দুজনের সামনে এরকম হাসিমুখে দাঁড়ালেন কেন? আজীবন ঠাকুরবাড়ির লবণ খেয়ে যাচ্ছে বলরাম। সব কথা মহর্ষিকে খুলে বলা তার তো একান্ত কর্তব্য। 'যা-ই থাক কপালে' বলে সেই সাতসকালে মহর্ষির কক্ষের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বলরাম। মাথা নিচু করে সব কথা খুলে বলেছিল সে মহর্ষিকে। বিস্ফারিত চোখে সব কথা শুনে গিয়েছিলেন শ্বশুরঠাকুর। একটি কথাও বলেননি। সেই ভোরসকালে তাঁর কপালে-মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল। বাঁ হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলরামকে শুধু বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, তুই যা। আর হ্যাঁ, এই কথা যাতে এ বাড়ির আর কেউ জানতে না পারে। বুঝেছিস তো, আমি কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে চাইছি?'

দুহাত জড়ো করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলরাম বলেছিল, 'জে আজ্ঞে।'

আশ্চর্যের ব্যাপার এই—শ্বশুরঠাকুর এ ব্যাপারে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করেননি। মেজদাকে বুঝতেও দেননি তিনি রাতের ঘটনাটি জেনে গেছেন। তা বলে কি শ্বশুরঠাকুর মেজদার এই গর্হিত কাজটিকে মেনে নিয়েছিলেন? না, কিছুতেই না। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির এই কেলেঙ্কারির কথা কাউকে জানতে দেওয়া যাবে না। এমনকি শাশুড়িমাতাকেও না। নারী বলে কথা। কোনো সময় মুখ ফসকে যদি কাউকে বলে ফেলে! তাহলে ঠাকুরবাড়ির অর্জিত সব মানসম্মান ধুলোয় মিশে যাবে? সকল ব্যথা নিজের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে জীবন যাপন করে যাচ্ছিলেন তিনি।

গন্ডগোলটা লাগল সেদিন, যেদিন মেজদা এসে শ্বশুরঠাকুরকে বললেন, 'জ্ঞানদাকে বাবা আমি আমার কর্মস্থলে নিয়ে যেতে চাই।'

'কর্মস্থল মানে?' শ্বশুরঠাকুর অবাক চোখে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'বোম্বাই নিয়ে যেতে চাই আমি জ্ঞানদাকে।' পুত্রের কণ্ঠে পিতা নমনীয়তার অভাব টের পান।

শ্বশুরঠাকুরের বিস্ময় কাটে না। মেজদাকে কী বলবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সত্যেনের কর্মস্থল তো বোম্বাই। জাহাজে করে বোম্বাই যেতে হয়। যেখানে সত্যেনের মা গঙ্গাস্নানে যেতে চাইলে ঘেরাটোপে আবৃত তাঁকে পালকিসুদ্ধ জলে চুবিয়ে আনা হয়, সে বাড়ির বউ যাবে বোম্বাই, কালাপানি পাড়ি দিয়ে!

'তুমি কি ঠাকুরবাড়ির মানমর্যাদার কথা একেবারে ভুলে গেলে! দিগম্বরী দেবী যে তোমার পিতামহী, সারদা যে তোমার মাতা, সেটা কি তুমি বিস্মৃত হয়েছ? এ বাড়ির মেয়েদের গায়ে পরপুরুষের নজর তো দূরের কথা, সূর্যের আলো পর্যন্ত পড়ে না। সে কথাও কি তুমি ভুলে গেছ?' দৃঢ়কণ্ঠে শ্বশুরঠাকুর কথাগুলো বলে গেলেন।

মেজদা দেখলেন, প্রথা আর আবেগের কাছে তাঁকে হার মানতে হবে। কিন্তু হার মানলে চলবে না। তাহলে উপায়? উপায় একটা আছে।

মেজদা মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা, আমাকে বোম্বেতেই চাকরি করতে হবে। দীর্ঘদিনই চাকরি করতে হবে আমাকে ওখানে। ছুটিছাটাও সহজে নেওয়া যায় না। আপনার পুত্রবধূ থাকবে কলকাতায় আর আমি বোম্বেতে! ভেবে দেখুন, আমাদের মানসিক অবস্থা।' বলেই মেজদা দ্রুত সরে গিয়েছিলেন পিতার সম্মুখ ভাগ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্বশুরঠাকুর সেই মুহূর্তে হয়তো ভাবতে বসেছিলেন—তাই তো, আমি তো সত্যেনের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের কথা ভাবিনি! স্বামী, স্ত্রী—দুজনের সম্মিলনেই তো দাম্পত্য জীবন সুখকর হয়ে ওঠে। এ জন্য চাই সান্নিধ্য। কিন্তু সত্যেন আর জ্ঞানদার জীবনে পারস্পরিক সান্নিধ্য কোথায়? সত্যেন বোম্বাই আর জ্ঞানদা কলকাতায়! দুজন দুই স্থানে বসবাস করলে দাম্পত্য জীবন তো বিস্বাদে ভরে উঠবে! প্রথার দোহাই দিয়ে তিনি প্রিয়পুত্রের দাম্পত্য জীবনের সুখ কেড়ে নিচ্ছেন। এ তো বড় অন্যায়!

বলরামকে দিয়ে মেজদাকে ডেকে পাঠালেন তিনি। মেজদা আসার পর বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি জ্ঞানদাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'কিন্তু সাবধান, ঠাকুরবাড়ির মানসম্মানের দিকে খেয়াল রাখবে। বউকে এমন কোনো কাজ করতে বারণ করবে, যা করলে এ বাড়ির মর্যাদা ধুলায় মিশবে।'

পুত্রের যুক্তিতে যতই হার মানুন, শ্বশুরঠাকুরের একান্ত বিশ্বাস যে বোম্বাই নিয়ে যাবার প্ররোচনা মেজদাকে জ্ঞানদা বউদিই দিয়েছেন। শ্বশুরঠাকুর যে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন, এমন নয়। নিজের বড় মেয়ে সৌদামিনী দিদিকে বেথুনে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মেজো বউদির ব্যক্তিগত আচরণ হয়তো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক মর্যাদার ক্ষেত্রে বড় বেশি প্রকট আর উচ্চকিত মনে হয়েছিল তাঁর। মেজো বউদির স্বাধীনচেতা মনোভাব আর অতি আধুনিক আচরণ শ্বশুরঠাকুরের মনে বিন্দু বিন্দু ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। সেই ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল সেদিন, যেদিন প্রসন্নকুমার ঠাকুর এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশের একজন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্পর্কিত-ভ্রাতা ছিলেন তিনি। শ্বশুরঠাকুরকে খুব ভালোবাসতেন তিনি। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর শ্বশুরঠাকুর যখন পিতৃঋণে জর্জরিত, তখন প্রসন্নকুমার ঋণ শোধের ব্যাপারে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু, প্রসন্নকুমারের ভালোবাসা বেশি দিন টেকেনি। শ্বশুরঠাকুরের অপৌত্তলিক ধর্মমতকে মেনে নিতে পারেননি তিনি। তাঁর সংসর্গ ত্যাগ করেছিলেন প্রসন্নকুমার। দীর্ঘদিন তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ। কিন্তু সেদিন বিকেলে প্রসন্নকুমার শ্বশুরঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জ্ঞানদা বউদি সম্পর্কে যা জানিয়েছিলেন, তা সুখকর নয়।

বোম্বাই যাওয়ার পর মেজো বউদি পোশাকের সমস্যায় পড়লেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাকুরবাড়িতে স্ত্রীলোকের বাইরে বেরোবার উপযুক্ত শোভন পরিচ্ছদের সমস্যা ছিল। শুধু একটা কাপড় পেঁচিয়ে নিম্নাঙ্গের পরিধেয় এবং গাত্র আবরণের কাজ সম্পন্ন করতেন মেয়েরা। ভেতরে ব্লাউজ বা ছায়া পরতেন না ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের নারীরা। জ্ঞানদা বউদি পারসি শাড়ি আর জামার সঙ্গে গুজরাটি মেয়েদের শাড়ির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক মিশ্র পোশাক তৈরি করালেন। ওই পোশাকের নাম দিলেন তিনি বোম্বাই দস্তুর। ওই পোশাক পরেই তিনি স্বামীর সঙ্গে নানা সরকারি অনুষ্ঠানে যাওয়া শুরু করলেন।

সেবার গভর্নর লর্ড লরেন্সের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হলো মেজদা আর মেজো বউদিকে। মেজদা তখন খুবই অসুস্থ ; কিন্তু রেওয়াজ অনুসারে এই পার্টিতে কাউকে না কাউকে যেতেই হবে। অগত্যা সেই পার্টিতে জ্ঞানদা বউদি একা উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হলেন নিজের উদ্ভাবিত পোশাক পরেই। ওই পার্টিতে প্রসন্নকুমার ঠাকুরও আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি জ্ঞানদা বউদিকে চিনতে পারলেন। শত শত ইংরেজ মহিলার মাঝখানে ঘরের বউ স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আতিপাতি করে হলরুমের চারদিকে মেজদাকে খুঁজে বেড়ালেন তিনি। সত্যেন তাহলে আসেনি! ঠাকুরবাড়ির বউ একাকী এরকম বেপর্দা হয়ে ঘুরছে! লজ্জায় তাঁর মাথা নত হয়ে এল। লজ্জা একটু মিইয়ে এলে ক্রোধ তাঁকে গ্রাস করল। কিন্তু এই পার্টিতে ক্রোধ প্রকাশ করার উপায় নেই। গজরাতে গজরাতে পার্টি অসমাপ্ত রেখে হলরুম ত্যাগ করেছিলেন প্রসন্নকুমার।

সেদিন সকল কথা শেষ করে প্রসন্নকুমার ঠাকুর শুধু উচ্চারণ করেছিলেন, 'ছি ছি, দেবেন্দ্র, বউটা শেষ পর্যন্ত ঠাকুরবাড়ির সকল মানসম্মান ওই আরব সাগরের লোনা জলে ডুবিয়ে ছাড়ল!'

মাথা নিচু করে সে বিকেলে নিজের আসনে বসে ছিলেন শ্বশুরঠাকুর। কী করবেন তিনি এখন? প্রসন্ন কাকার কথাকে বিশ্বাস করবেন, না তাচ্ছিল্য দেখিয়ে উড়িয়ে দেবেন? প্রসন্ন কাকাকে অপমান করার এই মোক্ষম সুযোগ। যে কাকা একদিন বিপদকালে বটবৃক্ষের ছায়া নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, পিতৃঋণে দিশেহারা হয়ে সকল সম্পত্তি, এমনকি জমিদারি পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে যখন মনস্থ করে ফেলেছিলেন তিনি, তখনই তো প্রসন্ন কাকা তাঁকে সৎপরামর্শ দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন। সেই কাকাই না শেষ পর্যন্ত কী নিদারুণ অপমানটা করেছিলেন তাঁকে! যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ম' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে, বহু দেবতাবাদকে পরিহার করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেন তিনি, এই প্রসন্ন কাকাই তো তখন তাঁর প্রচণ্ড বিরোধিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন। কলকাতার পৌত্তলিক হিন্দুদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তাঁর ধর্মপথে কাঁটা ছড়িয়েছিলেন! হৃদয়বান কাকা তাঁর সঙ্গে চরম নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন সেদিন। তাঁর সংসর্গ ত্যাগ করেছিলেন কাকা।

আজকে সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এসে গেছে। অপমানের প্রতিশোধ বড় ভয়ংকর হয়। সেই ভয়ংকরভাবে আজকে প্রসন্ন কাকাকে লাঞ্ছিত করলে কেমন হয়!

কিন্তু এ তো ব্যক্তিগত প্রতিশোধের বাসনা! কাকা সত্যেনের বউয়ের যে কাহিনি বর্ণনা করলেন, তার সঙ্গে তো ঠাকুরবাড়ির সামষ্টিক অপমানের ব্যাপারটি জড়িয়ে আছে। ব্যক্তিগত প্রতিশোধ-আকাঙ্ক্ষার চেয়ে সামষ্টিক অসম্মানের ব্যাপারটি মুখ্য নয় কি? প্রসন্ন কাকা মিথ্যে কাহিনির ফাঁদ পেতে তাঁকে মানসিক নির্যাতন করতে আসেননি তো!

প্রসন্ন কাকা সেরকম চরিত্রের নন। তিনি মিথ্যেকে মিথ্যে, সত্যকে সত্য বলেন। আজীবন তো তাঁকে দেখে আসছেন শ্বশুরঠাকুর! কোনো ধরনের চাপে বা প্রতিশোধস্পৃহায় তিনি অসত্যের সঙ্গে আপস করেন না। তা নইলে কেন খুব সহজেই শ্বশুরঠাকুরকে ত্যাগ করেন তিনি। তিনি যখন মনে করলেন—পুরুষানুক্রমে লালিত ধর্মপ্রথাকে ভ্রাতুষ্পুত্র ত্যাগ করে মস্ত বড় অপরাধ করেছেন, তখন-তখনই তাঁকে ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। কাকা কখনো প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় বাড়ি বয়ে এসে সত্যেনের বউ সম্পর্কে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলতে পারেন না। তিনি যা বলছেন, সত্যই বলছেন। সত্যেনের বউকে তো তিনি চেনেন! একগুঁয়ে। পারিবারিক প্রথাকে সে থোড়াই পাত্তা দেয়। প্রসন্ন কাকার আজকের কথাকে না হয় অবিশ্বাস করলেন, কিন্তু সেদিনের ঘটনার সাক্ষী তো জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির চাকরবাকর, নায়েব-গোমস্তা, দাসী সবাই। সেদিনের কথা তো তিনি আজও ভোলেননি।

তিনি বাড়িতে ছিলেন না, জমিদারি দেখাশোনার কাজে কলকাতার বাইরে ছিলেন। বাড়িতে এসে সারদাঠাকরুনের কাছে শুনেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনীর সেদিনের ঔদ্ধত্যের ঘটনাটি।

বোম্বাই থেকে প্রথমবার এসেছিলেন জ্ঞানদা বউদি। ঠাকুরবাড়ির ফটকের সামনে একটি ঘোড়াগাড়ি এসে থেমেছিল সেদিন। দরজা খুলে নিচে নেমে এসেছিলেন মেজো বউদি। পায়ে বিলিতি জুতো, মোজা। জুতোর ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে রঙিন শাড়ির নকশিকাটা পাড়। গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্দরমহলের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন তিনি। সে পদক্ষেপ সুদৃঢ়, দ্বিধাহীন। প্রকাশ্য দিবালোকে পায়ে হেঁটে আঙিনা পার হয়েছিলেন মেজো বউদি। ঠাকুরবাড়ির প্রথানুসারে এ বড় গর্হিত কাজ।

চাকর-বেহারার চোখের সামনে দিয়ে মেজো বউদি অকুণ্ঠ পদক্ষেপে অন্দরমহলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। ঠাকুরবাড়ির কোনো বউকে ঠাকুরবাড়ির কোনো চাকর-গোমস্তা-নায়েব চোখে দেখেনি। কিন্তু সেদিন দেখল। তাদের বিস্ফারিত চোখের সামনে দিয়ে ফটক থেকে হেঁটে অন্দরমহলে ঢুকলেন বউদি।

ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছিল সেদিন ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে। পুরোনো চাকর-দাসীরা ডুকরে কেঁদে উঠেছিল মেজো বউদির এরকম অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখে।

সেদিন সবচেয়ে বেশি ব্যথা পেয়েছিলেন কর্তামা মানে শাশুড়িঠাকরুন। মেজো ছেলে আর মেজো বউ অন্দরে ঢুকলে অন্ধকার মুখে তাঁদের বরণ করেছিলেন কর্তামা। এ কী চেহারা বউয়ের! চোখেমুখে লজ্জাশরমের বালাই নেই। দুবছর আগের লজ্জাবতী বউটি গেল কোথায়? এ তো দেখি মেমসাহেবের বাড়া! সেদিন গম্ভীর মুখে চোদ্দ-পনেরো জন নানা বয়সের মেয়ে-বউ-কিশোরী নিয়ে পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করে নিয়েছিলেন কর্তামা।

বাড়িতে ফিরে এলে সব কথা কর্তা, মানে শ্বশুরঠাকুরকে খুলে বলেছিলেন কর্তামা। ছি ছি, এ কী বেলেল্লাপনা! এ কী অলক্ষুনে কাণ্ড! যেন প্রসন্ন কাকার আজকের কথাগুলোকে একটু অন্য রকম করে বলেছিলেন কর্তামা।

স্ত্রীর সেদিনকার কথাতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল তাঁর। কিন্তু স্নেহাতিশয্যে তা করেননি তিনি। উপরন্তু স্থির কণ্ঠে কর্তামাকে বলেছিলেন, 'বিলেতফেরত ছেলের বউ! বোম্বাই থাকে। সময়-অসময়ে ইংরেজদের সঙ্গে ওঠাবসা। ওদের সঙ্গে মিশতে হলে ওদের মতোই চলতে হয়। বউ প্রভাবিত হয়েছে। ছেলের প্রশ্রয়েই বউয়ের এরকম উচ্ছন্নে যাওয়া। কিন্তু দেখো, বাড়ি ভর্তি চাকর-দাসী, নায়েব-গোমস্তা। বিষয়টি নিয়ে এই সময় বাড়াবাড়ি করলে হয়তো লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যাবে এ বাড়িতে। বলি কি, একটু ধৈর্য ধরো। আমাকে একটু সময় দাও। দেখি, কী করা যায়।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করেননি শ্বশুরঠাকুর।

আজকে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সামনে মাথা নত করে বসে শ্বশুরঠাকুর ভাবছেন, কী ভুলটাই না তিনি করেছেন! সেদিন স্ত্রীর কথায় যদি একটা কঠোর ব্যবস্থা নিতেন, অন্তত পুত্র ও পুত্রবধূকে ডেকে সাবধান করে দিতেন, তা হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাকার সামনে আজ মাথা হেঁট করে বসে থাকতে হতো না।

এখন কাকাকে তো কিছু একটা বলে বিদায় করতে হবে। তিনি মাথা তুললেন। তাঁর চোখগুলো যেন জবাফুল। রাগে কম্পিত গলায় শ্বশুরঠাকুর বললেন, 'আমি এর একটা বিহিত করছি।' তারপর অনেকটা স্বগতকণ্ঠে বললেন, 'আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।'

প্রসন্ন কাকা বললেন, 'প্রশ্রয় আর দিয়ো না, দেবেন্দ্র। ব্যবস্থা একটা নাও। তোমার পরিবারে কী হচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর অধিকার আমার নেই। কিন্তু মানুষে দুর্নাম করার সময় ঠাকুরবাড়ির বউ বলে উল্লেখ করে। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশেও আঁচটা এসে লাগে। তাই বলি কি, কিছু একটা করো। ঠাকুরবাড়ির পুরুষদের যাতে লজ্জায় মাথা নিচু করে সমাজে চলতে না হয়।' বলেই হনহন করে হাঁটা দিয়েছিলেন কাকা।

শ্বশুরঠাকুর স্থির চোখে তাঁর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন।

চার

AMARBOI.COM

আমার বিয়ের পর থেকে দেখছি নতুন বউঠানের মনমরা ভাব। আনমনা হয়ে অন্দরমহলে চলাফেরা করছে। রবিবাবু তাকে তুমি সম্বোধন করত। তার দেখাদেখি আমিও নতুন বউঠানকে তুমি সম্বোধন করতাম। তার অনুমতি ছাড়াই করেছি। একদিন খেতে বসে রবিবাবু কথাটা পেড়েছিল। বলেছিল, 'তুমি যে নতুন বউঠানকে তুমি তুমি করছ, বউঠান কিছু মনে করছে না তো?'

পাশেই নতুন বউঠান ছিল। রবিবাবুর অনুযোগ শুনে বলল, 'আমি তো কিছু মনে করিনি! তুমি যদি বলতে পারো, তাহলে ছোটর বলতে আপত্তি থাকবে কেন? ও তো তোমার স্ত্রী। নাকি?'

এতক্ষণ পর্যন্ত কৌতুকমেশানো দৃষ্টি নিয়ে বউঠানের দিকে তাকিয়ে ছিল রবিবাবু। কিন্তু 'নাকি' শব্দটা শুনে কেন জানি সেদিন সে চমকে উঠেছিল। সেদিন খাওয়ার পাতে আমি তার মধ্যে লক্ষ করেছিলাম কী রকম যেন চকিত দৃষ্টি, অস্থির আচরণ। মাথা নিচু করে বাটি থেকে থালায় ব্যঞ্জন ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে।

নতুন বউঠানের ওই সময় খাওয়ার জায়গায় উপস্থিত থাকার কথা ছিল না। আগে নাকি রবিবাবুর খাওয়ার সময় নতুন বউঠানের উপস্থিত থাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিবার্য ছিল। কিন্তু আমাদের বিয়ের পর, বিশেষ করে রান্নাঘরের একটু-আধটু অভিজ্ঞতা অর্জনের পর জ্ঞানদা বউদি খাওয়ার সময় তার সামনে উপস্থিত থাকার জন্য আমাকে বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলেন। আমি বিয়ের প্রথম থেকে মেজো বউদির নির্দেশনা মানার চেষ্টা করতাম। এই নির্দেশনা অমান্য করার কোনো কারণ ছিল না। বরং তার খাওয়ার সময় পাতের সামনে উপস্থিত থাকার মধ্যে আমি বিপুল আনন্দ অনুভব করতাম। ধীরস্থিরভাবে খেয়ে যেত সে। কী প্রশান্ত চেহারা তখন তার! সদ্য স্নান সেরে ধোয়া কাপড় পরে খেতে বসত সে। চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্বল্পবর্ধিত দাড়িতে জল চিকচিক করত। মেয়েলি ঢঙের আঙুল রবিবাবুর। ফরসা আঙুলগুলো দিয়ে যখন সে চিকন চালের ভাতের সঙ্গে ব্যঞ্জন মেশাত, তখন দেখার মতো একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। আমি আমার শ্যামলা দেহের ছোট ছোট আঙুল দেখতে দেখতে তার ভাত খাওয়া দেখতাম। আমার হাতে একটা হাতপাখা থাকত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কোনো কোনো ঘরে টানাপাখার ব্যবস্থা থাকলেও বড়কর্তা, মানে শ্বশুরঠাকুর রান্নাঘরে টানাপাখার ব্যবস্থা রাখেননি। হয়তো মনে করেছেন—খাওয়াটা হলো একান্ত পারিবারিক একটি ব্যাপার। ওই একান্ত পারিবারিক ব্যাপারে বাইরের একজন লোক পাখা টেনে যাবে, তা ঠিক নয়। তাতে ঠাকুরবাড়ির নারী-পুরুষের একান্ত কিছু দৃশ্য বা ঘটনা অবগত হবার সুযোগ থেকে যায় একজন বাইরের লোকের। তাই বলে কি পুরুষেরা ঘামতে ঘামতে অন্ন গ্রহণ করবে? তা কী করে হয়? কর্তামায়েরও আগে থেকে তাই অন্দরমহলের বউয়েরা খাওয়ার সময় পাখা হাতে স্বামীর পাশে দাঁড়াতে শুরু করেছিলেন। রবিবাবুকে খাওয়ার সময় পাখা করার এই ব্যাপারটি পূর্বাগত প্রথা।

ওই সময় নতুন বউঠান আবার বলে উঠেছিল, 'ও কী রবি! তুমি ভাতের সঙ্গে পায়স মেশাচ্ছ কেন?'

আমি চকিতে রবিবাবুর পাতের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সত্যি সত্যি সে ব্যঞ্জনের বাটি বাদ দিয়ে পায়সের বাটিটাই উপুড় করেছে ভাতের ওপর। এবং অন্যমনস্কভাবে তা-ই মাখাচ্ছে ভাতের সঙ্গে। আমি খুব বিস্মিত হলাম। এ কী! এ কী করছে সে! ভাতের সঙ্গে ব্যঞ্জন না মিশিয়ে পায়স মেশাচ্ছে!

রবিবাবু খাওয়ার ব্যাপারে বেশ শৌখিন। কাঁসার মস্ত বড় থালার মাঝখানে ভাতগুলোকে স্তূপাকার করে দেওয়ার রেওয়াজ ঠাকুর-পরিবারে। রবিবাবুর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। থালার তিন দিকে আঠারো-বিশটি ব্যঞ্জনের বাটি। ছোট ছোট। প্রতিটি বাটি নানা রকম ব্যঞ্জনে পূর্ণ। একটু দূরে পায়সের বাটিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখা থাকে। অন্ন গ্রহণ শেষ হলে পায়সের বাটিটি টেনে নেয় রবিবাবু। পরম তৃপ্তি নিয়ে ধীরে ধীরে পায়স খায় সে। কিন্তু আজকে এ কী ব্যতিক্রম! পায়স দিয়ে ভাত খাওয়া! আমি স্থির চোখে তার থালার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

নতুন বউঠানের কথা শুনে রবিবাবুর ডান হাতের আঙুলগুলো কেঁপে উঠল। আমি চকিতে তার মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম, দুচোখে কিসের যেন ছায়া। অপরাধবোধ, অস্বস্তি, বিমর্ষভাব, না চাঞ্চল্য সেখানে, তা ভালোভাবে বুঝে ওঠার বয়স নয় তখন আমার। তবে এইটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, নতুন বউঠানের কথায় কোনো একটা হুল বা ইঙ্গিত ছিল। নইলে কেন রবিবাবুর স্বাভাবিক চেহারা হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে ম্লান হয়ে গিয়েছিল! ঠাকুরবাড়ির সব কথার মাহাত্ম্য বোঝার অভিজ্ঞতা আমার তখনো হয়ে ওঠেনি। আমি বোকাসোকা চেহারা নিয়ে একবার নতুন বউঠানের দিকে, আরেকবার রবিবাবুর দিকে তাকাতে লাগলাম।

এই সময় রবিবাবু বলে উঠল, 'ভাতের সঙ্গে পায়স মেশাতে যাব কেন?' বলতে বলতে থালার দিকে তাকাল সে। ব্যাপারটি বুঝতে পেরে লাজুক চোখে নতুন বউঠানের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আমি খেয়াল করিনি। ইদানীং আমার খেয়াল ছুটে যাচ্ছে।'

'আগে তোমাকে খেয়াল করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল আমার। এখন ছোট বউ কি সে দায়িত্ব নেয়নি?' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে নতুন বউঠান বলল, 'আমি কাকে কী বলছি! ছোট তো একেবারে ছোট। তোমাকে বোঝানোর বয়স তো ওর হয়নি এখনো। তা তুমি সময় করে আমার ঘরে এসো, বেখেয়ালি না হবার মন্ত্র শিখিয়ে দেব।' বলেই বউঠান নিজের কক্ষের দিকে রওনা দিয়েছিল। দূর থেকে বউঠানের কণ্ঠ ভেসে এসেছিল, 'আগে তো আমিই তোমার ধ্যানজ্ঞান ছিলাম। দিন আর রাতের বেশির ভাগ সময়ই তো কেটেছে আমার সঙ্গে তোমার। সঙ্গী পেয়ে আমাকে এখন তুমি ভুলতে বসেছ। তার পরও তোমার হাতে যদি সময় থাকে, এসো।'

কী আশ্চর্য! সে বেলা রবিবাবু আর ভাত খেল না! কিছুক্ষণ পাতের পাশে জোড়াসনে বসে থাকল সে। জোড়াসনেই খেতে বসত। খুব যে খেতে পারত, তা কিন্তু নয়। অন্যান্য তরুণের তুলনায় কমই খেত। তবে যা খেত অত্যন্ত পরিপাটি করে খেত। যেখানে খেতে বসত দাসীরা জল দিয়ে তা ভালো করে ধুয়েমুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিত। কাঁসার থালায় ভাত আসত। থালার চারপাশ সাজানো হতো নানা রকম ব্যঞ্জনের পনেরো-বিশটি বাটি দিয়ে। রবিবাবু এসে জোড়াসনে বসে খাওয়া শুরু করত। সে যে সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যঞ্জন খেত, এমন নয়। কোনো বাটি থেকে সামান্য ব্যঞ্জন নিল তো অন্য বাটির ব্যঞ্জন তর্জনী দিয়ে একটু ঘেঁটে দেখল। কোনো বাটিতে একটু করে উঁকি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল, আবার কোনো ব্যঞ্জনের বাটিকে উঁচুতে তুলে ধরে একটু শুঁকে দেখল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ব্যঞ্জনের তালিকাও কম দীর্ঘ নয়। সুক্তানি, পালংশাকের ঘন্ট, আলু-পটোলের ডালনা, শিমের কালিয়া, ফুলকপি বিট ও শিমের চচ্চড়ি, লাউপাতা ভাজা, বেগুনপোস্ত, মোচার পাতুরি, কাঁচকলার দম, আলুপোহা, কপি-কড়াইশুঁটির রসা, দই-বেগুন—এসব। নানা রকম ডালও রান্না হতো ঠাকুরবাড়িতে—ভাজা মুগের ডাল, নারকেল দিয়ে মসুর ডাল, কলাই ডাল, মটর ডাল। পাঞ্জাবি কলাইয়ের ডাল ঠাকুরবাড়ির প্রিয় খাবার ছিল। মাছেও কম যেত না ঠাকুরবাড়ি। কই মাছের পাতুরি, নারকেল চিংড়ি, মাছের ঝুরো, সরষেবাটা ইলিশ, মৌরালা মাছের অম্বল, তপসির ঘিতপ্সী, আম শোল, মাগুর মাছের হিংগী, রুই অথবা ভেটকি মাছের মইলু আর মৌরালার চচ্চড়ি। এই মৌরালা মাছের চচ্চড়ি রবিবাবু খুব ভালোবাসত। বালক বয়স থেকেই যে সে এই তরকারি পছন্দ করে আসছে, তা নয়। শুনেছি, নতুন বউঠানই তাকে এই তরকারি খেতে শিখিয়েছে। বড় যত্ন করে এই ব্যঞ্জনটি নিজের হাতে রাঁধত নাকি নতুন বউঠান। আমার বিয়ের একদম প্রথম দিকে এক দুপুরে মৌরালার চচ্চড়ি রাঁধার কৌশলটি শিখিয়ে দিয়েছিল নতুন বউঠান আমাকে। আমার তখন অনেক কম বয়স। ওই সময়ের সব কথা এত দিন পর আমার মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু কেন জানি এই ব্যঞ্জন রাঁধার প্রক্রিয়াটি আমার আজও মনে আছে। 'রবি মৌরালার চচ্চড়ি খেতে খুব পছন্দ করে'—বউঠানের এই কথা শুনে হয়তো আমি সেই দুপুরে খুব মনোযোগ দিয়ে রাঁধার প্রক্রিয়াটি শিখে নিয়েছিলাম। বউঠান বলেছিল, 'খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে রবি খুব অগোছালো। এলোমেলো তার খাওয়া। সামনে যা পেত, তা-ই মুখে গুঁজে দিয়ে উঠে যাবার অভ্যেস ছিল তার। আমিই তাকে বাগে এনেছি। ঠিকঠাক করে আসনে বসার অভ্যেসটি করিয়েছি। ধীরেসুস্থে খাবার অভ্যেস করিয়েছি। ছোট মাছ বা নিরামিষ রান্নার প্রতি তার তেমন ঝোঁক ছিল না। একটু মাংস বা বড় মাছের একটা টুকরা পেলেই সে খুশি হতো।' তারপর একটু থেমে আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছেছিল বউঠান। আবার ধীরে ধীরে বলতে শুরু করেছিল। মুখে মিষ্টি হাসির একটা ঝালর ঝুলিয়ে আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বউঠান বলেছিল, 'একদিন খুব যত্ন করে মৌরালার চচ্চড়ি রাঁধলাম। মাছের সঙ্গে পেঁয়াজ, কাঁচা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লঙ্কা, তেল, সরষে, হলুদ, লবণ দিয়ে অল্প জলে রাঁধা ব্যঞ্জনটি আমি যখন রবির সামনে তুলে ধরেছিলাম, ও নাক সিঁটকেছিল। আমার জোরাজুরিতে একটু মুখে তোলার পর ওর চেহারা পাল্টে গিয়েছিল। শুধু বলেছিল—বাহ্! সেই থেকে রবি মৌরালার চচ্চড়ির ভক্ত।'

সেই মৌরালার ব্যঞ্জনটি তার পাতের একেবারে কাছেই ছিল। বাটিটির দিকে একটুক্ষণের জন্যও তাকাল না সে। বউঠানের কথায় কী রকম যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল রবিবাবু। তারপর পায়স মাখানো ভাতে ডান হাতটা ধুয়ে উঠে গেল। আমার ভেতরটা আঁকুপাঁকু করে উঠল। ভাবলাম, কি রে বাবা, বউঠানের কথায় অপমান বা কষ্টের কোনো আভাস তো ছিল না! বরং ছিল ঠাট্টা। তা বউঠানের সঙ্গে তো দেবরের ঠাট্টারই সম্পর্ক! এতে রাগ করার বা অপমান বোধ করার কোনো কারণ তো নেই! তাহলে রবিবাবু এরকম আচরণ করল কেন? তাহলে বউঠানের কথায় অন্য কোনো ইঙ্গিত আছে? অথবা হুল? ওই বয়সে, ঠাকুরবাড়ির সামান্য অভিজ্ঞতায় এক বালিকার পক্ষে বউঠানের কথার মাহাত্ম্য বুঝে উঠতে পারার কথা নয়। তা-ই হয়েছিল। বউঠানের কথা বা রবিবাবুর অদ্ভুত আচরণ—কোনোটারই মর্মার্থ আমি সেদিন বুঝে উঠতে পারিনি। তবে জীবনের শেষ পর্যন্ত যে বুঝতে পারিনি, তা নয়। বুঝতে যখন পারলাম, তখন বউঠান মানে আমাদের জ্যোতি দাদার বউ কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেছে। এত অন্তর্গত পারিবারিক ইতিহাস দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকে আমার জেনে ওঠার কথা নয়। ধীরে ধীরে যখন আমার বয়স বাড়ল, ঠাকুরবাড়িতে আমার প্রতিপত্তি ও পরিচিতি সুদৃঢ় হলো, তখন অন্দরমহলের এসব ইতিহাস জানার সুযোগ হলো আমার। জ্ঞানদা বউদি, বাড়ির পুরোনো দাসদাসী, খাস চাকর এবং অন্দরমহলের অন্যান্য নারী আমার জানার পথকে সুগম করেছেন।

মেজো বউদি নতুন বউঠানকে এক্কেবারে পছন্দ করতেন না। আড়ালে বলতেন, বাজার সরকারের মেয়ে। তিনি নিজে অবশ্য ধনীঘরের কন্যা ছিলেন। মেজো বউদির বাবা অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ধনী মানুষ ছিলেন। তাই ধনের বেশ অহংকার ছিল বউদির মধ্যে। অন্যান্য বউয়ের পিতারা ঠাকুরবাড়ির তুলনায় নিম্নবর্গের ছিলেন। ধনে আর সামাজিক মর্যাদায় তাঁরা একেবারেই উল্লেখের যোগ্য ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্র দাদার শ্বশুর তারাচাঁদ চক্রবর্তী গ্রাম্য গৃহস্থ ছিলেন। হেমেন্দ্র দাদা এবং বীরেন্দ্র দাদার স্ত্রী নীপময়ী ও প্রফুল্লময়ীর পিতা ছিলেন হরদেব চট্টোপাধ্যায়। শ্বশুরঠাকুরের অনেকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্রিত ছিলেন তিনি।

আমার বাবার কথাই ধরা যাক না। আমার বাবা তো ঠাকুরবাড়ির সেরেস্তার কর্মচারী। তাঁর বেতন ছিল মাসে মাত্র বারো টাকা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ওই সময় শ্বশুরঠাকুর তাঁর বাড়িতে আশ্রিত জামাইদের মাসিক হাতখরচই দিতেন মাসে দুশো টাকা করে। এই জামাইদের আহার, পরিধেয়, বাসস্থান খরচের সবই এস্টেটের টাকায় চলত।

যা-ই হোক, যা বলছিলাম, সম্পন্ন ঘরের কন্যা হবার অহংকারে অথবা অন্য কোনো গূঢ় কারণে জ্যোতি দাদার সঙ্গে কাদম্বরী বউদির বিয়েটি জ্ঞানদা বউদি একেবারেই মেনে নিতে পারেননি।

জ্যোতি দাদা মেজো বউদির খুব ভক্ত ছিলেন। তাঁর রাত্রিদিনের অধিকাংশ সময় কাটত বউদির ঘরে। বিয়ের পর কাদম্বরী বউঠান এই সান্নিধ্যে ভাগ বসাবে—এই আশঙ্কায় হয়তো জ্ঞানদা বউদি নতুন বউঠানের ওপর ক্রুদ্ধ ছিলেন।

মেজো বউদি কথায় কথায় নতুন বউঠানকে বাজার সরকারের মেয়ে বলতেন। এটা সত্যি যে, নতুন বউঠানের বাবা শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বাজার সরকারের নামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়া পরিবারের প্রয়োজনে ছোটখাটো কাজকর্মও নতুন বউঠানের বাবাকে করতে হতো। বাড়ির সামনের বাগানে গোল প্রাচীর দেওয়া, বাগানের ভেতরে হাঁটার রাস্তা তৈরি করা, আস্তাবলের সামনে দেয়াল তোলা—এসব কাজের তদারক তাঁকেই করতে হতো। এ ছাড়া শুনেছি, শাশুড়িঠাকরুনের বিছানা একবার উইলসন হোটেল থেকে দুরস্ত করেও এনেছিলেন শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁকে এই মর্যাদাহীন কাজ করতে হতো ঠাকুরবাড়িতে। নিম্নবিত্তের মানুষ বলে জ্ঞানদা বউদি শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি অবহেলা দেখাতেন। তাঁর কন্যার প্রতি অবহেলার পরিমাণ তো আরও বেশি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এটাই যে ঘৃণা করার একমাত্র কারণ, তা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হতো। আমিও তো এক অর্থে ঠাকুরবাড়ির বাজার সরকারের মেয়ে। আমার বাবাকেও তো এ বাড়ির ফাইফরমাশ খাটতে হতো। আমার জন্মের তিন বছর পর থেকে আমাদের বিয়ের কয়েক মাস আগ পর্যন্ত আমার বাবা তো এই পরিবারের সাধারণ কাজগুলো করে গেছে। *ভারতী* পত্রিকার জন্য চাঁদা সংগ্রহ, সত্যেন দাদাকে বোম্বাই যাওয়ার তিন শ টাকা পাথেয় পৌঁছে দেওয়া, রবিবাবু আর সত্যেন দাদা বিলেত থেকে ফিরলে তাঁদের জন্য চা খাবার সরঞ্জাম কেনা—এসব কাজ আমার বাবাই করেছে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে। কিন্তু কই, আমার বাবাকে তো তেমন করে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন না মেজো বউদি!

শুধু মেজো বউদি কেন, সত্যেন দাদাও কি কম যেতেন? জ্যোতিদার সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর বিয়ের প্রস্তাব এলে ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলেন সত্যেনদা। তিনি জ্ঞানদা বউদিকে আহমদনগর থেকে লিখেছিলেন—আমি যদি নতুন মানে জ্যোতি হতাম, তাহলে কখনোই এ বিয়েতে সম্মত হতাম না। তখন পর্যন্ত সত্যেনদা নতুন বউঠানকে দেখেনইনি। আসলে এ অপছন্দের কারণ অন্য। কন্যার চেয়ে কন্যার পিতাকেই যেন বেশি না-পছন্দ সত্যেনদার। তিনি জ্ঞানদা বউদিকে বলেছিলেন, শ্যামবাবুকে দেখেই তো বলা যায় তাঁর মেয়ে কখনো ভালো হবে না। নতুন বউঠানকে কখনো জ্যোতিদার উপযুক্ত বলে মনে হয়নি মেজো বউদি ও মেজদার।

যা-ই হোক, নতুন বউঠানকে না-পছন্দের আরও কারণ ছিল। নতুন বউঠানের বাপের বাড়ি ছিল কলকাতার হাড়কাটা গলিতে। কলকাতার ওই অংশটি কোনো কালেই বনেদি ছিল না। এ গলি জুড়ে ছিল বারাঙ্গনাদের বসবাস। তাই কলকাতার শিষ্ট মানুষজনের কাছে ওই অঞ্চলের মানুষজন অপ্রিয় ছিল। মেজো বউদি আর সত্যেনদা তাঁদের মতামত জানাবার সময় এই কথাটিও বিশেষ করে মনে রেখেছিলেন হয়তো।

তাঁরা চেয়েছিলেন নতুন দাদার সঙ্গে অন্য মেয়ের বিয়ে দিতে। কন্যাও ঠিক করে ফেলেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, ডাক্তার সূর্যকুমার চক্রবর্তীর বিলাতফেরত মেয়ের সঙ্গে জ্যোতিদার বিয়ে হোক। কলকাতায় এনে শ্বশুরঠাকুরকে কন্যাটি দেখিয়েওছিলেন তাঁরা। কিন্তু এই মেয়েকে তাঁর পছন্দ হয়নি; ডাক্তার সূর্যকুমার চক্রবর্তীর বিলাতফেরত কন্যাকে পুত্রবধূ হিসেবে পছন্দ না করার পশ্চাতে একটা কারণ থাকতে পারে। কন্যাটির পোশাক-আশাক আর আচরণ দেখে শ্বশুরঠাকুরের মনে এই প্রত্যয় জেগে থাকতে পারে যে, হয়তো সূর্যবাবুর মেয়েটি জ্ঞানদা বউদির বাড়া হবে। বিলাতে জীবনযাপন না করে শুধু ইংরেজিয়ানার সংস্পর্শে এসে সত্যেনের বউ যেভাবে উচ্ছন্নে গেছে, সূর্যবাবুর বিলাতফেরত মেয়েটি এ বাড়িতে এলে বাড়ির পরিবেশ একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাবে। দুই পুত্রবধূ মিলে বাড়িটাকে একেবারে মাথায় তুলে নাচবে। এ জন্য জ্যোতিদার সঙ্গে বিলাতফেরত কন্যাটির বিয়ে হয়নি। ব্যর্থতার গাঢ় অভিমানটি হয়তো তাঁদের মনে গুঞ্জরিত ছিল তখনো।

জ্যোতিদার বয়স তখন আঠারো আর জ্ঞানদা বউদির সতেরো। ফাগুন মাস। সত্যেন দাদাকে ফিরে যেতে হবে তাঁর কর্মস্থলে। জ্যোতিদাকেও সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিলেন তিনি। জ্যোতিদা এই প্রথম ঠাকুরবাড়ির অভিজাত বনেদিয়ানার বাইরে শান্ত গৃহস্থালির মধ্যে গেলেন। প্রথাবদ্ধ সংস্কারদীর্ণ ঠাকুরবাড়ির গুমোট আবহাওয়ার বাইরে আধুনিকতা-ছোঁয়া জ্ঞানদা বউদির সংসারে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন জ্যোতিদা। নিজের দিকে তাকানোর ফুরসত পেলেন তিনি। দেখলেন, তিনি একজন তরতাজা দেহের তরুণ, দিব্যকান্তি চেহারা তাঁর। মনের মধ্যে কিসের যেন একটা অনুরণন। এ অনুরণনের কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। জ্ঞানদা বউদির একান্ত সান্নিধ্যে তাঁর মনের অস্থির ভাব কমে আসতে লাগল। সত্যেনদা কাজে বেরিয়ে গেলে দুজনের হাতে অখণ্ড অবসর। সতেরো বছরের একজন তরুণী আর আঠারো বছরের এক তরুণ পরস্পরের সান্নিধ্যকে একান্তভাবে অনুভব করতে শুরু করেন। কাছাকাছি বসে নতুন নতুন বই পড়েন আর গান শোনেন। উভয়ের সামনে যেন নতুন জগতের ইশারা। এ জগৎ আলোকময়, রসসিক্ত।

জ্যোতিদা নাটক লেখেন আর মেজো বউদি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। সান্নিধ্য প্রগাঢ় হয়, নৈকট্যে ভালো লাগার রং লাগে মনে।

একবার সত্যেনদা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পাণ্ডুরঙের বাড়িতে গেলেন। সঙ্গে মেজো বউদি আর জ্যোতিদা। বিরাট পার্টি। পাণ্ডুরঙের মেয়ে আনা তড়খড়ের জন্মদিনের পার্টি। পারসি, মারাঠি, ইংরেজ, বাঙালি—কে না আমন্ত্রিত এই পার্টিতে! জ্ঞানদা বউদি অপরূপ সাজে সেজেছেন। হলের এক কোনায় দাঁড়িয়ে অপলক চোখে বউদির দিকে তাকিয়ে আছেন সেজদা। সবার হাতে হাতে স্কচ রেড ওয়াইনের গ্লাস। সত্যেনদা আর মেজো বউদিও বাদ নেই। ঠাকুরবাড়ির এই ছেলেটি মদে অভ্যস্ত নন। খালি হাতে এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পার্টিতে আসা নারী-পুরুষদের হাবভাব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন জ্যোতিদা। বিশেষ করে, চোখ রাখছেন মেজো বউদির ওপর। হঠাৎ দেখলেন, এক সাহেব বউদির সামনে গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছে বউদিকে। বউদির চেহারায় ভাবান্তর দেখলেন দূর থেকে জ্যোতিদা। বউদির করুণ, লজ্জাবনত, অসহায় চেহারা জ্যোতিদাকে বিচলিত করল। দ্রুত এগিয়ে গেলেন তিনি মেজো বউদির কাছে। সাহেবটি তখন বলছিল, 'অসাধারণ সুন্দর টুমি। হাউ বিউটিফুল ইউ আর!' সাহেবের কণ্ঠে মত্ততার সামান্য ছোঁয়া। কাঁপা গলায় সাহেব আরও বলল, 'এই পার্টিতে যত নারী আছে, তাদের সবার থেকে টুমি চার্মিং। ওহ্, ইন্ডিয়ান লেডি! ইউ আর মাস্টার পিস!' বলে একটু থেমেছিল সাহেবটি।

এই ফাঁকে মেজো বউদি দ্রুত বলে উঠেছিলেন, 'ওহ্, ম্যাকগ্রেগর। ইউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এ নটি বয়। এই হলে আরও অনেক নারী আছে, যারা রূপে এক-একজন উর্বশী। তাদের রূপের কাছে আমি অতি নগণ্য।'

'আমি উর্বশী-টুর্বশী চিনি না। আমি টোমাকে চিনি। চলো, আমার সঙ্গে, নাচবে টুমি।' বলেই বউদির হাত ধরতে গেল ম্যাকগ্রেগর।

আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারেননি জ্যোতি দাদা। ভেতরটা ক্রোধে জ্বলে উঠেছিল। ঠাকুরবাড়ির বউয়ের হাত ধরা! আমার মেজো বউদিকে অপমান করা!

দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জ্যোতিদা। মৃদু ধাক্কায় ম্যাকগ্রেগরকে সরিয়ে দিয়ে জ্যোতিদা ধমকে উঠেছিলেন, 'হাউ ডেয়ার ইউ আর? বউদির হাত ধরা! লিভ হার অ্যালোন। নইলে পরবর্তী ঘটনার জন্য আমি দায়ী থাকব না।'

ওই সময় জ্ঞানদা বউদি দ্রুত বলে উঠেছিলেন, 'আরে জ্যোতি! করো কী, কী করো? পার্টির এই-ই নিয়ম। হাত ধরা, মদ খাওয়া, একসঙ্গে নাচা—এসব ব্রিটিশদের কালচার। মেনে নিতে হয় এগুলো। তুমি শুধু শুধু উত্তেজিত হোয়ো না।'

'শুধু শুধু উত্তেজিত হচ্ছি আমি! যে বাড়ির বউয়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কথা বলা তো দূরের কথা দেখা করা পর্যন্ত সম্ভব নয়, সেই বাড়ির বউয়ের হাত ধরা কিছুই নয়!' রাগত কণ্ঠে জ্যোতিদা বললেন।

জ্ঞানদা বউদি স্মিত হেসে বললেন, 'ম্যাক সাধারণ মানুষ নয়, সত্যেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও। ওর অধিকার আছে আমার সঙ্গে ও রকম আচরণ করার।'

'অধিকার! তোমার ওপর ওর অধিকার আছে! ওই লালমুখো সাহেবের!' উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে জ্যোতিদার গলা।

বিরক্তভরা কণ্ঠে জ্ঞানদা বউদি এবার বললেন, 'আহ্ জ্যোতি! গোল কোরো না। সবাই আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, দেখো। তোমার দাদা এ পার্টির একজন সম্মানিত অতিথি। তাঁর সম্মানে আঘাত লাগার মতো কোনো কাজ কোরো না তুমি।'

বউদির কথা শুনে নীরবে সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন জ্যোতিদা। তিনি ভেবে উঠতে পারছিলেন না—নারীর হাত ধরার মধ্যে সম্মানের কী বিষয়টি লুকিয়ে আছে! দাদা তো দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ করছিল, সে এগিয়ে এল না কেন? তাহলে কী এসব ঘটনা দাদা-বউদির গা-সওয়া হয়ে গেছে? এই প্রথমবার সাহেবদের পার্টিতে এসেছেন তিনি। এসব পার্টির কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই তাঁর। তাই হয়তো ঠাকুরবাড়ির প্রথাবদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়মে আচ্ছন্ন জ্যোতিদার পক্ষে এসব কাণ্ডকারখানা সহ্য করা কঠিন। তার পরও বউদির হাত ধরাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না জ্যোতিদা। বউদির গায়ে অন্যের স্পর্শ! মুখ গোমড়া করে হলের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।

এই ঘটনাটি পরে রসিয়ে রসিয়ে আমাকে বলেছিলেন মেজো বউদি। বলেছিলেন এর পরের আরও কিছু ঘটনা। বাড়িতে ফিরে সেদিন আর কোনো কথা হয়নি তাঁদের মধ্যে। যাঁর যাঁর ঘরে শুতে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা। পরের দিন সত্যেনদা চলে গেছেন তাঁর কর্মস্থলে। দাসী-চাকররা নিত্যদিনের কাজ সাঙ্গ করে ঘরে ফিরে গেছে। চারদিক সুনসান। সামনে হারমোনিয়াম নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করছেন জ্যোতি দাদা। অভিমানের গাঢ় ছায়া তাঁর চোখে মুখে। পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে জ্যোতিদার থুতনিটা হঠাৎ নাড়িয়ে দিলেন বউদি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সাহেব, মুখ এত গোমড়া কেন? রাতের অভিমান বুঝি এখনো মন থেকে মুছে যায়নি?'

মেজো বউদির কথায় জ্যোতিদা হারমোনিয়ামের রিড থেকে চোখ তুললেন না, বউদির কথার কোনো জবাবও দিলেন না। নিবিষ্ট মনে রিডগুলো টিপে যেতে লাগলেন।

এই সময় মেজো বউদি জ্যোতিদার ডান হাতটি রিড থেকে সরিয়ে দিলেন। জ্যোতিদার থুতনিটা ওপর দিকে তুলে ধরলেন। গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'জ্যোতি, তুমি এ-ত অভিমানী কেন? সাহেবসুবোদের ও-রকমই চল। ওরা নিজের বউকে বাদ দিয়ে পার্টিতে অন্যের বউকে নিয়ে নাচে।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'ভালো করে খেয়াল করলে এবং চিনলে তুমি দেখতে ম্যাকের বউ অন্যজনের হাত ধরে নাচছে।'

এবার করুণ চোখে জ্যোতিদা বউদির দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমি জানি না, এসব নিয়মকানুন আমি মানি না। আমার বউদির হাত ধরে অন্য পুরুষ নাচবে, তা আমি মানতে রাজি নই। ক্রোধে আমার পিত্তি জ্বলে যায়।'

'তোমার দাদার তো রাগ হয় না। অন্য পুরুষের হাত ধরে আমার নাচার ব্যাপারে তার তো কোনো আপত্তি নেই।' তারপর কৌতুক মেশানো চোখ নেড়ে জ্ঞানদা বউদি আবার বলেছিলেন, 'তোমার এতে আপত্তি কিসের?'

চমকে বউদির চোখে চোখ রেখেছিলেন সেই দুপুরে জ্যোতিদা। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। থতমত খাওয়া গলায় কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন।

এই সুযোগে জ্ঞানদা বউদি বলে উঠেছিলেন, 'খুব ব্যথা লাগে বুঝি অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষ আমাকে স্পর্শ করলে?'

খুব ধীরে শান্ত স্বরে জ্যোতিদা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ।'

'কেন? কেন ব্যথা লাগে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করেছিলেন বউদি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার খুব কষ্ট হয়। খুব কষ্ট হয় অন্য পুরুষ তোমার ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বললে, তোমাকে ছুঁলে। কেন কষ্ট লাগে, জানি না।' বলেই মুখ নিচু করছিলেন জ্যোতিদা।

অনেকক্ষণ বউদি কিছু বললেন না। গাঢ় চোখে দেবরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে জ্যোতিদার মুখটি উঁচু করে ধরলেন। দেখলেন, জ্যোতিদার মুখমণ্ডল টকটকে লাল, সারা মুখে স্বেদবিন্দু। মেজো বউদি যা বোঝার বুঝে নিলেন।

হঠাৎ চঞ্চল কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, 'যাহ্, অনেক বেলা হয়ে গেছে। ওঠো ওঠো, স্নান করে এসো। খাবার সময় বয়ে যাচ্ছে।' বলে বসা থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন বউদি। তারপর দ্রুত নিজ কক্ষে চলে গেলেন, সেই দুপুরে।

এসব কারণেই জ্ঞানদা বউদি হয়তো কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে জ্যোতিদার বিয়েকে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু শ্বশুরঠাকুরের দৃঢ় সিদ্ধান্তের কারণে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়েছিল। বিয়ে হলে কী হবে, দাম্পত্য সুখ নতুন বউঠানের কপালে তেমন করে জোটেনি। প্রকাশ্যে জ্ঞানদা বউদি, পরোক্ষে সত্যেনদা নতুন বউঠানের বিরোধিতা করে গেছেন। আর একটা সময়ে চরম অবহেলা দেখিয়েছেন জ্যোতি দাদা। ব্যবসা, শিল্প-সংস্কৃতি—এসব কিছুর দোহাই দিয়ে নতুন বউঠানকে তেমন করে সময় দেননি তিনি। বিষিয়ে উঠেছিল বউঠানের দাম্পত্য জীবন। তবে এই ঘটনা বিয়ের অনেক পরের।

ওই সময় তাঁর জীবনে ভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছিল রবিবাবু। বধূ হিসেবে নতুন বউঠান ঠাকুরবাড়িতে এলে রবিবাবুর জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। তখন নতুন বউঠানের বয়স মাত্র নয় বছর। কিন্তু ওই সময় সাত বছর বয়সের রবিবাবুর মনে হয়েছিল—এই বধূটি অন্যান্য বউয়ের তুলনায় অন্য রকম। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে নতুন বউঠানকে অবলোকন করত রবিবাবু। কচি শ্যামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। বারে বারে মাথা থেকে ঘোমটা খসে যাচ্ছে। বর্ণকুমারী ও স্বর্ণকুমারী দিদি ঘোমটা মাথায় তুলে দিচ্ছেন। আবার পড়ে যাচ্ছে ঘোমটা। সেদিকে খেয়াল নেই নতুন বউঠানের। চারদিকে ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকাচ্ছে। কাজলকালো নিবিড় চোখে ভয়, না বিস্ময়—ছোট্ট রবিবাবু বুঝে উঠতে পারছে না। নতুন বউয়ের কাছে যেতে মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায় বড়—কিন্তু লজ্জা রবিবাবুকে জড়িয়ে ধরে। কী বলবে বউঠানের কাছে গিয়ে। তার চেয়ে দূরে দূরে থাকাই ভালো, দূর থেকেই দেখে যাওয়া ভালো।

মা রবিবাবুকে ডেকে পাঠান অন্দরমহলে। তিনি যে তেমন লেখাপড়া জানেন না। তাঁকে মহাভারত-রামায়ণ পড়ে শোনাবে কে? রবিবাবু ছাড়া আর কে? অন্য ছেলেদের হাতে সময় কোথায়? বীরেন্দ্রর না হয় মাথায় গোলমাল। কিন্তু অন্য ছেলেরা? দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, হেমেন্দ্র, সোমেন্দ্র—সবাই নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাঁরা সময় দিতে পারেন না মাকে। তাহলে কী কর্তামায়ের মহাভারত-রামায়ণ শোনার বাসনা অপূর্ণ থেকে যাবে? তা কী করে হয়? বাড়ির পুরোনো দাসী কর্তামায়ের কানে কানে বলে, 'আমাদের ছোটকর্তার গলা নাকি অপূর্ব। কণ্ঠে নাকি মধু ঢালা। সেদিন সরকারমশাই কর্তাকে বলছিলেন, ছোটকর্তা কবিতা না কী যেন লিখেছেন, সবাই নাকি ধইন্য ধইন্য করছে। আড়াল থেকে শুনলুম।'

'তাই নাকি?' গর্বের চোখে জিজ্ঞেস করেছিলেন কর্তামা।

সেই থেকে মাঝেসাঝে ভেতরবাড়িতে ডাক পড়ত রবিবাবুর। ওই যাওয়া-আসার পথে নতুন বউঠানের সঙ্গে চোখাচোখি হতো তার। রবিবাবু বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকত নতুন বউঠানের দিকে। পরনে উজ্জ্বল হলদে রঙের চেলি। চেলির রং শ্যামলা দেহের নতুন বউঠানকে অদ্ভুত মায়াময় করে তুলেছে। গা-ভর্তি গহনা নতুন বউঠানের। গলায় হার, হাতে চুড়ি। এ ছাড়া কঙ্কণ, বাজুবন্ধ। কানে কানপাশা। পায়ে নূপুর। কোমরে বিছা। মাথায় জড়োয়া সিঁথি আর টিকলি। দেখে দেখে রবিবাবুর চোখ ভরে না, মন ভরে না।

সুর করে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনায় রবিবাবু মাকে। ছেলের উচ্চারণ আর সুর শুনে মায়ের মনে তাক লেগে যায়। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন কর্তামা ছোট্ট রবিবাবুর। প্রশংসার টুকরাটাকরা কথা নতুন বউঠানের কানে আসে। মাঝেসাঝে উভয়ের দেখাদেখি হয় সিঁড়িতে, বারান্দায়, রান্নাঘরে, ছাদে। চোখে চোখে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই রহস্যময়ীর কাছাকাছি যেতে বড় ইচ্ছে করে রবিবাবুর। কিন্তু বর্ণকুমারী বাদ সাধে। নতুন বউঠানের একটু কাছাকাছি পৌঁছালেই বর্ণদি বলে ওঠেন, 'কী রে রবি, এখানে ঘুরঘুর করছ কেন? পড়ালেখা নেই? পড়া ফাঁকি দিয়ে অন্দরমহলে ঘুরঘুর করা! যাও যাও, পড়তে যাও।'

মুখ গোমড়া করে রবিবাবু সেখান থেকে সরে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ের সময় নতুন বউঠানের অক্ষরজ্ঞান ছিল আমারই মতন। খুব বেশি অক্ষর-পরিচয় তার ছিল বলে মনে হয় না। না হলে কেন তার জন্য ধারাপাত আর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কিনে আনা হয়েছিল! শুধু কিনে আনা নয়, রীতিমতো পড়াশোনায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে।

মাস্টারমশায়ের কাছে অন্দরমহলের স্ত্রী-কন্যা-পুত্র—সবাই পড়তে বসতেন। বসতেন বর্ণকুমারী, বসতেন শরৎকুমারী-স্বর্ণকুমারী, বসতেন স্ত্রী-কন্যারা আর বসত রবিবাবু। রবিবাবুর পাশ ঘেঁষে বসতেন সোম আর সত্যরা। মাস্টারমশায়ের চোখ এড়িয়ে বালক রবি অনেক চেষ্টা করে যেত নতুন বউঠানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কিন্তু নতুন বউঠানের মুখ আর চোখ থাকত ঘোমটার আড়ালে। তাই রবিবাবুর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হতো।

আমাদের বিয়ের ক'বছর পেরিয়ে গেলে আমার ভেতরের সন্ত্রস্ত ভাবটা কেটে গেল। প্রথম প্রথম খুব ভয় পেতাম রবিবাবুকে। দিনটা আমার কাটত ভালো, সন্ধের পর থেকে ভয়টা আমাকে জড়িয়ে ধরতে শুরু করত। রবিবাবু সান্নিধ্য চাইত আমার, কিন্তু দশ বছরের বালিকার পক্ষে সেই সান্নিধ্যের ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না। তাই রাতে একটা হিংস্র ভয় আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলত। এভাবে চলতে চলতে একসময় বেলা, মানে মাধুরীলতা জন্মাল। বিয়ের তিন বছরের মাথায় জন্মাল সে। সন্তান হবার পর আমি ধীরে ধীরে স্বামী, সন্তান এদের মাহাত্ম্য বুঝতে শুরু করলাম।

তো ওই সময় কাজের ফাঁকে ফাঁকে দিনে ও রাতে যখনই সময় পেত, রবিবাবু তার নতুন বউঠানের গল্প করত আমার কাছে। দেবর-বউদির কত খুঁটিনাটি কথাই যে সে বলে যেত আমার কাছে, তার সবটা মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে অনেক কথা ভুলতে পারিনি এখনো। ভোলার নয় বলে হয়তো এসব ঘটনা ভুলতে পারিনি অথবা রবিবাবু সেসব কথা যখন আমাকে বলেছে, তখন হয়তো ওসব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার অবকাশ আমার হাতে ছিল। তাই আজ এ-ত বছর পর, জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে যখন আমি একান্তভাবে আমার কথা লিখতে বসলাম, রবিবাবু আর নতুন বউঠানের সেই সব কথা আমার কলমে এসে ভিড় করতে লাগল। আমি যা শুনেছি রবিবাবুর কাছে, জ্ঞানদা বউদির কাছে, স্বর্ণদি, বর্ণদি, শরৎ দিদির কাছে আর পুরোনো দাসী-পাচকদের কাছে, তা-ই লিখে যাচ্ছি। লিখতে বসেছি নিজের কথা। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির বিরাট চৌহদ্দির মধ্যে আমি তো একমাত্র অধিবাসী নই। আমার চারপাশে কত মানুষজন! আত্মীয়-অনাত্মীয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকট সম্পর্কের, দূর সম্পর্কের ক-ত মানুষজন নিত্য গিজগিজ করছেন ঠাকুরবাড়ির অন্দর আর বহির্মহলে! যাঁদের আমি কাছ থেকে বা দূর থেকে দেখেছি, আমার লেখায় তাঁদের বাদ দিই কী করে? এই ঠাকুরবাড়িতে তাঁরাই তো আমাকে বাঁচার ও বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছেন। জ্ঞানদা বউদি, সত্যেনদা, জ্যোতিদা, নতুন বউঠান, শ্বশুরঠাকুর, আমার ছেলেমেয়েরা—এঁদের সবাইকে নিয়েই তো এ বাড়িতে আমার জীবন। আর রবিবাবু তো আছেই।

এই যে আমি রবিবাবু রবিবাবু করছি, এভাবে সম্বোধন করার রীতি ঠাকুরবাড়িতে মোটেই প্রচলিত ছিল না। ও গো, হ্যাঁ গো, কী বলছি, শুনছ বা নিদেনপক্ষে অমুকের মা, তমুকের বাপ বলে কাজ চালাতেন এ বাড়ির বধূরা আর পুত্ররা। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। শ্বশুরঠাকুরদের সময়ে তো দিনের বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর দেখা করার রীতিই ছিল না। রাত সুনসান হয়ে গেলে স্বামীরা স্ত্রীদের কক্ষে যেতেন। সত্যেনদা আর জ্ঞানদা বউদি ঠাকুরবাড়ির পুরাতন রীতিতে কুঠরাঘাত করেছেন। দিনের বেলায় এঁরা পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ, কথাবার্তা শুরু করলেন। এ জন্য অন্দরমহলে তাঁদের সমালোচনা কম হয়নি। থোড়াই পাত্তা দিয়েছেন তাঁরা এসব সমালোচনাকে। তাঁদের কল্যাণে আমাদের দাম্পত্য জীবন অনেকটা সহজ হয়েছে। দিনে-রাতে দেখাসাক্ষাতের একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু দেখাসাক্ষাৎ হলে কী হবে, সম্বোধনের পদ্ধতিটা সেই আগের মতোই থেকে গেছে। রবিবাবুও ওই প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করত। আমি তাকে 'শুনছ', 'ও গো' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতাম। কিন্তু এই লেখা যখন লিখতে বসলাম, আমি মহা ফাঁপরে পড়ে গেলাম। আমার স্বামীর প্রসঙ্গে বারবার ও গো, শুনছ ইত্যাদি লেখা শ্রুতিকটু ব্যাপার। তাই ভাবতে শুরু করলাম আমার স্বামীকে আমি আমার লেখাতে কী নামে সম্বোধন করব। ভাবতে ভাবতে একটি কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমার স্বামীর তো অনেক নামডাক। চারপাশের মানুষজন আর সাহিত্যমোদীরা তাকে রবিবাবু বলে সম্বোধন করেন। আমার স্বামী তাতে বিরক্ত হয় বলে মনে হয় না। বরং খুশিই হয়। তাই আমি ঠিক করলাম, তাকে আমি আমার লেখায় রবিবাবু বলে সম্বোধন করব। আমাদের সময়ে এরকম সম্বোধন বড় দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল। এ নিয়ে নিন্দামন্দও যে কম হবে, তা নয়। নিন্দার ভয়ে আমি যদি পিছিয়ে যাই, তাহলে আমার এই লেখা পূর্ণতা পাবে না। স্বামীর কথা বলতে গিয়ে আমি একটা গোলমালে পড়ে যাব। তাই আমি দুঃসাহসে ভর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে স্বামীর জায়গায় রবিবাবু লেখা শুরু করলাম। দুঃসাহসী হবই না বা কেন? এ বাড়ির বউদের দুঃসাহসী হতে শিখিয়েছেন জ্ঞানদা বউদি। তাঁর সাহচর্যে আমরা নির্ভীক হতে শিখেছি। স্বামীকে রবিবাবু বলার মন্ত্রটি আমার মেজো বউদির কাছ থেকে পাওয়া।

পাঁচ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছাদ ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। রবিবাবুর মুখে শুনেছি, সন্ধের আগে আগে কর্তামা মাদুর পেতে আড্ডায় বসতেন সেই ছাদে। চারপাশে বাড়ির মেয়েরা। সেই আড্ডার যে কোনো আগাপাছতলা ছিল, এমন নয়। সময় কাটানোর জন্যই সেই আড্ডা। অন্দরমহলের নারীদের তো তেমন কাজকর্ম ছিল না! ঘরকন্নার সকল কাজ সম্পন্ন করত দাসী-চাকররা। ফলে প্রচুর সময় ছিল ঠাকুরবাড়ির বউঝিদের হাতে। কর্মহীন মানুষের সময় কাটতে চায় না। সময়টা যেন ঠাকুরবাড়ির নারীদের কাঁধের বোঝা ছিল। কাঁধ থেকে বোঝা নামাবার জন্যই কর্তামা বাড়ির মেয়েদের নিয়ে গল্পগুজবের আসর বসাতেন। ব্রজ আচার্জির বোনই আসরের প্রধান সংবাদ পরিবেশনকারী। কোথা থেকে কোথা থেকে রাজ্যের সংবাদ নিয়ে আসতেন তিনি। সেই সংবাদের কোনটা বানানো আর কোনটা সত্যি, তা নিয়ে কর্তামা বা অন্য মেয়েরা মাথা ঘামাতেন না।

মাঝেসাঝে ওই আসরে রবিবাবুর ডাক পড়ত। মায়ের কাছে যাতায়াত করতে করতে তখন তার অনেক সাহস। ওই মেয়েলি আসরকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য সে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা কথা বলত। তার মুখে সূর্য পৃথিবী থেকে নয় কোটি মাইল দূরে—এ কথা শুনে সেদিনের আসর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

একদিন রবিবাবু আমাকে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'জানো, একদিন আমার মাথার মধ্যে ভীষণ একটা দুষ্টুমি ঢুকে গেল। মনে মনে ঠিক করলাম মাকে আজ তাক লাগিয়ে দিতে হবে। রামায়ণের কিছু পদ্যে অনুস্বার-বিসর্গ লাগিয়ে মায়ের সামনে আউড়ে গেলাম। মা তো আমার উচ্চারণের গলদ সম্পর্কে বুঝল না। ছোট্ট রবির সংস্কৃতজ্ঞান দেখে তো মা আনন্দে আত্মহারা! এখন খুব আফসোস হয়—মাকে আমি কী নিদারুণ ঠকানোই না ঠকিয়েছি।' একটু থেমে কী যেন গভীরভাবে ভেবেছিল রবিবাবু সেই বাদলা দিনে। চাপা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তারপর আবার ধীরে ধীরে বলেছিল, 'সেদিন আরেকজন আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থেকেছিল, সে নতুন বউঠান। বয়স্কদের আসরে বউঠানের থাকার কথা নয়। ছিলও না বউঠান। কী একটা কথা মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করতে ছাদে উঠেছিল সে। ঠিক ওই সময়ে বিদ্যার দিগ্‌গজ আমি কটরমটর করে শ্লোক আউড়ে যাচ্ছিলাম।' বলতে বলতে রবিবাবু হা হা করে হেসে উঠেছিল আমার সামনে।

বাইরে তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি। জানালার পাশে একটা কেদারায় বসে ছিল রবিবাবু। সেই বেলা তাকে কথায় পেয়ে বসেছিল। সব কথার মধ্যে ঘুরেফিরে নতুন বউঠানের প্রসঙ্গ চলে আসছিল।

সে-বার স্কুলের পণ্ডিতমশায়ের জন্য আমসত্ত্ব চুরি করতে গিয়ে রবিবাবু ধরা পড়ে গিয়েছিল নতুন বউঠানের হাতে। পণ্ডিতমশাই একবার ঠাকুরবাড়ির আমসত্ত্ব খাওয়ার জন্য ভীষণ লালায়িত হয়ে উঠলেন। রবিবাবুকে তিনি আকারে-ইঙ্গিতে জানালেন তাঁর বাসনার কথা। পণ্ডিতমশায়ের জন্য মায়ের কাছে আমসত্ত্ব চাইলে তো নানা কথা উঠবে। অত ঝুঁটঝামেলার দরকার কী? চুরিই সই। এক দুপুরে ছাদে শুকাতে দেওয়া আমসত্ত্ব চুরি করতে গিয়ে নতুন বউঠানের হাতে ধরা পড়ে গেল রবিবাবু। সেদিন আমসত্ত্ব পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল বউঠানের। কড়া রোদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল নতুন বউঠান। যেই না আমসত্ত্বে হাত দিল রবিবাবু, অমনি চোর চোর বলে আওয়াজ উঠল। চমকে পেছন ফিরে দেখে—বউঠান। রবিবাবুর ভয় খাওয়া চেহারা দেখে কুলকুল করে হেসে উঠেছিল সে। বলেছিল, 'এমনিতে তো কোনো গুণই নেই তোমার। চেহারাটাও বিদ্‌ঘুটে। তার ওপর চুরি বিদ্যা! তা বলি, চুরিবিদ্যা রপ্ত না করে ও-কাজে নামলে কেন?'

বউদির সব খোঁচা মেনে নিয়েছিল রবিবাবু সেই দুপুরে। শুধু মানতে পারেনি তার চেহারা সম্পর্কে বউঠানের অভিযোগ। চুরি করার অপরাধের কথা ভুলে তীব্র স্বরে রবিবাবু বলে উঠেছিল, 'কে বলে আমার চেহারা বিদ্‌ঘুটে! এই ঠাকুরবাড়িতে সব ভাইদের মধ্যে আমিই বেশি সুন্দর।'

এ ক'মাসের মধ্যে বউঠান কথাবার্তায় পোক্ত হয়ে গেছে। বিশেষ করে, ছোট্ট দেবর রবির সঙ্গে কথা বলতে কোনো জড়তাই অনুভব করে না সে। রবির কথা শুনে সে খলবল করে ওঠে, 'সব ভাইদের মধ্যে সুন্দর! তুমি! ফুহ্!' অনেক চেষ্টায় হাসি থামিয়ে বউঠান রবিবাবুর দিকে এগিয়ে যায়। রবিবাবুর মুখমণ্ডলের চারদিকে বাঁ হাতের তর্জনী ঘুরিয়ে বলে, 'তোমার এই মুখখানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো আয়নার সামনে নিয়ে গেছ? যদি নিয়ে যাও তাহলে আমার বলার কিছু থাকে না। আর যদি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানি ভালো করে না দেখে থাকো, তাহলে এখনই যাও। দেখে এসো কী বিদ্‌ঘুটে চেহারা তোমার।' কৃত্রিম গাম্ভীর্যে নতুন বউঠান কথাগুলো এমনভাবে বলল যে রবিবাবু ভীষণ দোটানায় পড়ে গেল।

বাড়ির সবার কাছে এত দিন শুনে এসেছে সৌন্দর্যে রবির বাড়া কেউ নেই। কী টুলটুলে গাল! কী মায়াভরা চোখ! নাকটা কী সরু! জ্ঞানদা বউদি তো বলেন, রবির চেহারা একেবারে মেয়েদের মতন। কোমল, মায়াময়। আর আজকে নতুন বউঠান বলছে তার চেহারার মতো বিশ্রী চেহারা আর কারও নেই। ধুত্তুরি। বউঠান ঠাট্টা করছে বোধ হয়! বউঠান এ বাড়িতে আসার পর থেকে দেখছি ঠাট্টার দিকে ঝোঁক বেশি তার। আবার ঠাট্টা বলেও ভাবে কী করে রবিবাবু? বউঠানের যে নির্লিপ্ত চেহারা! সত্য কথাটি বলার পর মানুষের চেহারার মধ্যে যে স্বাভাবিক নির্লিপ্ত ভাবটি ফুটে ওঠে, বউঠানের চেহারার মধ্যেও সেই রকম ভাব। তাহলে কি নতুন বউঠান সত্যিই সত্যি বলছে? তাহলে এত দিন পর্যন্ত এ বাড়ির সবাই তাকে মিথ্যে বলে বলে ঠকিয়েছেন? তাঁদের কথা শুনে শুনে রবিবাবুর মধ্যে নিজের চেহারার সৌন্দর্য সম্পর্কে যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল, তাহলে তা সর্বাংশে ভুল? ভাবতে ভাবতে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল রবিবাবুর। তার চেহারায় মনখারাপের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা লক্ষ করে বউঠানের দুষ্টুমি আরও বেড়ে যায়। ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে রবিবাবুর নাকটা টিপে ধরে বলে, 'তোমার নাকটা কী ভীষণ ত্যাবড়া রে বাবা।'

রবিবাবুর কেঁদে ফেলার উপক্রম হয়। কপালে-গালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখ দুটোও কী জলোজলো!

এবার নতুন বউঠান বুঝতে পারে, রবি তার ঠাট্টার মাহাত্ম্য ধরতে পারেনি। তার মশকরার ব্যাপারটিকে রবি সত্যি বলে বিশ্বাস করেছে। নইলে কেন তার মুখমণ্ডল ঘামে জবজবে! নইলে কেন তার এরকম পাগল-পাগল চেহারা!

বউঠান এবার খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, 'আরে রবি, তুমি কোনটা ঠাট্টা আর কোনটা সত্যি, তা-ও বোঝো না!' তারপর ডান হাতটি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বউঠান আবার বলে, 'তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। তুমি তো আসলেই অসাধারণ সুন্দর। এই ঠাকুরবাড়ির সব পুরুষের চেয়ে তুমি বেশি সুন্দর।' আবার একটু থেমে কী যেন ভাবল বউঠান। নিজের হাত-পায়ের দিকে নিবিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তারপর চাপা কণ্ঠে বলল, 'তুমি সত্যি সুন্দর, রবি। কী ফরসা চেহারা তোমার! আর আমার দিকে তাকিয়ে দেখো। শ্যামলা রং আমার! এই দেখো, আমার হাতগুলো দেখো—কী ময়লা ময়লা রং। আমার নাম কাদম্বরী না হয়ে শ্যামলী হওয়া উচিত ছিল।' বলেই আবার খলবলিয়ে হেসে উঠল নতুন বউঠান।

নতুন বউঠানের কথা শুনে সন্দিগ্ধ ভাব ফুটে উঠল রবির চেহারায়। অবিশ্বাসের চোখে বউঠানের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। এই সময় বউঠান রবির হাত ধরে বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথা! তা কী করেই বা বিশ্বাস করবে! আমি তো আগেই মিথ্যে দিয়ে সত্যকে ঢেকে দিয়েছি।'

এবার রবিবাবু কথা বলে উঠল, 'তুমি সত্যি বলছ বউঠান, আমি কদাকার নই, আমি সুন্দর। সত্যি বলছ!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি বলছি, তুমি সুন্দর,' বউঠান রবিবাবুর হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল।

বড় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস রবিবাবুর বুক চিরে বেরিয়ে এল। অস্বস্তিভরা চোখে স্বস্তির শ্যামল ছায়া দেখা দিল। মিষ্টি একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল রবিবাবুর চোখেমুখে।

'এবার বলো, নিজের ঘরের আমসত্ত্ব নিজে কেন চুরি করছিলে?' বউঠান জিজ্ঞেস করল।

'চুরি না, চুরি না,' রবিবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

এবার শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে বয়স্ক নারীর মতো বউঠান বলে উঠল, 'দেখো রবি, বয়সে আমি তোমার বড়। সম্পর্কেও বউদি। জানো তো, বয়সের চেয়ে মেয়েদের বুদ্ধি অনেক বেশি টনটনে। আমি বুঝেছি, এই ঠা ঠা রোদ্দুরে আমসত্ত্ব চুরি করার জন্যই তুমি ছাদে উঠেছ। তোমার চোখমুখ চোরের চোখমুখের মতো ছিল সেই সময়।' সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে হেসে বউঠান কথাগুলো একনাগাড়ে বলে থামল।

বউঠানের কথা শুনে চোরা চোখে তাকাতে লাগল রবিবাবু। ছোট্ট একটা কাশি তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর নিচু গলায় পণ্ডিতমশায়ের আমসত্ত্ব খাওয়ার ইচ্ছে, চুরি করে হলেও তাঁর সেই বায়না পূরণের প্রতিজ্ঞা—এসব আদ্যোপান্ত খুলে বলল। বউঠান গম্ভীর হয়ে সব কথা শুনল। শেষে বলল, 'তুমি চিন্তা কোরো না, রবি। কালকে স্কুলে যাওয়ার আগে আমসত্ত্ব পেয়ে যাবে। আমি সব ঠিকঠাক করে রাখব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই হলো রবিবাবুর সঙ্গে নতুন বউঠানের নৈকট্য দানা বাঁধার ইতিহাস। নানা সময়ে কারণে-অকারণে বউদির কথা বলতে খুব ভালোবাসত রবিবাবু। আমারও হাতে তখন প্রচুর সময়। বউঠানকে নিয়ে রবিবাবুর কথা শুনতে শুনতে আমার মধ্যেও কেমন যেন ঘোর লেগে যেত। আমি বলে উঠতাম, 'তারপর?'

তারপর? রবিবাবুর বয়স তখন বারোর মাঝামাঝি। সোমেন্দ্র দাদা তার দুবছরের বড়। উপনয়ন হলো দুই ভাইয়ের। তিন দিন হবিষ্যান্ন খেতে হবে। ওই সময় হবিষ্যান্ন খাওয়ারই রীতি। কর্তামা জীবিত তখন। শরীরটা বড় খারাপ যাচ্ছে তাঁর। সন্তানের উপনয়নের হবিষ্যান্ন মায়েরই রেঁধে দেওয়ার রেওয়াজ। অসুস্থতার কারণে কর্তামা হবিষ্যান্ন রান্না করতে পারলেন না। নতুন বউকে ডেকে বললেন, 'রবি-সোমের হবিষ্যান্নটা তুমিই রেঁধে দিয়ো, বউ। ছোট ছোট ছেলে আমার। যত্ন করে রেঁধো।'

যত্ন করেই রাঁধত নতুন বউঠান। উপনয়নের তিন দিন পরম যত্ন নিয়ে হবিষ্যান্ন রাঁধতে বসত নতুন বউঠান। তার বয়স তখন সাড়ে তেরো। বয়স কম হলে কী হবে, পাকা রাঁধুনি তখন সে। এই বাড়িতে বউ হিসেবে পাঁচ বছর ফুরাতে চলল। হেঁশেলের খোঁজখবর এর মধ্যে জানা হয়ে গেছে তার। দেবরদের কার কেমন রুচি, তখন কিছুই অজানা নয় তার। হবিষ্যান্নে গাওয়া ঘি মিশিয়ে দিত বউঠান। ফলে তার স্বাদ হতো অমৃতসমান। গন্ধে চারদিক আমোদিত হতো। নতুন বউঠানের রাঁধা হবিষ্যান্নের স্বাদ এখনো যেন রবিবাবুর জিবে জড়িয়ে আছে।

কী অপূর্ব তৃপ্তি নিয়ে রবিবাবু নতুন বউঠানের কথা বলে যেত, তা লিখে বোঝানো যাবে না। পিতার সঙ্গে তিন মাস ধরে হিমালয় ভ্রমণ শেষে ফিরে এল রবিবাবু। পিতার সঙ্গে তার যে ভীতিময় দূরত্ব ছিল, তা অনেকটা কেটে গেছে। পিতার সাহচর্যে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। বাইরের মানুষজনের সঙ্গে মেশার ফলে তার আচার-আচরণ আর কথাবার্তায় বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। এতে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে তার গুরুত্ব বেড়ে গেছে বহুগুণ। চাকর-দাসীদের চোখে সম্ভ্রম, বয়োজ্যেষ্ঠদের চোখে আদরের গাঢ়তা। নতুন বধূর চোখে স্নেহ ও আদরের আধিক্য রবিবাবু টের পাচ্ছে।

তার বয়স তখন বারো বছর দুমাস আর নতুন বউঠানের চৌদ্দ বছর এক মাস। বেঙ্গল অ্যাকাডেমির ছাত্র তখন রবিবাবু। স্কুলে নাম আছে বটে তার, কিন্তু যাতায়াত একেবারে নেই বললেই চলে। নানা অছিলায় সে তখন স্কুল ফাঁকি দিচ্ছে। আজ এটা, কাল ওটা। কোনো দিন সর্দি, কোনো দিন বাহ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাবল্য। কোনো দিন অধিক বৃষ্টি, কোনো দিন রোদ্দুরের প্রখরতা। আসলে এগুলো কিছুই নয়, প্রকৃত ব্যাপার হলো নতুন বউঠানের সাহচর্য। স্কুল ফাঁকি দিয়ে শুধু কিশোরী বউঠানের কাছাকাছি থাকা।

জ্যোতি দাদা তখন 'ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা' নিয়ে ব্যস্ত। এই সভার সম্পাদক তিনি। লেখালেখিতেও মগ্ন ভীষণ। তাঁর প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' আর ঐতিহাসিক নাটক *পুরু-বিক্রম* বেরিয়ে গেছে তখন। ঠাকুরবাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে তাঁর সুনাম সমস্ত কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে আত্মমগ্ন হয়ে ছবি আঁকছেন। এত ব্যস্ততার মধ্যে স্ত্রী কাদম্বরীকে তেমন করে সময় দিতে পারছেন না জ্যোতি দাদা। তাতে কী? রবিবাবু দাদার অনুপস্থিতি বুঝতে দিচ্ছে না নতুন বউঠানকে। স্কুল ফাঁকি দিয়ে বউঠানের সঙ্গেই সময় কাটাচ্ছে রবিবাবু। সমবয়সী অন্য দেবর যে ঠাকুরবাড়িতে নেই, এমন নয়। সোমেন্দ্রনাথ, মানে আমাদের সোমেনদাও তখন একই বাড়িতে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তেমন করে ভাব জমে ওঠেনি নতুন বউঠানের। যত ভাব আর খুনসুটি দেবর রবিবাবুর সঙ্গে। অলস দুপুরে কাছে বসে রবিবাবু 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' পড়ে শোনাচ্ছে তার নবীন বউঠানকে। মাঝেমধ্যে বউঠান জাঁতি দিয়ে কুচি কুচি করে সুপুরি কাটার দায়িত্ব দিত তার দেবর রবিকে। এই প্রসঙ্গে এসে রবিবাবু আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ত। চোখ বন্ধ করে বলত, 'বড় নিপুণ দক্ষতায় কুচি কুচি করে সুপুরি কাটতে পারতাম আমি। আমার চেহারা থেকে আরম্ভ করে প্রায় সব বিষয়ে খুঁত ধরলেও আমার সুপুরি কাটার দক্ষতায় বউঠান বেশ মুগ্ধ ছিল।'

তারপর চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে কী রকম যেন একটা ঘোরের মধ্যে রবিবাবু বলত, 'মাঝে মাঝে বউঠান আমার হাতটি ধরে বলত, আমাকে সুপুরি কাটার কৌশলটা শিখিয়ে দাও না গো। আমিও উপযুক্ত ছাত্রী পেয়ে বউঠানের হাতের ওপর হাত রেখে পরম যত্নে সুপারি কাটার কৌশল শিখিয়ে দিতাম।'

সুপুরি কাটার কৌশল রপ্ত হয়ে গেলে নতুন বউঠান একদিন রবিবাবুর গুরুত্ব অস্বীকার করে বসল। সেদিন নাকি খুব রাগ হয়েছিল তার। এই সময়ে প্রবল উৎসাহে কবিতা লিখে যাচ্ছে সে। 'মালতীপুঁথি' নামের খাতাটি কবিতা লিখে লিখে ভরিয়ে ফেলেছে। সে সময় নাটকও অনুবাদ করছে সে। সেই অল্পবয়সে শেক্সপিয়ারের *ম্যাকবেথ*-এর বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করে ফেলেছে রবিবাবু। তো ওই নাটকে হেকেটি নামে একটি ডাকিনী চরিত্র আছে। রবিবাবু বলল, 'সেই দুপুরে অভিমানে স্ফীত হয়ে নতুন বউঠানকে হেকেটি নামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বোধন করলাম। বউঠান নাক ফুলিয়ে চোখ লাল করে 'কী বললে তুমি' বলে আমার দিকে তেড়ে এল। আমি বউঠানকে খেপানোর মন্ত্র পেয়ে গেলাম।

'এরপর যখনই বউঠানকে রাগানোর প্রয়োজন হতো, ওই হেকেটি শব্দটি উচ্চারণ করলেই হতো। বউঠান লঙ্কাকাণ্ড রচনায় ব্যাপৃত হতো।' এই কথাগুলো বলে সেদিন রবিবাবু একেবারে চুপ মেরে গেল। আমি তারপর, তারপর বলে আরও কিছু জানতে চাইলাম। কিন্তু রবিবাবু সে বেলা বউঠান সম্পর্কে আর একটি শব্দও করল না।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির একটি ঘটনায় নতুন বউঠানের রূপ-রূপান্তর হলো। সে কর্তামায়ের মৃত্যু। বছর খানেক আগে কর্তামায়ের হাতে চোট লেগেছিল। সাধারণ চিকিৎসায় সে চোট না সারলে তাঁর হাতে অস্ত্রোপচারও করা হয়। দীর্ঘ এক বছর বহু ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা করা হয় কর্তামায়ের। হোমিওপ্যাথিক অ্যালোপ্যাথিক—দুই পদ্ধতিতেই চিকিৎসা করা হয় তাঁর। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তাঁর অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠল। শ্বশুরঠাকুরকে খবর দেওয়া হলো। তখন তিনি ডালহৌসিতে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তাঁকে টেলিগ্রাম করলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ দাদা। শ্বশুরঠাকুর এলেন না। পুনরায় টেলিগ্রাম করলেন বিজেনদা। শ্বশুরঠাকুর ডালহৌসি পাহাড় থেকে রওনা দিলেন বটে, কিন্তু সরাসরি কলকাতায় এলেন না। শান্তিনিকেতনে কিছু দিন কাটিয়ে তবে তিনি বাড়িতে ফিরলেন। তখন কর্তামায়ের শিয়রে যমদূত উপস্থিত। শ্বশুরঠাকুর বাড়িতে পৌঁছার পরদিনই কর্তামা মারা গেলেন।

মায়ের মৃত্যুতে রবিবাবুরা বড় অসহায় হয়ে পড়ল। বাড়িতে তখন অনেক নারী—বড়দি সৌদামিনী, শরৎকুমারী, বর্ণকুমারী, বয়স্ক বধূরা—সর্বসুন্দরী, নীপময়ী, প্রফুল্লময়ী। মাতৃহারা রবি আর সোমের দায়িত্ব নিতে কেউ এগিয়ে এলেন না। এগিয়ে আসার সমস্যাও আছে। এঁদের সবাই সন্তানবতী। নিজ নিজ সন্তানদের দেখভালে সময় চলে যায় সবার। রবি-সোমের দেখাশোনার বাড়তি দায়িত্ব কে নেবে?

মাতৃচ্ছায়া নিয়ে কাদম্বরী বউঠান এগিয়ে এল। ষোলো বছরের নতুন বউঠানের কাণ্ড দেখে সবাই অবাক। ও পারবে রবি-সোমকে আগলে রাখতে? কাদম্বরী বউঠান দেখিয়ে দিল তার সক্ষমতা। আর পারবেও বা না কেন? নিঃসন্তান বলে তার সন্তান লালনের ঝুঁটঝামেলা নেই। আর আছে দেবরদের, বিশেষ করে রবিবাবুর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। ভালোবাসা শব্দটি ব্যবহার করলাম। এত দিন পর্যন্ত রবিবাবু তার বউঠান সম্পর্কে যা কিছু বলে গেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা আমি সরল মনে বিশ্বাস করেছি। বিশ্বাস করেছি, নতুন বউঠান আমাদের বিয়ের ক'মাস পর দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গেছে। কিন্তু আমার এই বিশ্বাসে চির ধরিয়েছেন জ্ঞানদা বউদি।

মৃত্যুর বহুদিন পর একদিন বউদি রাগত কণ্ঠে আমাকে বলেছেন, 'শ্যাম গাঙ্গুলির মেয়েটি দেহের মানুষটিকে হারিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আফিম খেয়ে মরেছে হাড়কাটা গলির মেয়েটি।'

দেহের মানুষ! দেহের মানুষটি কে? আমি ভীষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'দেহের মানুষ মানে কী বউদি? কে দেহের মানুষ?'

বউদি এরপর আমার কথার কোনোই জবাব দেননি। আপন মনে গজর-গজর করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বউদির কথার রহস্যের মর্মোদ্ধার করতে আমার বেশ কয়েক বছর লেগে গিয়েছিল। যখন নতুন বউঠানের দেহের মানুষটিকে আবিষ্কার করতে পারলাম আমি, তখন আমার করার কিছুই নেই। কয়েকজন সন্তান হয়ে গেছে তখন আমার। দেশে-বিদেশে রবিবাবুর তখন অনেক সুনাম।

কর্তামায়ের মৃত্যুর পর শ্বশুরঠাকুর নাকি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বাস করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তেতলার ছাদের ঘরে থাকতেন বড়কর্তা। তাঁর তেতলার ঘরটি জ্যোতি দাদার অধিকারে আসে। সংস্কৃতিপাগল জ্যোতিদা সেখানে সাহিত্যসভা আর সংগীতসভার আয়োজন করেন। নানা ফুলের টবে সাজানো তাঁর ছাদের বাগান। এককালের প্রায় নিরক্ষর বধূ কাদম্বরী বউঠান ওই সাহিত্যসভার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। বিহারীলাল চক্রবর্তীর মতো ডাকসাইটে কবি জ্যোতিদার সাহিত্যসভায় আসা-যাওয়া করেন। ক্রমে এই কবির গুণগ্রাহী হয়ে উঠল নতুন বউঠান। নবীন কবি রবিবাবুর বড় প্রিয় ছিলেন বিহারীলাল। আসরের এক কোনায় বসে বড় মনোযোগ দিয়ে প্রিয় কবির আবৃত্তি শুনত রবিবাবু। বড় সুখের দিন তখন কাদম্বরী বউঠানের।

জ্যোতিদা তখন হাওয়া বদল করতে বউঠানকে নিয়ে যাচ্ছেন গঙ্গার ধারের কোনো বাগানে। একবার তাঁদের সঙ্গী হলো রবিবাবু। সেবার তারা উঠেছিলেন শ্রীরামপুরের কাছে চাঁপদানির নিজস্ব বাগানে। ওই বাগানবাড়িতে বসে বসে রবিবাবু লিখছে *ভানুসিংহের পদাবলী*। এক আঁধার ঘেরা সন্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে রবিবাবু একদিন আমাকে বলল, 'জানো ছোট, সে সময় আমাকে কবিতা রচনায় পেয়ে বসেছে। আমি একের পর এক কবিতা লিখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছি। সেদিন দুপুরে একটি কবিতা লিখলাম আমি। নাম দিলাম 'দৃষ্টি'। আমার ভেতরে বিপুল আকুলিবিকুলি। এই কবিতা নতুন বউঠানকে না শোনানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই। জ্যোতিদা সে সন্ধেয় কোথায় যেন গেছে। বউঠান মনমরা হয়ে বসে আছে বৈঠকখানায়। আমি আমার খাতাটি নিয়ে তার কাছে গেলাম। কোনো ভূমিকা ছাড়া আমি পড়ে যেতে লাগলাম—

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া
তারা উঠে ফুটি।

এইটুকু আবৃত্তি করে নতুন বউঠানের দিকে তাকিয়েছিল রবিবাবু। দেখেছিল, বউঠান তার দিকে আগ্রহান্বিত চোখে তাকিয়ে আছে। সে চোখে কিসের যেন নিবিড় ছায়া। চেহারার বিষণ্ন ভাবটি কেটে গেছে তার। আরও শুনবার আগ্রহ তার চোখেমুখে। রবিবাবু নতুন বউঠানের ব্যগ্রতা বুঝতে পারে। খাতার দিকে চোখ নামায় রবিবাবু। 'দৃষ্টি'র শেষাংশ পড়ে যেতে থাকে—

আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয় নিভৃতে—
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।
কখনো গাও নি তুমি কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান—
স্বপ্নময় শান্তিময় পূরবী রাগিণী তানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।
আকাশের পানে চাই সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।
একে একে সুরগুলি অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া।

পড়া শেষ হলে খাতার ওপর থেকে বউঠানের দিকে চোখ ফেরায় রবিবাবু। দেখে, বউঠান জানালার বাইরের ঘোর আঁধারের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রবিবাবু ডাকে, 'বউঠান।'

তার ডাকে সাড়া দেয় না বউঠান। রবিবাবু বিব্রত বোধ করে। ভাবে, তার কবিতা শুনে বউঠান রাগ করেনি তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতাটিতে কি বউঠানকে আঘাত দেওয়ার মতো কিছু আছে? আবার কবিতাটা সে মনে মনে আউড়ে যায়। 'দৃষ্টি' তো আসলে বউঠানকে নিয়েই লেখা। বউঠান কি বুঝতে পারেনি 'চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া, তারা উঠে ফুটি' বাক্যটির মর্মার্থ? ভাবতে ভাবতে বউঠানের পাশ ঘেঁষে বসে রবিবাবু। তার হাতের ওপর আস্তে করে নিজের হাতটি রাখে। ডান হাত দিয়ে তার মুখটি নিজের দিকে ঘোরাতেই রবিবাবু স্তম্ভিত হয়ে যায়। দেখে, বউঠানের দু চোখ থেকে জলের ধারা নামছে। গণ্ড পেরিয়ে অশ্রু ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে কোলে। বউঠান কাঁদছে, অঝোর ধারায় কাঁদছে। নবীন দেবর বউঠানের এই কান্নার তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারল না। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি তোমাকে ব্যথা দিয়েছি, বউঠান? আমার কবিতায় তুমি আঘাত পেয়েছ? তুমি আঘাত পাবে আমি ভাবিনি। আমাকে ক্ষমা করো, বউঠান।'

নতুন বউঠান নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রবিবাবুর চিবুকটি নাড়িয়ে দিল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'তুমি আমাকে ব্যথা দেবে কেন? রবি, তুমি তো আমারই। কী বলো, তাই না? মানুষ কখনো কি আপনজনকে আঘাত দেয়?'

'তাহলে তোমার কান্না! দু চোখ ভাসিয়ে অশ্রু নামছে...।' আমতা আমতা করে বলতে চাইল রবিবাবু।

বউঠান মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এ আমার আনন্দের অশ্রু। সুখে কাঁদছি আমি। এই প্রথম কেউ আমাকে নিয়ে কবিতা লিখল। ভেতরটা আবেগে আলুথালু হলো। তাই কাঁদছি।'

এই সময় রবিবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'জ্যোতিদাও তো লেখে। গান, কবিতা, নাটক। তোমাকে নিয়ে দাদা কোনো কবিতা বা গান লেখেনি? শোনায়নি কখনো তোমাকে?'

রবিবাবুর কথা শুনে বড় একটা শ্বাস বউঠানের বুক চিরে বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল তার পাশে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আমাকে তেমন করে সময় দেওয়ার সময় কোথায় তোমার দাদার হাতে! তার বেশির ভাগ সময় কাটে জ্ঞানদা বউদির ঘরে। তোমার দাদার কাছে জ্ঞানদা বউদি আমার চেয়েও আদরণীয়। আর কবিতার কথা বলছ? কবিতা বা গান হয়তো সে লেখে, তবে তা আমার জন্য নয়, তোমাদের মেজো বউদি জ্ঞানদার জন্য।'

বিস্মিত চোখে রবিবাবু নতুন বউঠানের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী শুনছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে! তার তো বিশ্বাস ছিল, জ্যোতিদা নতুন বউঠানকে খুব ভালোবাসে। নতুন বউঠানও তা-ই। নানা কর্মব্যস্ততার কারণে জ্যোতিদা হয়তো বউঠানকে সময় দিতে পারে না, তার পরও দাদার ভালোবাসায় ঘাটতি আছে বলে তো এত দিন তার মনে হয়নি! কিন্তু আজ নতুন বউঠানের কথা শুনে তো তার সমস্ত বিশ্বাস চূর্ণ হয়ে গেল। দুজনের ভালোবাসাবাসির যে দাম্পত্য চিত্র, তাহলে তা বাহ্যিক! আন্তরিক নয়!

'কী বলছ বউঠান তুমি?' অবাক বিস্ময়ে রবিবাবু জিজ্ঞেস করল। সে আরও বলল, 'তোমাদের দেখলে কী সুখী মনে হয়! দাদা যতক্ষণ বাড়িতে থাকে তোমার কাছে কাছে থাকে। এই যে বাগানবাড়িতে বেড়াতে আসা, ছাদের সাহিত্যসভা, সংগীতসন্ধ্যা—এসব কিছুর তাহলে কোনো মানে নেই!'

'ভাইদের মধ্যে তুমি সবার ছোট। সব ভাইকে তুমি ভালোবাসো, শ্রদ্ধা করো। সেই ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা কমুক, আমি চাই না। তুমি শুধু এইটুকু জেনে রাখো—তোমার দাদা আমাকে ভালোবাসায় রাঙায়নি, প্রয়োজনের সামগ্রী করে তুলেছে।' বউঠান বলল।

রবিবাবু সেদিন বউঠানের সব কথার মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেনি। কিন্তু এইটুকু বুঝেছে যে, বউঠান বড় অসুখী। বউঠান ভালোবাসার কাঙাল।

সেই সন্ধ্যায় রবিবাবু মনে মনে হয়তো এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে যেভাবেই হোক বউঠানকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে সে। পরিবার, সমাজ যেই-ই সামনে এসে দাঁড়াক, সবকিছুকে উড়িয়ে দিয়ে বউঠানকেই কাছে টানবে সে।

ছয়

জ্ঞানদা বউদির প্রথম সন্তান জন্মালে ঠাকুরবাড়িতে আনন্দের বাঁধ ভাঙল। কর্তামা তখনো জীবিত। ঠাকুরবাড়ির ভেতরে-বাইরে মিষ্টি বিতরণ করলেন তিনি। ধাইদের দামি শাড়ি দিলেন। আট টাকা পারিশ্রমিক দিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের প্রথম সন্তান বলে কথা!

কিন্তু সন্তানটি বাঁচল না বেশি দিন। দেশি আর সাহেব ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করেও সত্যেনদার প্রথম সন্তানকে বাঁচাতে পারলেন না। শোকে ভেঙে পড়লেন মেজো বউদি।

শোক জল হয়ে চোখ দিয়ে বেরোল না। বিপুল নিস্তব্ধতা তাঁকে ঘিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরল। কারও সান্ত্বনাবাণী তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। সত্যেনদা তখন কলকাতার বাইরে। কর্তামায়ের কাছে জ্ঞানদা বউদির শোকে পাথর হবার সংবাদ পৌঁছাল। তিনি তাঁকে পছন্দ করেন না, যেমন করে পছন্দ করেন না বড়কর্তা। কিন্তু শাশুড়ি হিসেবে এই শোকের দিনে নিজের ক্ষোভকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। সন্তানের মৃত্যুশোক কাকে বলে, তা শাশুড়িঠাকরুনের অজানা নয়। তাঁর নিজের প্রথম সন্তানও তো অকালে মারা গেছে। শত চেষ্টাতেও যমদূতকে ফেরানো যায়নি। ওই সময় বুকে চেপে বসা জমাট বেদনার কথা কর্তামায়ের মনে পড়ে যায়। তখন তাঁর মনের যে অবস্থা হয়েছিল, মেজো বউয়ের অবস্থাও তো এখন ঠিক সেই রকম। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র হারানোর স্মৃতিকেও তিনি ভোলেন কী করে! সেই সময়ের পুত্রহারা সর্বসুন্দরীর হাহাকার এখনো তাঁর কানে বাজে। তিনি নিজের ঘর থেকে ছুটে যান জ্ঞানদা বউদির ঘরে। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় মমতার হাত রাখেন। বলেন, 'ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, বউ। ঈশ্বরের কৃপায় তোমার শোক কেটে যাবে।' তারপর কণ্ঠকে নিচে নামিয়ে বলেন, 'এই সময় সত্যেনটা যদি বউয়ের পাশে থাকত...!'

শাশুড়ির এসব কথায় জ্ঞানদা বউদির কোনো ভাবান্তর হয় না। আগের মতো উদাস চোখে নির্বাক হয়ে বসে থাকেন।

চাকরি থেকে এই মুহূর্তে ছুটি পাওয়ার কোনো উপায় নেই সত্যেন দাদার। কর্তামা বললেন, 'এই সময় বউয়ের হাওয়া বদলের দরকার। গঙ্গার ধারে নিয়ে যাও ওকে। নদী সন্তাপ-সংহারক। জলস্পর্শ মেজো বউয়ের বেদনা ভুলিয়ে দেবে।' হেমেন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন, 'সত্যেন নেই। দায়িত্ব তোর ওপর বর্তায়। তুই মেজো বউকে পেনেটির বাগানবাড়িতে নিয়ে যা। গাছপালাবহুল গঙ্গার ধারে বাগানটি। মেজো বউয়ের ভালো লাগবে।'

মায়ের কথা শুনে জ্যোতিদা এগিয়ে এলেন। বললেন, 'মা, হেমেনদার সঙ্গে আমিও যাই! হয়তো আমার সাহচর্য বউদির ভালো লাগবে।' মায়ের উত্তরের অপেক্ষা না করে জ্যোতিদা আবার বলে উঠলেন, 'যাই, গোছগাছ শুরু করে দিই তাহলে।'

নতুন বউঠানের ঘর জ্ঞানদা বউদির কয়েক ঘর পরে। জ্ঞানদা বউদির শোকার্ত চেহারা, নির্বাক আর্তনাদের কথা তার কানে আসে। দাসীরা এসে জ্ঞানদা বউদির চিত্রার্পিতের মতো বসে থাকার কথা বলে যায়। বউদির ঘরে যাবার জন্য মনটা আকুলিবিকুলি করে নতুন বউঠানের। কিন্তু জ্ঞানদা বউদির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে যাবার উপায় নেই। বউদি যে তাকে ঘৃণা করেন! তার পরও ঘৃণাকে উড়িয়ে দিয়ে তার মন বউদির ঘরে যেতে চায়। কিন্তু বউদি যদি ঘরভর্তি মানুষের সামনে তাকে তিরস্কার করেন! যদি বলেন হাড়কাটা গলির মেয়েটি আমার ঘরে কী জন্য এসেছে? যদি বলে ফেলেন, বারাঙ্গনাপল্লির মেয়েটিকে আমার ঘর থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে বলো। বউদির মুখ আলগা। এরকম অপমান বউদি আগেও কয়েকবার করেছেন। সে সময় কোনো প্রতিবাদ করেনি নতুন বউঠান। কপালের লিখন বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু আজ সেরকম ভর্ৎসনার মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করছে না নতুন বউঠানের। তাই জ্ঞানদা বউদির ঘরে যাওয়ার প্রবল আকুতিকে হৃদয়ে চেপে রাখল নতুন বউঠান। ঠিক করল, মেজো বউদির ঘরে এখন যাবে না। সময় ও সুযোগ বুঝে পরে একবার যাবে।

ওই সময় ঘরে ঢোকেন জ্যোতিদা। স্ত্রীকে কিছু না বলে নিজের কাপড়চোপড় গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নতুন বউঠান জিজ্ঞেস করে, 'কোথাও যাচ্ছ বুঝি?'

জ্যোতিদার সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'হ্যাঁ।'

'কোথায়?' ব্যগ্রভরে কাদম্বরী বউঠান জিজ্ঞেস করে।

জ্যোতিদা বলেন, 'পেনেটির বাগানে। জ্ঞানদা বউদির সঙ্গে। মা বললেন, এই সময় তার হাওয়া বদল দরকার।'

'মা তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন?' নতুন বউঠান জিজ্ঞেস করে।

পোশাক-আশাক গোছানোর কাজে আরও ব্যাপৃত হয়ে পড়ে জ্যোতিদা নিচু স্বরে বলেন, 'হ্যাঁ।'

প্রচণ্ড মিথ্যে কথাটি নির্বিকারচিত্তে নিজের স্ত্রীর সামনে বলে গেলেন জ্যোতিদা। মা তো দায়িত্ব দিয়েছেন হেমেন্দ্রদাকে, জ্যোতিদাই তো আগ বাড়িয়ে এ কাজে নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছেন। এই সত্যটি জ্যোতিদা স্ত্রীর কাছে বললেন না। বরং ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য করুণ কণ্ঠে জ্যোতিদা বলে উঠলেন, 'আহা বেচারি জ্ঞানদা বউদি! কী চেহারা কী হয়ে গেছে! একেবারে বোবা হয়ে গেছে বউদি। এরকম আর দু-চার দিন থাকলে হার্টফেল করবে। বউদির এই সময় হাওয়া বদল ভীষণ জরুরি। সত্যেনদা তো বাড়িতে নেই। বউদির এই গুরুদায়িত্ব এখন আর কে নেবে, বলো? তাই আমাকেই যেতে হচ্ছে বউদির সঙ্গে।'

কাদম্বরী বউঠান কাতর কণ্ঠে বলল, 'আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও না গো!' তারপর একটুক্ষণ থেমে অনেকটা স্বগত কণ্ঠে আবার বলল, 'মেজো বউদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে পছন্দ করেন না। আজ পর্যন্ত আমি জানতে পারলাম না আমার দোষ কী। হ্যাঁ, আমি একটু শ্যামলা। এ বাড়ির অন্য বউদের মতো ফরসা রং নয় আমার। আমাকে ঘৃণা করার এটা তো একটা কারণ হতে পারে না। হ্যাঁ, আমার বাবা এই বাড়ির বাজার সরকার। সাধারণ ঘরের মেয়ে আমি। এই সত্যটি তো কখনো অস্বীকার করিনি আমি! আর শিক্ষার কথা যদি বলো, আমার মতো মেজো বউদিও তো এই ঠাকুরবাড়িতে নিরক্ষর অবস্থায় এসেছিলেন। জ্ঞানদা বউদি কেন, সব বউ-ই তো এ বাড়িতে নিরক্ষর অবস্থায় এসেছেন। এখানে আসার পর জ্ঞানদা বউদি যেমন শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন, শিক্ষায় তাঁর চেয়ে আমিও পিছিয়ে নেই। তার পরও আমার প্রতি বউদি তীব্র বিতৃষ্ণাই দেখিয়ে গেলেন।'

'এখন আমার যাবার মুহূর্তে এসব কথা বলছ কেন?' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন জ্যোতিদা।

নতুন বউঠানের চোখ দুটো হঠাৎ ধপ করে জ্বলে উঠল। কী যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল সে। সংযত কণ্ঠে বলল, 'আমি মেজো বউদির ভুলটা ভাঙাতে চাই। আমি যে ঘৃণার পাত্রী নই—এই কথাটা স্পষ্ট করতে চাই আমি বউদির সামনে। বাগানে তুমি থাকবে, তোমার সামনে মেজো বউদির কাছে আমার মনের কথাটি উজাড় করে বলতে পারব।'

জ্যোতিদা বললেন, 'মেজো বউদি এখন শোকে পাথর। এই সময় তুমি জড়াতে চাও বাছবিচারের দ্বন্দ্বে!' তারপর ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলেন, 'কী অদ্ভুত সিদ্ধান্ত তোমার!'

বউদি স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এসব না-ই বা করলাম। এই শোকের দিনে তাঁকে সান্ত্বনা তো দিতে পারব!' তারপর আবদারের গলায় বলল, 'তোমার কোনো কথাই শুনছি না আমি। আমি তোমার সঙ্গে যাবই।'

এবার জ্যোতিদা কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'পাগলামি রাখো। এখন তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আর সান্ত্বনার কথা বলছ? সান্ত্বনা তো এখনই গিয়ে দিয়ে আসতে পারো। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য গঙ্গার ধারের বাগানে যেতে হবে নাকি?'

নতুন বউঠান জ্যোতিদার সঙ্গে আর একটি কথাও বলল না। বুঝল, মেজো বউদির অনিচ্ছার চেয়ে জ্যোতিদার অনাগ্রহ বেশি। কিন্তু কেন? জ্যোতি তাকে অবহেলা করছেন, না অপ্রয়োজনীয় মনে করছেন? জ্যোতি কি মনে করছেন সে সঙ্গে গেলে তাঁর আর মেজো বউদির সান্নিধ্য বিঘ্নিত হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যোতিদা, হেমেনদা, সারদাপ্রসাদ আর সৌদামিনীরা জ্ঞানদা বউদির হাওয়া বদলের সঙ্গী হলেন। গিয়ে উঠলেন পেনেটির বাগানবাড়িতে। এই বাগান বাড়িটি শ্বশুরঠাকুরের পিতা দ্বারকানাথ কিনেছিলেন একসময়। বৈষ্ণব দ্বারকানাথের ধর্মমতের পরিবর্তন হলো ঘটনাচক্রে। ধর্মাচরণের চেয়ে পানভোজনে বেশি আসক্ত হয়ে পড়লেন তিনি। প্রথম প্রথম বসতবাড়িতেই সাহেবসুবোদের নিয়ে আসর জমাতেন দ্বারকানাথ। কিন্তু পত্নী দিগম্বরী দেবী এসব মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর কঠোর আপত্তির মুখে দ্বারকানাথ পানাহারের স্থান পরিবর্তন করলেন। কয়েকটি বাগানবাড়ি কিনলেন তিনি। সেসব বাগানবাড়িতে তিনি ভোজসভা আর নৃত্যগীতের আসর বসাতেন। পেনেটির বাগানবাড়িটি সে সময়েরই কেনা।

বহুমূল্য আসবাবপত্রে সজ্জিত এই বাগানবাড়ি। এখানেই ঠাঁই নিলেন জ্ঞানদা বউদিরা।

শোকে বিহ্বল জ্ঞানদা বউদিকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন জ্যোতিদা। তাঁর খাওয়া, স্নান করা, নদীর ঘাটে বেড়াতে যাওয়া—সবকিছুতেই জ্যোতিদার তদারকি। কিসে বউদির সুখ, কিসে বউদির তৃপ্তি, কিসে বউদি একটু হাসবে—এ নিয়ে জ্যোতিদার ভাবনার অন্ত নেই। বাগানবাড়ির যেখানে জ্ঞানদা বউদি, সেখানেই জ্যোতিদা। অন্য সবাই নিজেদের আনন্দ বা কথায় মগ্ন থাকলেও জ্যোতিদার সকল আনন্দ আর উৎকণ্ঠা তাঁর প্রিয় জ্ঞানদা বউদিকে ঘিরে। বউদির পাশে বসে জ্যোতিদা কখনো *শকুন্তলা* পড়ে শোনাচ্ছেন, কখনো গলা ছেড়ে গান শোনাচ্ছেন—'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে'।

যে কদিন বউদির সঙ্গে জ্যোতিদা থাকলেন, একবারের জন্যও কাদম্বরী বউঠানের কথা ভাবলেন না। একটা চিঠিও লিখলেন না স্ত্রীকে। অশোকবনে সীতার মতো একাকী জীবন কাটতে লাগল নতুন বউঠানের। স্বামীবিচ্ছিন্ন নতুন বউঠানের মনে তখন সন্দেহের ঝড় বইতে শুরু করল। বেদনার হাহাকারে সে দীর্ণ হতে লাগল। হতাশা, নিরানন্দ, উদাসীনতা তাকে ঘিরে উন্মাতাল নৃত্য শুরু করল। এই সময় তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল আমার রবিবাবু।

তখনো আমার বিয়ে হয়নি। রবিবাবুকে ওই সময় ঘিরেবেড়ে রাখার কেউ নেই। মা মারা গেছেন অনেক আগে। বাবা থেকেও নেই। সন্তান বিষয়ে তাঁর উদাসীনতা কলকাতা-বিখ্যাত। জ্ঞানদা বউদির পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে সময় কাটত রবিবাবুর। জ্যোতিদা জ্ঞানদা বউদি সম্পর্কে মাত্রাধিক সচেতন হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠার পর থেকে রবিবাবু সে বাড়িতে যাতায়াত অনেকটা কমিয়ে দেয়। সে সময় থেকেই কাদম্বরী বউঠানের ঘরেই নিজের ঠাঁই করে নেয় রবিবাবু।

কখনো কখনো নতুন বউঠানের কথা অনর্গল দিনের পর দিন রবিবাবু আমার কাছে বলে যেত। আবার কোনো কোনো সময় এ প্রসঙ্গে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যেত সে। আমি জিজ্ঞেস করলেও চুপচাপ থাকত। কখনো কখনো বউঠান-প্রসঙ্গ সচেতনভাবে এড়িয়ে যেত বলেও আমার মনে হতো।

দীর্ঘদিন বউঠান প্রসঙ্গে রবিবাবু কোনো কথা বলছে না। কাব্যরচনায় মগ্ন সে। নানা সভাসমিতিতে যাওয়া-আসা শুরু হয়ে গেছে তার। আমাকে সময় দেওয়ার সময় কমে এসেছে তার। এক সন্ধেয় কোনো এক সভায় বক্তৃতা দিতে যাওয়ার কথা। সেজেগুজে তৈরি হয়ে ছিল সে। ওই সভার উদ্যোক্তাদের একজন জানিয়ে গেল, আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ মারা গেছেন। এ জন্য সভা মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছে। পরে কোনো একদিন অনুষ্ঠানটি হবে।

রবিবাবু বৈঠকখানা থেকে বেজারমুখে ঘরে ফিরে এল। বারান্দার হেলান কেদারায় চুপচাপ আধশোয়া হয়ে থাকল অনেকক্ষণ। আমি রথীকে ঘুম পাড়িয়ে তার পাশে এসে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি মন খারাপ?'

'একটু তো খারাপ লাগছেই। গোটা দিন প্রস্তুতি নিয়েছি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য! তবে আমার মন খারাপের এটা বড় কারণ নয়। দুঃখ লাগছে সভাপতি মহোদয়ের জন্য। বড় ভালোবাসতেন আমাকে। হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে বড় আফসোস লাগছে।'

এত দিনে আমি জেনে গেছি রবিবাবুর পছন্দের প্রসঙ্গ কোনটি। তার সকল ভালোবাসা কোন জায়গাটিতে জমাট বেঁধে আছে। তাড়াতাড়ি আমি প্রসঙ্গ পাল্টালাম, 'তোমার নতুন বউঠানকে ভুলে গেলে নাকি?'

চকিতে রবিবাবু আমার দিকে মুখ ফেরাল। দ্রুত জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'না বলছিলাম কি, দীর্ঘদিন তো বউঠান সম্পর্কে কিছু বলো না, তাই ভাবলাম, বউঠানের স্মৃতি তোমার মনে ঝাপসা হয়ে এসেছে বোধ হয়।' আমি বললাম।

রবিবাবু ধীরে ধীরে বলল, 'বউঠানের স্মৃতি কি ভোলার? আমৃত্যু বউঠানের স্মৃতি মনের গভীরে জ্বলজ্বল করবে।'

রবিবাবুর এ কথা শুনে আমার ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। কী রকম যেন গভীর কালো একটা ছায়া আমার হৃদয়ের সকল আলোকে গ্রাস করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলল নিমেষেই। তাহলে কি রবিবাবুর মনে আমি এখনো ঠাঁই করে নিতে পারিনি? তার দু-দুটি সন্তান গর্ভে ধারণ করলাম, তার সকল দুঃখের ভাগীদার হওয়ার চেষ্টা করে গেলাম। কিন্তু আজ রবিবাবুর কথা শুনে আমার এইটুকু প্রতীতি হলো যে তার কাছে আমি মূল্যহীন, নিতান্ত সাধারণ একজন নারী ছাড়া আর কিছু নই।

যে নারীটি অনেক দিন আগে মারা গেছে, সে রবিবাবুর হৃদয়ে থেকে গেছে অবিনশ্বর। বউঠান প্রসঙ্গে সে উচ্ছ্বসিত, তার জন্য রবিবাবুর হৃদয় অবারিত। আমি বুঝে গেছি, রবিবাবুর কাছে বউঠানের তুলনায় আমি অতি নগণ্য। নিজেকে সংযত করে নিচু স্বরে বললাম, 'না, দীর্ঘদিন বউঠান সম্পর্কে কিছু বলছ না তো! তাই জিজ্ঞেস করলাম আর কি! ওই যে জ্যোতিদা জ্ঞানদা বউদির হাওয়া বদলের সঙ্গী হলো, কিছুদিন পর ফিরেও এল কলকাতায়; তারপর কী হলো জানতে ইচ্ছে করছে বড়।'

রবিবাবু স্বাভাবিক গলায় বলতে শুরু করল, 'সেবার জ্যোতিদা ফিরে এলে বউঠানের কী অভিমান! চুপচাপ বসে থাকল নিজের ঘরে। জ্যোতিদার সে কী কাকুতিমিনতি! অনেক সাধাসাধির পর বউঠানের মান ভাঙল। ওই দিন দাদা বলল, কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা বেড়াতে বেড়িয়ে পড়ব। আরে রবি, তুইও যাবি কিন্তু আমাদের সঙ্গে। আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠল তখন। কী আশ্চর্য, দাদা বুঝল কী করে যে আমিও যেতে চাইছি তাদের সঙ্গে। বেড়ানোর লোভে নয়, বউঠানের সান্নিধ্যের লোভে।'

রবিবাবু এসব কথা বলে গেল বাইরের অন্ধকারে চোখ রেখে। একবারও ফিরে তাকাল না আমার দিকে। ফিরে তাকালে বুঝতে পারত তার শেষের বাক্যটি এই বালিকাবধূর হৃদয় কীভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। তখন আমাদের ছয় বছরের বৈবাহিক জীবন। ভালোবাসা, সান্নিধ্য, হৃদয়—এসবের মাহাত্ম্য তখন আমার কাছে অবোধগম্য নয়। তার পরও আমি বুক বেঁধে থাকলাম। রবিবাবুকে কিছুই বুঝতে দিলাম না। এ বাড়িতে আসার পর একটা জিনিস আমার মধ্যে বেশ জায়গা করে নিয়েছে—সহিষ্ণুতা। অনেক কষ্টের মধ্যেও আমি নিজেকে সংযত রাখার বিদ্যাটি শিখে ফেলেছি। বেদনায় এই বুক ভেঙে যাচ্ছে যখন, তখনো মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখার কৌশলটি কেমন করে যেন আমার রপ্ত হয়ে গেছে। বউঠানের সান্নিধ্য, আমৃত্যু অম্লান থাকবে বউঠানের স্মৃতি—এসব কথা আজও রবিবাবুর পাশে বসে যখন শুনে যাচ্ছিলাম, তখন আমার ভেতরে কুরুক্ষেত্রের হাহাকার আর রক্তাক্ততা। তার পরও আমার চেহারা স্বাভাবিক, কণ্ঠ অকম্পিত। আমি রবিবাবুর কাছে জানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইলাম, তারপর কী হলো। রবিবাবু সেই সন্ধ্যায় অনর্গল বলে গেল বউঠানের স্নেহ-ভালোবাসায় সিক্ত হবার কথা। বলবার সময় সে হয়তো ভেবেছে ভবতারিণী গ্রামের মেয়ে। সারল্য তার ভূষণ। তার ভালোবাসা-সান্নিধ্যের গূঢ়ার্থ সে আর কতটুকুই বা বুঝবে! তার বউঠান প্রসঙ্গে কথা বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই সন্ধ্যায় আমি গ্রামীণ সহজতায় মনোযোগী শ্রোতা হয়েই থেকেছি।

একদিন জ্যোতিদা স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লেন, সঙ্গে রবিবাবু। প্রথমে গেলেন চন্দননগরে। তেলেনিপাড়ার বাঁড়ুয্যেদের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সুসম্পর্ক। এই বাঁড়ুয্যেদের বাগানে গিয়েই উঠলেন তাঁরা। পাশেই গঙ্গা। দাদা-বউঠানকে পাড়ে বসিয়ে রেখে সাঁতরে গঙ্গা পারাপার করছে রবিবাবু। তার এই দুঃসাহসী কাণ্ড দেখে আঁতকে উঠছে নতুন বউঠান। স্বামীর হাত ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'তুমি ওকে বারণ করো। গঙ্গার মাঝখানে ডুবে যাবে যে!'

স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করার জন্য জ্যোতিদা রবিবাবুকে ধমক দিচ্ছেন, 'এই রবি, করছিস কী তুই? মাঝপথে ডুবে যাবি যে। তোর বউঠান ভীষণ উদ্বিগ্ন হচ্ছে তোর জন্য।'

রবিবাবুর কাছে দাদার ধমক তখন অপাঙ্‌ক্তেয়, মূল্যহীন। মূল্যবান—নতুন বউঠানের আতঙ্কিত চোখ দুটো। রবি যে শুধু সাহিত্য লেখে, তা-ই নয়, গঙ্গায় নির্ভয়ে সাঁতারও কাটতে পারে। নিজের দুঃসাহসের পরিচয় দিতে পেরে রবিবাবু বেপরোয়া। দাদার ধমকের জবাবে সে তাই বলেছে, 'ও কিছু না, দাদা, এর চেয়ে দ্বিগুণ বড় পদ্মাও সাঁতরে পার হতে পারব আমি।' বলে চোরা চোখে তাকিয়েছিল বউঠানের দিকে। রবিবাবু সেদিন নতুন বউঠানের চোখে বিস্ময় আর ভালোবাসার মাখামাখি দেখেছে। বউঠান সেদিন মুখে কিছু বলেনি বটে, কিন্তু চোখ তার সকল জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছে।

বেড়াতে গিয়েও জ্যোতিদা কিন্তু মাঝেমধ্যে কাগজ-কলম নিয়ে বসে যেতেন। নাটকের কোনো একটা প্লট মাথায় এলেই লেখায় নিমগ্ন হয়ে পড়তেন। তখন কাদম্বরী বউঠান তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালে বাঁ হাত দিয়ে বাতাসে তরঙ্গ তুলে হাঁক দিতেন, 'রবি, তুই গেলি কোথায়? তোর বউঠানকে নিয়ে একটু ঘুরে আয় না বাগান থেকে।'

রবি আর বউঠান বেরিয়ে পড়ত। বাগানে কত ধরনের ফলের গাছ—আম, জাম, কুল, কাঁঠাল, বাতাবি লেবু, আতা—আরও কত কী! বউঠান কুল খেতে খুব পছন্দ করত। গাছের কাঁচা-পাকা কুল দেখিয়ে ওগুলো পেড়ে দেওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য দেবরের কাছে বায়না ধরত সে। রবিবাবু তরতর করে গাছে উঠে যেত।

এত আনন্দের মধ্যেও রবিবাবুর মনে একদিন শূন্যতা করতালি দিতে শুরু করল। চারদিকে সবকিছু আছে, তার পরও তার মনে হলো, কী যেন তার নেই! এই বোধটি তাকে তাড়িয়ে বেড়াল সারাটা দিন। বিকেলের দিকে নিজের ঘরে বসে গুনগুনিয়ে উঠল, 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।' ওই সময় কোনো বৃষ্টিপাত হচ্ছে না, মাসটাও ভাদ্র নয়। তার হৃদয়মন্দিরও শূন্য নয়। তাহলে এই হাহাকারের কবিতাটি কেন তার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল? সেই সন্ধ্যাতেই দাদা-বউদির সামনে কবিতাটি পড়ে শোনাল রবিবাবু। কবিতা পাঠ শেষ হলে রবিবাবু দেখল, বউঠানের মগ্ন বিষণ্ন দুই চোখ তাকে কী যেন বলতে চাইছে।

এক সকালে নতুন বউঠান জ্যোতিদাকে বলল, 'এখানে আর ভালো লাগছে না। এখানকার গঙ্গার ধার, বাগান, গাছ, ফুল—এসব এখন আর আমাকে টানছে না। চলো অন্য কোথাও যাই।'

বউঠানের মনে মাঝেমধ্যে একধরনের অস্থিরতা ফেনিয়ে ওঠে। কোনো একটা জায়গায় দীর্ঘদিন স্থির থাকতে পারে না। কোনো বস্তু বা স্থান বেশিদিন তাকে মুগ্ধ করে রাখতে পারে না। অন্য কোনোখানে অন্য কোথাও যাবার জন্য তার মন আইঢাই করে ওঠে। বাঁড়ুজ্যেদের বাগানবাড়িটিও তাকে দীর্ঘ সময় আকৃষ্ট করে রাখতে পারল না, বউঠান অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল।

জ্যোতিদা বললেন, 'ঠিক আছে। তাহলে কি আমরা কলকাতায় ফিরে যাব?'

বউঠান ত্বরিত বলে উঠল, 'না না, এখন না। এখন কলকাতায় যাব না।' তারপর স্বগত কণ্ঠে বলল, 'কলকাতার ঠাকুরবাড়িতে আমার জন্য শুধু ঘৃণা, শুধু অবহেলা, শুধু নিঃসঙ্গতা অপেক্ষা করে আছে।' এরপর কণ্ঠকে উঁচু করে বলল, 'তোমাদের পরিচিত এইদিকে কি আর কোনো বাগানবাড়ি নেই?'

জ্যোতিদা একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'অ্যাঁ হ্যাঁ, গঙ্গার বেশ কিছুটা উজানে নীল ব্যবসায়ী মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি আছে। ওখানে গেলে কেমন হয়? শুনেছি, বড় সুন্দর বাড়িটি। চলো ওখানে যাই।'

'তা-ই চলো।' উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল বউঠান।

মোরান সাহেবের বাগানবাড়িটি বেশ পছন্দ হয়ে গেল নতুন বউঠানের। তাঁরা বেশ ক'মাস থেকে গেলেন সেখানে। ওখানে সময় কাটল কর্মহীন আলস্যে, গভীর আবেগের গাঢ়তায়, রাতদিনের মুখরতায়। গঙ্গাতীরের সেই উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা আমার কাছে বলবার সময় রবিবাবু বেশ উদ্বেলিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঙ্গার ধারে বউঠানের পাশে শানবাঁধানো ঘাটে বসে প্রতিটি মুহূর্তকে আবিষ্কার করতে পেরে খুশিতে আত্মহারা সে। জ্যোতিদাও যে সঙ্গে থাকতেন না, এমন নয়। একেক দিন দাদা এসে মিশে যেতেন তাদের সঙ্গে। অপার আনন্দে মশগুল হয়ে যেতেন তখন সবাই। এক সূর্যাস্তে জ্যোতিদা অদ্ভুত এক প্রস্তাব দিয়ে বসলেন। বললেন, 'আজ পূর্ণিমা। আজ একটা কাজ করলে কেমন হয়?' কী কাজ—শ্রোতারা জানতে চাওয়ার আগেই জ্যোতিদা আবার বলে উঠলেন, 'চলো, আজ আমরা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মাঝগঙ্গা দিয়ে আমরা ভেসে বেড়াব উজান থেকে ভাটি আবার ভাটি থেকে উজানের দিকে।'

রবিবাবু হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, 'দাদা, কী অদ্ভুত আইডিয়া তোমার! নৌকার তলায় কলখল জল, চারপাশে জোছনার প্লাবন। নৌকার মাঝখানে আমরা তিনজন। কী যে আনন্দ হবে না!'

ওই সন্ধ্যাতেই রবিবাবুরা নৌকা ভাসিয়েছিলেন গঙ্গাজলে। মাঝিরা ধীরগতিতে নৌকা চালিয়ে যাচ্ছে মাঝগঙ্গায়। কাঠের পাটাতনে মুখোমুখি বসেছেন তিনজন—রবিবাবু, বউঠান আর জ্যোতিদা। জ্যোতিদা জোছনায় বিভোর, বউঠান জলে। আর রবিবাবু বউঠানে। হঠাৎ জ্যোতিদা বেহালাটা কাছে টেনে নিলেন। রবিবাবুকে বললেন, 'গান ধর, রবি।'

রবিবাবু চোখেমুখে কৃত্রিম উদ্বেগ ফুটিয়ে বলল, 'তুমি থাকতে আমি গান গাইব! না না সেজদা, আমি না, এই পাগলকরা জোছনায় তোমার মুখেই গান মানাবে ভালো। তুমিই গাও।'

এই সময় বউঠান বলে উঠল, 'রবি, দাদার অবাধ্য হচ্ছ বুঝি! দাদা তোমার কণ্ঠে গান শুনতে চাইছে, তুমিই গাও।' বলে বউঠান আলতো করে বাঁ হাতটা রবির উরুতে রাখল।

রবিবাবুর দেহমনে অদ্ভুত এক তরঙ্গ খেলে গেল। সে গান ধরল। গানের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিদা বেহালা বাজাতে লাগলেন।

আশপাশের গঙ্গাবক্ষ নৌকাশূন্য। জলে স্থলে শুভ্র শান্তি। তীরের বনরেখা আঁধারে ঢাকা। নদীতে তরঙ্গহীন প্রবাহ। সেই প্রবাহে অপার জোছনার স্পর্শ। নদীবক্ষে নৌকার পাটাতনে তিনটি প্রাণীকে ঘিরে তখন অফুরান উল্লাসের উদ্বাহু নৃত্য।

এইভাবে দিন গেছে। সূর্যাস্তের পর বিপুল জলস্থলকে অন্ধকার গ্রাস করেছে। আবার সকাল হয়েছে। সূর্যদেব সকাল থেকে সন্ধের দিকে তাঁর রথকে চালনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে নিয়ে গেছেন। অসংখ্য মানুষের মতো এই তিনজন মানুষের জীবনও আনন্দ-উল্লাসে, বিরহ-ক্লান্তিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে। একদিন মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি থেকে পাট গোটানোর সময় এল। নতুন বউঠান, জ্যোতিদা আর রবিবাবু ফিরে এলেন কলকাতায়।

রবিবাবু বলল, 'কলকাতায় ফিরে এলে কী হবে, জ্যোতিদা কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে উঠল না। উঠল ১০ নম্বর সদর স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে। আমি দাদার পরিবারের সঙ্গে আছি, বড় বোটের পেছনে বাঁধা ছোট পানসির মতো।' একটু থেমে রবিবাবু আবার বলেছিল, 'যাব কোথায় আমি? মা নেই, ঠাকুরবাড়িতে অপেক্ষা করে নেই মায়ের অপত্য স্নেহ। পিতা সংসার-সন্তান বিষয়ে অনেকটা উদাসীন। দাদারা যার যার কাজে মগ্ন, তাদের স্ত্রীরা ব্যস্ত নিজের নিজের সংসার নিয়ে। আমি এক অসহায় যুবক তখন। আমার তখন একটা মানসিক অবলম্বন চাই। আমি আঁকড়ে ধরলাম নতুন বউঠানকে। এতে তার প্রশ্রয় ছিল। সে যদি সেদিন অন্যান্য বউদির মতো আমার প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করত, তাহলে আমি কোথায় ভেসে যেতাম, কে জানে!' রবিবাবুর চেহারায় এই সময় এক গভীর সম্ভ্রম ফুটে উঠল।

সদর স্ট্রিটের বাড়িতে রবিবাবুর সামনে এক বিপুল জীবনের দরজা খুলে গেল। এক প্রত্যূষে ছাদে হাঁটাহাঁটি করছিল সে। সূর্য উঠি উঠি করছে। ওই সময় তার মনে হলো, এক অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন। নিচে নেমে সে লিখল, 'আজি এ প্রভাতে রবির কর,/ কেমনে পশিল প্রাণের পর।'

সেদিন রবিবাবু আরও বলেছিল, বউঠান আমার মানসসঙ্গী। সে সময় আমার খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, 'শুধুই মানসসঙ্গী, অন্য কিছু নয়?' কিন্তু ওই যে সহিষ্ণুতা! ওই সহ্যশক্তিই আমাকে অপ্রিয় কথা বলা থেকে বিরত করেছিল। সেদিন আমি রবিবাবুকে মনে মনে জিজ্ঞেস করেছিলাম, *বিবিধ প্রসঙ্গ* বইটির ভূমিকার কথাগুলো কী তাহলে মিথ্যে? আমি তো বুঝতে পারি, ওই কথাগুলোর সবটাই সত্যি। ওই লেখাতেই স্পষ্ট, রবিবাবু কী বিপুল নিবিড়তায় নতুন বউঠানে মগ্ন হয়ে পড়েছিল।

ভূমিকায় রবিবাবু লিখেছিল, 'আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। এ ভাবগুলির সঙ্গে তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে। সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুইজনে মিলিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই দুইজনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকা?'

বিবিধ প্রসঙ্গ তখন বেরিয়ে গেছে। ভূমিকাটা আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। রবিবাবু যখন বলেছে বউঠান তার শুধু মানসসঙ্গী, তখন আমি আঁধারে মুখ লুকিয়ে মুচকি হেসেছি। এই রকম পরিস্থিতিতে যেকোনো স্ত্রী তিরস্কারের হাসিটি হাসে। আমার এই মুচকি হাসির মধ্যে হয়তো তিরস্কারের ব্যাপারটি লুকিয়ে ছিল। ওই যে, 'এ ভাবগুলির সঙ্গে তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে'—এ বাক্যটির অর্থ কী? এই বাক্যটির মধ্যে শুধু মানস-বান্ধবতার কথাই ধ্বনিত হচ্ছে? অন্যকিছু নয়?

ওই সময় আমি যদি জিজ্ঞেস করতাম, তোমার সঙ্গে বউঠানের প্রকৃতই কী সম্পর্ক ছিল? আমি জানি, রবিবাবু আকাশ থেকে পড়ে বড় বড় চোখ করে উল্টো আমাকে জিজ্ঞেস করত, 'মানে? কী বলতে চাইছ ছোট বউ তুমি?'

আমার মন তখন বলত, চুপ চুপ ভবতারিণী। এসব কী বলছ তুমি? এসব কথা প্রকাশ করতে নেই। প্রকাশ করলে পাপ হয়, ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ করার পাপ। তুমি জানো না মানুষের মনের মধ্যে এমন কিছু কষ্ট লুকিয়ে থাকে, যা বাইরে প্রকাশ করা উচিত নয়! তুমি তোমার মধ্যকার বেদনাকে বেআব্রু কোরো না। নিজের হৃদয়ের অন্তস্তলে বউঠান-রবির অন্য রকম সম্পর্কের কথাটি দাবিয়ে রাখো। তাতে তোমার সুখ, রবির স্বস্তি। ঠাকুরবাড়ির কলঙ্ক ঢাকা থাকে তাতে।

AMARBOI.COM

রবিবাবু বিচক্ষণ। নতুন বউঠানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাগুলো সে অবাধকণ্ঠে বলে বেড়াত। ওই সময় অপরাধবোধের ব্যাপারটি খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে নিজের মধ্যে চেপে রাখত সে। হয়তো দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় এই ব্যাপারটিতে সে দক্ষতা অর্জন করেছিল। এতে মানুষজন নতুন বউঠান-রবিবাবুর সম্পর্কের বিষয়টিকে সহজভাবে মেনে নিয়েছিল। সে তার নানা লেখায়, গদ্যে বা পদ্যে, পত্রে বা স্মৃতিচারণায় বউঠানের কথা এমন নিঃসংকোচে উল্লেখ করেছে যে, মানুষজন মনে করেছে, দুজনের সম্পর্কের মধ্যে কোনো রকম মলিনতা নেই।

কিন্তু আমি তো জানি, আসল ব্যাপারটা কী? আমি তো তার স্ত্রী। দিনরাত, দুপুর-সন্ধে, সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-উল্লাসের প্রতিটি ক্ষণের সঙ্গী আমি। নিভৃত শয্যায় ঘুমে বা নির্ঘুমে রবিবাবুর সঙ্গে বছর-মাস-সপ্তাহ-দিন-ঘণ্টা-মিনিট কেটেছে আমার। অন্য সবার সামনে তার ভেতরের চেহারাকে লুকিয়ে রাখতে পারলেও আমার সামনে লুকানো সম্ভব হয়নি। আমিই তো জানি, নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বউঠানের মৃত্যুর পর বহু বছর ধরে ঘুমন্ত অবস্থায় রবিবাবু 'বউঠান' 'বউঠান' বলে ডেকে উঠত। ঘুমের ঘোরে আবৃত্তি করত—

ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহি পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে—
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।

যে যা-ই বলুক, আমি তো জানি রবিবাবুর মনের কথা। তার যেসব কথা আমাকে খুলে বলেছে, এমন নয়। কিন্তু ওই যে বললাম, স্ত্রী হবার বদৌলতে রবিবাবুর হৃদয়-কন্দরের প্রকৃত স্পন্দন আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। আজকে জীবনের এত দূর হেঁটে এসে এই কথাটি লিখতে আমি দ্বিধা করছি না যে, রবিবাবু আর নতুন বউঠানের মধ্যে সম্পর্ক ছিল গভীর, ব্যাপক এবং সংস্কারমুক্ত।

তার পরও মুখ ফুটে কোনো দিন আমি রবিবাবুর ওপর দোষারোপ করতাম না।

AMARBOI.COM

সাত

শ্বশুরঠাকুরের বয়স তখন বাষট্টি ছুঁই ছুঁই। বছর তিনেক আগে শাশুড়িঠাকরুনের মৃত্যু হয়েছে। মানসিকভাবে অনেকটা ভেঙে পড়েছেন শ্বশুরঠাকুর। জ্ঞানদা বউদির আচরণে তখন তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ। তাঁর বিশ্বাস, সত্যেনের স্পষ্ট ইন্ধন আছে মেজো বউদির বেপর্দা চলাফেরায়। শ্বশুরঠাকুরের কিছু করার নেই তখন। পুত্ররা বড় হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নিজস্ব বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। তাঁরা পিতার সব কথা শুনতে যাবেন কেন? তাই শ্বশুরঠাকুর ঠিক করলেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আর নয়। তিনি পার্ক স্ট্রিটে বাড়ি ভাড়া করলেন। কলকাতায় অবস্থাকালীন অধিকাংশ সময় তিনি ওই ভাড়া বাড়িতে কাটান। মাঝে মাঝে পারিবারিক বিশেষ প্রয়োজনে তিনি ঠাকুরবাড়িতে আসেন, কিন্তু তা স্বল্প সময়ের জন্য। প্রয়োজন সেরে ফিরে যান পার্ক স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে।

রবি আর নতুন বউঠানের কাহিনি নানাভাবে পল্লবিত হয়ে বড়কর্তার কানে পৌঁছায়। তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। ভাবেন, তাঁর অন্য ছেলেরা মানুষ হলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট ছেলেটি গোল্লায় গেল। স্কুলে গেল না, লেখাপড়া করল না। জীবনে করবেটা কী সে? এখন গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো জ্যোতির বউয়ের ঘটনা। রবি-কাদম্বরী বউঠানের ব্যাপারটি শ্বশুরঠাকুরকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। বিষয়টি নিয়ে খুব হইচই করা যাবে না। তাতে পারিবারিক মানমর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। কৌশলে কাজ করতে হবে। তিনি সত্যেনদার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সিদ্ধান্ত হলো, রবিবাবুকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে পড়াশোনা করবে রবি। তখন রবিবাবুর বয়স সতেরো।

বিলেতে পড়াশোনা করতে যাওয়ার আগে বিলেতি কেতা শেখা দরকার। কেতা শেখার জন্য বোম্বাই পাঠানো হলো তাকে। রাখা হলো ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙের পরিবারের সঙ্গে। পাণ্ডুরঙের তিন মেয়ে—আনা, দুর্গা আর মানিক। ডাক্তারবাবু তিন মেয়েকেই ইংল্যান্ড থেকে বিদ্যাশিক্ষা করিয়ে এনেছেন। তিনটি কন্যাই চৌকস। তবে সবার সেরা আনা। আনা ষোড়শী মারাঠি তরুণী। যেমন শিক্ষিত, যেমনি বুদ্ধিমতী, তেমনি মিশুক। সতেরো বছরের রবিবাবু ষোলো বছরের আনাকেই গুরু হিসেবে বেছে নিল। তার কাছ থেকেই ইংরেজি কেতা আর ইংরেজি উচ্চারণের তালিম নিতে লাগল রবিবাবু। ধীরে ধীরে গুরু-শিষ্যের ব্যবধান কমতে লাগল। পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে উষ্ণ হতে শুরু করল। আনা রবিবাবুর কাছে প্রেম যাচে, ঘনিষ্ঠতা বাঞ্ছা করে। চুমু খাওয়ার বাসনাও আনা প্রকাশ করে একদিন রবিবাবুর কাছে। হাত ধরে বলে, 'তুমি অসাধারণ সুন্দর।' তখন বউঠান কাদম্বরীর কথা মনে পড়ে তার। নতুন বউঠান বলেছিল, তোমার মতন কদাকার কেউ এই পৃথিবীতে নেই। আর আনা ঠিক উল্টো কথা বলছে। বলছে, তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না। দাড়ি দিয়ে তোমার সুন্দর মুখের সীমানা ঢেকো না। রবিবাবু আনার প্রগলভ যাচ্ঞাকে অস্বীকার করতে পারে না। আনার কথা রবিবাবুর ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে। তার মনে হয়, আনা যেন তার হৃদয়চাদরের ওপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দিয়েছে। রবিবাবু আনার আহ্বানে সাড়া দেয়। নলিনী নাম দেয় তার। তাকে নিয়ে গান লেখে সে—

সখি এসেছে তোমারি রবি
আমি যে তোমার কবি।

পাণ্ডুরঙের বাড়িতে বেশ আনন্দেই দিন কাটতে লাগল রবিবাবুর। মাঝে মাঝে দুর্গা বা মানিক এসে আনার সঙ্গে জোটে। তিন তরুণী আর এক তরুণের জীবন ভেসে চলে আনন্দের ভেলায়। ইংল্যান্ড যাওয়ার দিনক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ধারিত হয়। আনার পেছন থেকে চোখ টিপে ধরার স্মৃতি আর চাঁদনি রাতের নিবিড় সান্নিধ্যের পুলক-রোমাঞ্চের স্মৃতিকে পেছনে ফেলে রবিবাবু একদিন ইংল্যান্ডগামী জাহাজে উঠে বসে। সঙ্গে সত্যেনদা। সত্যেনদাও বিলেত গেলেন, কারণ, জ্ঞানদা বউদি সন্তান তখন বিলেতের ব্রাইটনে।

ব্রাইটনের একটা পাবলিক স্কুলে ভর্তি হলো রবিবাবু। কিন্তু স্কুলে মন বসে না তার। কেবল গঙ্গাঘাটের কথা মনে পড়ে, কেবল মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির কথা মনে পড়ে। আর বেশি করে মনে পড়ে কাদম্বরী বউঠানের কথা। ব্রাইটনের স্কুলে দুমাসের বেশি পড়ল না সে। তাকে নিয়ে আসা হলো লন্ডনে। বিলিতি সংগীত শোনা ও শেখার প্রতি তার আগ্রহের শেষ নেই। দিন কাটে সংগীতচর্চায় আর বিদেশি ভাষা শিক্ষায়, রাত আর কাটে না তার। কলকাতার সকল স্মৃতি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। স্মৃতি রোমন্থনে রাতের প্রহরগুলো একে একে পার করে দেয় সে। এই সময় বাড়ির নানাজনকে চিঠি লেখে সে। *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে সেসব চিঠিপত্র। এই পত্রাবলি আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে, এগুলোর অধিকাংশই তার নতুন বউঠানকে লেখা। প্রতিটি চিঠির ছত্রে ছত্রে তরুণ রবির প্রবল আকুতি ঝরে পড়েছে বউঠানের জন্য।

AMARBOI.COM

দুবছর পর রবিবাবু ফিরে এল কলকাতায়, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, নতুন বউঠানের কাছে। ফিরলেও সে তার আগের বউঠানকে পেল না। বউঠান তখন বিমর্ষ, বেদনাহত।

রবিবাবুর অন্যান্য ভাইবোনের ঘরে সন্তানদের কলকাকলি। দ্বিজেনদা, সত্যেনদা, হেমনদা, বীরেনদাদের কারও একটি, কারও বা দুটি, কারও বা চার-পাঁচটি করে সন্তান। বোনদের মধ্যে অনেকেই সন্তানবতী। ঠাকুরবাড়ির রীতি অনুসারে প্রায় সব ভাইবোনের ঠাঁই হয়েছে এই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। সকাল-সন্ধে প্রত্যেকের ঘর-আঙিনা বাচ্চাদের কলরবে মুখর। কেবল ছোট বাচ্চার কণ্ঠের মধুর আধো কথা শোনা যায় না নতুন বউঠানের ঘরে। কারণ সে নিঃসন্তান। বিয়ের দশ বছর পরও তার গর্ভে কোনো সন্তান এল না।

এই সন্তানহীনতার বেদনা তাকে চেপে ধরল একদিন যখন রবিবাবু বিলাতে চলে গেল। আগে তার নিঃসঙ্গতা শব্দময় হয়ে উঠত ছোট দেবরের সান্নিধ্যে। তার নিবিড় নৈকট্য তাকে উষ্ণতা দিত। কিন্তু রবিবাবু বোম্বাই হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলাত চলে গেলে নতুন বউঠান অবলম্বনহীন হয়ে পড়ল। জ্যোতিদার হাতে তখন বউকে দেওয়ার সময় নেই। নাটক, মঞ্চ, নায়িকা—এসব নিয়েই তাঁর দিন কাটে, কখনো কখনো রাতও কাটে। একসময় নতুন বউঠানের মাতৃহৃদয় হাহাকার করে ওঠে। ঠাকুরবাড়ির তেতলায় পাশাপাশি মহলে থাকতেন স্বর্ণকুমারী দিদি আর নতুন বউঠান। শ্বশুরঠাকুর তাঁর চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকে বিয়ে দিয়েছিলেন জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে। তিনি কৃষ্ণনগরের সুদর্শন উৎসাহী সমাজসংস্কারক যুবক জানকীনাথকে দেখে মুগ্ধ হন। মনে মনে ঠিক করেন—এঁকেই জামাই করবেন তিনি। জানকীনাথও পিরালি বংশে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ বন্ধু তিনি। তিনিই তো ভাঙবেন প্রচলিত রীতি। আমার বড় ননদিনীকে বিয়ে করার অপরাধে পিতা জয়চন্দ্র ঘোষাল ত্যাজ্য করলেন পুত্র জানকীনাথকে। এতে বিচলিত হননি তিনি। এগারো বছরের স্ত্রী স্বর্ণকুমারীকে নিয়ে ঠাকুরবাড়ির তেতলার মহলেই দাম্পত্য জীবন শুরু করেন তিনি। কেন জানি স্বর্ণদি জ্যোতিদার বউ কাদম্বরীকে একটু বেশি ভালোবাসেন। জ্ঞানদা বউদির প্রভাবে পড়ে কোনো কোনো নারী কাদম্বরী বউঠানের ধারেকাছে আসতেন না, আবার কেউ কেউ জ্ঞানদা বউদির খবরদারিকে তোয়াক্কা না করে নতুন বউঠানকে প্রাণ থেকে ভালোবাসতেন। স্বর্ণদি শেষের দলের। ঠাকুরবাড়ির কূটচালের মধ্যে তিনি নেই। স্বামীর আলোয় নিজেকে সজ্জিত করে নিয়েছেন। স্বামী জানকীনাথ ঠাকুরবাড়ির প্রথা বা নিয়ম মানেননি। ওই যে বিয়ের আগে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করা বা ঠাকুরবাড়িতে ঘরজামাই থাকা—এসব নিয়মকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। স্বর্ণদিরা ঠাকুরবাড়িতে একাদিক্রমে থাকেননি। পিতার বিরাগভাজন হয়ে কিছুকালের জন্য জানকীনাথ গৃহজামাতার জীবন মেনে নিয়েছিলেন। পরে ঠাকুরবাড়ি থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন সপরিবারে। তবে অন্য বাড়িতে থাকলেও প্রায়ই আসতেন ঠাকুরবাড়িতে; উঠতেন ওই নতুন বউঠানের পাশের ঘরে। ভালোবাসার টানে নতুনের ঘরে আসতেন। দরদি চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকতেন নতুনের দিকে। কোনো কোনো দিন রবিবাবুকে পেতেন এ ঘরে। কাছাকাছি বসে দুজন চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে তখন। স্বর্ণদিকে দেখে পালাতে চাইত রবিবাবু। বলত, 'আমার কাজ আছে। যাই দিদি। তোমরা দুজনে কথা বলো।'

স্বর্ণদি মুচকি হেসে ছোট ভাই রবির দিকে তাকাতেন। মনে মনে বলতেন, তোর কী কাজ রে ছোট! লেখাপড়া করলি না! দিনমান শুধু আড্ডা দিয়ে বেড়ালি! মুখে বলতেন, 'তোর তো কাজ ওই একটাই, কবিতা লেখা! আচ্ছা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বল, তোর এই কবিতা মানুষ শেষ পর্যন্ত পড়ে যাবে তো!'

রবিবাবুর চেহারা ধপ করে জ্বলে ওঠে। সেখানে অহংকার আর অসহায়তার মাখামাখি। দিদির কথা শুনে সে বলে ওঠে, 'তুমি দেখে নিয়ো, দিদি, আমার কবিতা মানুষ পড়বে। পড়ে সুখ পাবে, দুঃখও পাবে।'

'তাই নাকি! ভালো ভালো। সুখ পাবে বুঝলাম, দুঃখ পাবে কেন?' দিদি হালকা চালে জিজ্ঞেস করলেন।

রবিবাবু যেতে যেতে উচ্চ স্বরে বলে, 'জানি না।'

এবার দিদি নতুনের দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, নতুন। মাঝে মাঝে তোমার চেহারা এত বিষণ্ন হয়ে যায় কেন? তোমার চারপাশে সুখ আছে, ঐশ্বর্য আছে!'

কাদম্বরী বউঠান স্বর্ণদির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'ঐশ্বর্য আছে মানলাম। কিন্তু সুখ দেখলে কোথায় তুমি?' তারপর একটু থেমে নিচু গলায় বলল, 'যাকে তুমি সুখ বলে ভাবছ, সে সুখ নয়, সে মেকি। স্বর্ণ-মোড়ানো পেতল যেমন।'

'মানে! কী বলতে চাইছ তুমি? এই যে জ্যোতিদার সান্নিধ্য, ভালোবাসা! রবির খুনসুটি। এসব কি তাহলে মেকি?' স্বর্ণদি অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

নতুন বউঠান এবার ধীরে ধীরে বলে যায়, 'রবির কথা আমি অস্বীকার করব না। ও আছে বলেই হয়তো আমি বেঁচে আছি। তোমার জ্যোতিদাকে ভালো করে লক্ষ করেছ তুমি? তার সময় কাটে জ্ঞানদা বউদির সান্নিধ্যে। সময় কাটে নাটক, অভিনয় আর অভিনেত্রীদের সঙ্গে। আমাকে সময় দেওয়ার ফুরসত তার হাতে নেই। হ্যাঁ, যতক্ষণ ঘরে থাকে, ভালোবাসা জানায় আমাকে। কিন্তু তখন আমার মনে হয়, তার এই ভালোবাসা জ্ঞাপনের কোনো মানে নেই। এ শুধু শরীরী ভালোবাসা, মানসিক নয়। আমার মস্তিষ্কে তখন তীব্র ঘৃণা চাগিয়ে ওঠে। কঠোর হাতে নিজেকে দমন করি। প্রয়োজন ফুরালে ভালোবাসাসমেত তোমার দাদা সরে পড়ে দূরে, বহু দূরে।'

বিস্ফারিত চোখে স্বর্ণদি জিজ্ঞেস করেন, 'কী বলছ তুমি এসব?'

নতুন বউঠান স্বর্ণদির কথার সরাসরি কোনো উত্তর দেয় না। অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বলে, 'আমার কষ্ট ওখানে নয়, দিদি, কষ্ট অন্য জায়গায়!' বলে চুপচাপ হয়ে যায় নতুন বউঠান। গবাক্ষ দিয়ে আকাশের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে।

স্বর্ণদি ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার কষ্ট তাহলে কিসে? কোথায়?'

'দেখো দিদি, তোমাদের সকল ভাইবোনের ঘরে সন্তান আছে। তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলরবে তোমাদের ঘরদোর মুখর থাকে। মাঝে মাঝে শুনি, তোমরা সন্তানদের অবাধ্যতার জন্য চিৎকার করে ধমক দিচ্ছ। কিন্তু আমার ঘরের দিকে তাকাও তুমি। কোনো আওয়াজ নেই। ঘরের যেখানে যা সেখানেই তো পড়ে থাকে। আমার ঘরে ওগুলো এলোমেলো করার কেউ নেই। ধমক দেওয়ারও নেই কেউ।' বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে কাদম্বরী বউঠান।

স্বর্ণদি নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন অনেকক্ষণ। তিনি নতুনকে কাঁদতে বারণ করেন না বা উঠে চোখও মুছিয়ে দেন না তার। কাঁদুক বেচারা! অঝোর ধারায় কেঁদে বুক ভাসাক। কাঁদলে বুক থেকে বেদনা নেমে যাবে। সত্যিই তো, নতুনের এই কষ্টের খোঁজখবর তো তিনি কখনো নেননি! তিনি কেন, এ বাড়ির কোনো নারীই তো নতুনের সমব্যথী হয়নি! কোনো দিন জানতে চায়নি, নতুনের কষ্টটা কোন জায়গায়! সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। স্বামীর সন্তুষ্টি বিধানে আর সন্তানদের লালন-পালনে ব্যস্ত রেখেছে নিজেদের। এ অন্যায়, এ ঘোর অন্যায়!

এই সময় স্বর্ণদির আড়াই বছরের কন্যা ঊর্মিলা লাফাতে লাফাতে মায়ের কাছে আসে। তার আঁচল ধরে কাদম্বরী বউঠানের কান্নারত মুখের দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে থাকে। স্বর্ণদি হঠাৎ খপ করে ঊর্মিলার হাত চেপে ধরেন। টানতে টানতে নতুনের কাছে নিয়ে যান। গাঢ় কণ্ঠে বলেন, 'আজ থেকে এ তোমার। সম্পর্ক যা-ই হোক, তুমি ধরে নাও ঊর্মিলা তোমার মেয়ে। আজ থেকে তুমি ওর মা। ঊর্মিলাকে দেখাশোনা আর লালন-পালনের ভার আজ থেকে তোমাকে দিলাম।'

বউঠানের বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় উথালপাতাল করে উঠল। দুবাহু বাড়িয়ে ঊর্মিলাকে কাছে টেনে নিল। তাকে চেপে ধরল নিজের বুকে। বউঠানের দুই চোখে তখন অশ্রুর প্রবল ধারা। ঊর্মিলা এসবের কিছুই বুঝল না। তার অস্বস্তি হতে লাগল। একসময় ঊর্মিলা ডেকে উঠল, 'মা।'

স্বর্ণদি বুঝলেন, ঊর্মিলাকে নতুন বুকে চেপে ধরায় সে অস্বস্তিতে তাঁকে মা বলে ডেকে উঠেছে। নতুন বউঠান বুঝল, ঊর্মিলা বুঝি তাকেই মা বলেছে। নতুন আরও নিবিড়ভাবে ঊর্মিলাকে বুকে টেনে নিল।

এর পর থেকে ঊর্মিলা কাদম্বরী বউঠানের হয়ে গেল। নিঃসন্তান বউঠান এই ক্ষুদ্র বালিকাকে মাতৃস্নেহে ভালোবাসতে লাগল। সত্যিই যেন সে তার আপন মেয়ে। ঊর্মিলা নতুন বউঠানের আদুরে কন্যাতে রূপান্তরিত হলো। সে তাকে স্নান করায়, খাওয়ায়, পরায়। ঊর্মিলাকে ঘিরে নতুন বউঠানের নতুন জীবন শুরু হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক এই সময় রবিবাবু বিলেত গেল। ঊর্মিলা নতুন বউঠানকে দেবরের অনুপস্থিতি টের পেতে দিল না। স্কুলে থাকার সময়টুকু ছাড়া সর্বদা নতুন বউঠানের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে ঊর্মিলা। রবিবাবুর কাছে সংবাদ পৌঁছে গেল—তার নতুন বউঠানের সকল কিছু এখন জুড়ে বসেছে ঊর্মিলা। তার ছোট ছোট পদধ্বনি এখন বউঠানের ঘরদোর-আঙিনায়। গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি এলোমেলো করার ব্যাপারে ভীষণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে সে। তার পিছু ধাওয়া করতে করতে এখন নতুন বউঠানের দিন ফুরায়। ঊর্মিলা এখন তার ভাগনি নয়, কন্যা। রবিবাবুর খবর নেওয়ার ফুরসতটুকুও এখন বউঠানের হাতে নেই। অভিমান রবিবাবুকে ঘিরে ধরে। আগে কলকাতায় আমি আসি বউঠান! কী করে তুমি আমাকে ভুলে থাকতে পারলে, জেনে নেব তোমার কাছ থেকে!

বয়স চার বছর পেরিয়ে গেলে বেথুন স্কুলে ভর্তি করানো হয় ঊর্মিলাকে। স্বর্ণদির চেয়ে নতুন বউঠানের আগ্রহ বেশি ঊর্মিলাকে স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যাপারে। 'ঊর্মিলার বয়স এখনো পাঁচ বছর হয়নি, আর একটু পরে ভর্তি করালে হয় না?—স্বর্ণদির এই কথার জবাবে নতুন বউঠান বলে উঠেছে, 'তুমি রাখো তো, দিদি। বয়স হয়ে যাচ্ছে মেয়ের, দেখো না, এ বাড়ির সব ছোটরা স্কুলে যাচ্ছে! ও না গেলে পিছিয়ে পড়বে যে!'

স্বর্ণদি আমতা আমতা করে বলতে চেয়েছেন, 'যারা যাচ্ছে তাদের বয়স পাঁচের কম না। সরলাকে দিয়েই বিচার করো না!'

'আমি তোমার কথা শুনতে চাই না, দিদি। ঊর্মিলা স্কুলে যাবে, ব্যস! এই-ই আমার শেষ কথা।'

স্বর্ণদি হার মানেন। ঊর্মিলা স্কুলে যায়। ঊর্মিলার আসার সময় হলে ঠাকুরবাড়ির মূল ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকে বউঠান কখন ওদের পালকি ফটক দিয়ে ঢুকবে, সেই আশায়! স্কুলের সময়টুকু বাদ দিয়ে অন্য সময় মামিমার পেছন পেছন ঘুরঘুর করে ঊর্মিলা। বউঠান ছাদে উঠলে ঊর্মিলাও ছাদে, বউঠান রান্নাঘরে গেলে ঊর্মিলাও রান্নাঘরে। ঊর্মিলা তার মায়ের কথা ভুলে যায়। বাবা তো তখন ইংল্যান্ডে।

ঊর্মিলাকে স্কুলে ভর্তি করানোর মাস দুই পর এক ছুটির দিনের বিকেলে ভয়ংকর দুর্ঘটনাটি ঘটে যায় ঠাকুরবাড়িতে। এই দুর্ঘটনায় সবচাইতে বেশি ক্ষতি হয়ে যায় কাদম্বরী বউঠানের।

সেদিন বিকেলে মেঘ জমেছিল আকাশে। বৃষ্টি নামবে নামবে করছে। হঠাৎ বহুদিন পর ছোট দেবরের কথা মনে পড়ে যায় নতুন বউঠানের। মনে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিকে নিয়ে খোলা ছাদে বৃষ্টিতে ভেজার কথা। মনে পড়ে রবির আকুলিবিকুলি হয়ে বৃষ্টিস্নাত তাকে ধরবার চেষ্টার স্মৃতি। এই সময় হঠাৎ ছাদে যেতে খুব ইচ্ছে করল নতুন বউঠানের। শিথিলভাবে শাড়ি জড়ানো তখন তার শরীরে। ওই অবস্থাতেই ছাদের দিকে রওনা দিল সে। পেছন থেকে ঊর্মিলা ডাক দিল, 'মা, কোথায় যাও?'

বউঠান আস্তে করে বলল, 'ছাদে।'

'আমিও যাব, আমিও যাব মা ছাদে, তোমার সঙ্গে।' বলেই কাদম্বরী বউঠানের পিছু নেয় ঊর্মিলা। ছাদে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল ঊর্মিলা নতুন বউঠানের সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ করেই দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। নতুন বউঠান তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'ঊর্মি, যাও যাও, শিগগির নেমে যাও। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়লে জ্বর হবে তোমার। গোলাপগাছটাকে সোজা করে দিয়ে আমিও নামছি।'

ঊর্মিলা বউঠানের খুব বাধ্য। মামির কথা শুনে সে সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করল। ছাদে ওঠা-নামার দুটো সিঁড়ি। একটা পাথুরে, প্রশস্ত। অন্যটা লোহার তৈরি; ঘোরানো, সংকীর্ণ। ঊর্মিলা নামবার সময় ওই লোহার সিঁড়িটাই বেছে নিল। সিঁড়ি দিয়ে আপনা-আপনি নামতে গিয়ে পা ফসকে গেল ঊর্মিলার। গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল। মাথায় ভীষণ চোট পেল। ডাক্তার ডাকা হলো শিগগির। কিন্তু ডাক্তার কিছুই করতে পারলেন না। মারা গেল ঊর্মিলা। সেই সঙ্গে মরে গেল নতুন বউঠানের মনটাও। স্তব্ধ, বিষণ্ন হয়ে গেল কাদম্বরী বউঠান। তার হৃদয় থেকে সকল স্নেহ-ভালোবাসা, উদ্বেগ-উদ্বিগ্নতা, মমতা-আনন্দ নিংড়ে বের করে নিয়ে গেল ঊর্মিলা।

এই সময় বিলেত থেকে ফিরল রবিবাবু। বউঠানকে দেখে তার ভেতরের সকল অভিমান জল হয়ে গেল। এ কী চেহারা নতুন বউঠানের! তার মুখরতা কোথায় গেল! তার খুনসুটি! তার প্রগলভতা! সব কোথায় হারিয়ে গেল? রবিবাবু তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল বউঠান। কিছুই বলল না।

বউঠানকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার সাধনায় লেগে গেল রবিবাবু। মিষ্টি কথায় বউঠান যখন কোনো সাড়া দিল না, তখন রবিবাবু বাঁকা পথ বেছে নিল। বউঠানকে রাগাবার জন্য একদিন বলল, 'বউঠান, তুমি তো সারা জীবন আমাকে কদাকার বলে গেলে। বোম্বের যে বাড়িতে আমি উঠেছিলাম, সে বাড়ির ষোলো বছরের তরুণী আনা। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি বিচক্ষণ। তো, ও-ই আমাকে এক সন্ধেয় বলল—আমি নাকি দেখতে দারুণ সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজারটা তরুণের মধ্য থেকে আমাকে নাকি বেছে নেওয়া যায়।'

রবিবাবুর এ কথা শুনেও বউঠান নাকি নিরাবেগ চোখে দেবরের দিকে তাকিয়ে ছিল। কোনো রকম উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা, ঈর্ষা বা অন্য কোনো বিচলিত ভাব তার চোখে ফুটে ওঠেনি সেদিন। এসব কথা আমার রবিবাবুর মুখ থেকেই শোনা।

বউঠানের কোনো ভাবান্তর না দেখে রবিবাবু আবার বলেছিল, 'ব্রাইটনে আমি যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, সে স্কুলের অধ্যক্ষও বলেছিলেন আমার মতো সুন্দর মুখের ছাত্র তার স্কুলে দ্বিতীয় কেউ নেই।' তারপর একটু থেমে কৌতুক মেশানো কণ্ঠে রবিবাবু আবার বলে উঠেছিল, 'তুমি কী বলো, বউঠান? সত্যিই কি আমি সুন্দর? যদি তা-ই হয়, তাহলে তোমার আগের কথাগুলো ফিরিয়ে নিতে হবে কিন্তু!' বলতে বলতে বউঠানের হাত ধরেছিল রবিবাবু। এই সময় বউঠান বিষণ্ন চোখ তুলে সামান্য একটু হেসেছিল শুধু। রবিবাবুর তখন মনে হয়েছিল, এরকম হাসতে জানে যে নারী, তার বেদনাকে সকলের গোচরে নিয়ে আসার দরকার নেই।

জ্যোতিদা তাঁর *মানময়ী* নাটকটি মঞ্চস্থ করার তোড়জোড় শুরু করেছেন। স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকাবার জো নেই তাঁর। কুশীলবদের নিয়ে মহড়া ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটে জ্যোতিদার। এই সময় একদিন তার সামনে এসে দাঁড়াল রবিবাবু। বলল, 'দাদা, নতুন বউঠানকে দিয়ে অভিনয় করাতে হবে।'

'অভিনয়! নতুনকে দিয়ে অভিনয়!' আকাশ থেকে পড়লেন জ্যোতিদা।

অবিচলিত কণ্ঠে রবিবাবু বলল, 'হ্যাঁ, অভিনয়। তোমার নাটক *মানময়ী*তেই অভিনয় করবে বউঠান। তুমি ব্যবস্থা নাও।'

'এসব কী বলছ তুমি, রবি? অভিনয় করা কি চাট্টিখানি কথা! ও পারবে না। তা ছাড়া নতুন এখন খুবই বিমর্ষ। একটা চপল মেয়ের ভূমিকায় সে অভিনয় করতে পারবে না।'

রবিবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'পারবে। বউঠান অভিনয় করতে পারবে। আমি শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব।' তারপর চাপা স্বরে বিষণ্ন গলায় রবিবাবু আরও বলল, 'দাদা, বউঠানের মন ভালো নেই এখন। একটা ঘোরের মধ্যে আছে। সেই চক্রব্যূহ থেকে তাকে বের করে আনতে হবে। না হলে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের।'

জ্যোতিদা আমতা আমতা করে বললেন, 'দেখো, নতুনকে রাজি করাতে পারো কি না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেই দায় আমার, দাদা।' উচ্ছ্বসিত গলায় রবিবাবু বলে উঠল।

মানময়ী নাটক মঞ্চস্থ হলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। প্রধান তিনটি ভূমিকায় অভিনয় করল রবিবাবু, জ্যোতিদা আর কাদম্বরী বউঠান। রবিবাবু মদনের, জ্যোতিদা ইন্দ্রের আর উর্বশীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল নতুন বউঠান। এই নাটকে বউঠান শুধু অভিনয়ই করল না, মিষ্টি কণ্ঠে 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি' গানটিও গাইল।

তার পরও এই গান-অভিনয় বউঠানের ভেতরের বেদনাকে সরাতে পারল না। একধরনের মানসিক যাতনা তাকে ঘিরে রাখল সর্বদা।

আমি একদিন রবিবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তাহলে তোমার সমস্ত চেষ্টা বিফলে গেল? বউঠানকে স্বাভাবিক জীবনে আর ফিরিয়ে আনতে পারলে না তুমি?'

এই সময় রবিবাবু কঠোর কণ্ঠে বলে উঠল, 'ফিরিয়ে আনব কী করে? দাদার বেয়াড়া জীবনযাপনের জন্য বউঠানকে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারিনি আমি।'

'কী রকম? তোমার কথার আগাপাছতলা তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।' জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ওই দিন আর কোনো কথা বলেনি রবিবাবু। মাথা নিচু করে বসে ছিল। রবিবাবু সেদিন আমার প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট কিছু না বললেও শেষ পর্যন্ত আমার কাছে তা অস্পষ্ট থাকেনি। আমি ধীরে ধীরে সবকিছু জানতে পেরেছি।

AMARBOI.COM

আট

প্রথমবার বিলেত অবস্থানকালে ব্রাইটন থেকে লন্ডনে এসে রবিবাবু সুরে আর সুরায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল। কিছু স্তাবকও যে সে সময় জোটেনি, এমন নয়। সেই স্তাবকদের মধ্যে নারীও ছিল। লন্ডনে রবিবাবুর মধ্যে দ্বারকানাথের রক্ত টগবগিয়ে উঠতে চেয়েছিল। শ্বশুরঠাকুরের কাছে সংবাদ পৌঁছে যায় রবিবাবুর বেপথী জীবনযাপনের কথা। বড়কর্তা টেলিগ্রাম পাঠান সত্যেনদাকে—'যত শিগগির সম্ভব রবিকে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা নাও।' সে কারণে রবিবাবুর কলকাতায় ফিরে আসা। তার সম্পর্কে আমি যে এতগুলো কথা লিখছি তার অনুকূলে কিন্তু প্রমাণ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতায় ফিরে আসার পর আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে বিরূপ গুঞ্জন ওঠে। সবাই বলতে শুরু করে, সিভিল সার্ভিস বা ব্যারিস্টারি পাস না করেই রবি ফিরে এসেছে! যাকে-তাকে দিয়ে তো আর সব কাজ হয় না! সত্যেন বলে পেরেছে। রবির পক্ষে তা কখনো সম্ভব নয়। রবিবাবু অতিষ্ঠ হয়ে ঠিক করল, সে আবার বিলেত যাবে, ব্যারিস্টারি পাস করে আসবে।

দ্বিতীয়বার বিলেত যাবার অনুমতি চেয়ে পিতার কাছে চিঠি লিখল রবি। পিতা কিন্তু আগেই পুত্রের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে বসে আছেন। বিলেতে তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের কথা পিতা এখনো ভুলতে পারেননি। তার পরও ঐহিক দিক দিয়ে অকৃতী সন্তানটির মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে ভেবে তার প্রস্তাবে তিনি রাজি হলেন। সে সময় পুত্রকে একটি পত্র লিখেছিলেন শ্বশুরঠাকুর। সেই চিঠি মাত্র সেদিন পড়ার সুযোগ হলো আমার। রবিবাবু যখন আমার সঙ্গে তার বাল্য-কৈশোর আর তারুণ্যের গল্প করত, আমি মাঝেসাঝে তখন তার লন্ডন-জীবনের কথা জিজ্ঞেস করতাম। তখন সে শুধু আমাকে বিলেতি ঐশ্বর্যের গল্প শোনাত আর শোনাত তার গান ও ভাষাশিক্ষার গল্প। সেখানে যে সে বেপথী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, সেখানে তার যে অশুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছিল, সে কথা সে কখনো আমাকে বলেনি। সেদিন শ্বশুরঠাকুরের রবিবাবুকে লেখা চিঠিটি পড়ে আমার কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শ্বশুরঠাকুরের চিঠিটি ছিল এরকমের—

প্রাণাধিক রবি—

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করিয়াছ এবং লিখিয়াছ যে, 'আমি বারিষ্টার হইব।' তোমার এই কথার উপরে এবং তোমার শুভবুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া তোমাকে ইংলণ্ডে যাইতে অনুমতি দিলাম। তুমি সৎপথে থাকিয়া কৃতকার্য্য হইয়া দেশেতে যথাসময়ে ফিরিয়া আসিবে, এই আশা অবলম্বন করিয়া থাকিলাম। সত্যেন্দ্র পাঠাবস্থাতে যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততদিন ২৪০ টাকা করিয়া প্রতিমাসে পাইতেন। তোমার জন্য মাসে ২৪০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম। ইহাতে যত পাউণ্ড হয় তাহাতেই তথাকার তোমার যাবতীয় খরচ নির্বাহ করিয়া লইবে। বারে প্রবেশের ফী এবং বার্ষিক চেম্বার ফী আবশ্যকমতে পাইবে। তুমি এবার ইংলণ্ডে গেলে প্রতিমাসে ন্যূনকল্পে একখানা করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে। তোমার থাকার জন্য ও পড়ার জন্য সেখানে যাইয়া যেমন ব্যবস্থা করিবে তাহার বিবরণ আমাকে লিখিবে। গতবার সত্যেন্দ্র তোমার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন, এবার মনে করিবে আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমার স্নেহ জানিবে। ইতি ভাদ্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।

প্রথমবার বিলেত-প্রবাসের সময় বড়কর্তা রবিবাবুর ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। সে সময় তার যে শুভবুদ্ধির অভাব ঘটেছিল, তা শ্বশুরঠাকুরের চিঠিতে স্পষ্ট। রবিবাবু কি সে সময় অসৎপথের পথিক হয়ে গিয়েছিল? নইলে কেন বড়কর্তা 'তুমি সৎপথে থাকিয়া কৃতকার্য্য হইয়া দেশেতে যথাসময়ে ফিরিয়া আসিবে'-জাতীয় কথা লিখবেন? তিনি রবিবাবুর ওপর ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। তার ছোট পুত্রটি যে ঠাকুরবাড়ির মান-মর্যাদার কথা বেমালুম ভুলে অমর্যাদাকর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তা সর্বাংশে বিশ্বাস করেছিলেন শ্বশুরঠাকুর। দ্বিতীয়বার বিলেতে গিয়ে রবিবাবু যে আগের মতো অস্থির জীবন যাপন করবে না সে ব্যাপারে বড়কর্তা শঙ্কাগ্রস্ত ছিলেন। কোনো খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য যেমন মা-বাবারা তাঁদের সন্তানকে দিব্যি দেন, সেই রকম দিব্যিরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় শ্বশুরঠাকুরের চিঠি থেকে। পুত্রের পাশে পাশে পিতার অবস্থানের কথা উল্লেখ করে শঙ্কাগ্রস্ত পিতা লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'এবার মনে করিবে আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

এই চিঠি পড়ার পর আমার ভেতরে আকুলিবিকুলি শুরু হলো—রবিবাবু লন্ডনে আসলে কী করেছিল, যার জন্য শ্বশুরঠাকুর এত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন! এই রহস্যের উন্মোচন আমাকে করতেই হবে।

একদিন রবিবাবুর লন্ডন-জীবনের তথ্য আমি অবগত হলাম। লন্ডনে স্কট পরিবারের অতিথি হয়েছিল সে। ড. স্কটের চার মেয়ে—বড় মিস কে, মেজো মিস জে, সেজো মিস এল আর ছোট মিস এস। রবিবাবু একসঙ্গে দুই কন্যার প্রেমে পড়ল। মিস এল এবং মিস এসকে নিয়ে তার দোটানাটানির প্রেম। কখনো সে মিস এল-কে সঁপে দিচ্ছে তার হৃদয়, আবার কখনো মিস এস-কে নিয়ে বিভোর হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মিস এল মানে লুসিকেই সে মনপ্রাণ উৎসর্গ করল। রবিবাবু লুসিতে আত্মহারা। লন্ডনের উন্মুক্ত বাতাবরণ রবিবাবুর দেহ ও মনকে উতলা করে তুলল। পিয়ানো বাজনারত উদ্ভিন্নযৌবনা লুসি রবিবাবুর মনে দাউ দাউ আগুন জ্বালিয়ে দিল। কখনো ভালোবাসার আতিশয্যে রবিবাবু জড়িয়ে ধরছে লুসিকে আবার কখনো তার দু'গালে এঁকে দিচ্ছে ভালোবাসার প্রগাঢ় চিহ্ন।

রবিবাবুর এসব বেপথী জীবনযাপনের সংবাদ শ্বশুরঠাকুর অবগত হয়েছিলেন একদিন। তাই তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন লন্ডন থেকে। ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয়বার লন্ডনে যাওয়ার প্রস্তাবে এরকম চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন শ্বশুরঠাকুর।

কিন্তু পিতার অনুমতি পেয়েও সে-বার রবিবাবু বিলেত যেতে পারল না। যেতে পারল না বললে ভুল হবে, গেল না বললেই সত্যের অপলাপ হয় না। রবিবাবুর দ্বিতীয়বার বিলেত যাবার মুখেই নতুন বউঠান আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে। এই ঘটনায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার বিশৃঙ্খলার প্রতিঘাতে ভেঙে পড়ে। এই ধরনের আত্মহত্যার উদ্যোগ ঠাকুর-পরিবারে এই প্রথম। এরকম অভাবিত ঘটনায় এ বাড়ির প্রত্যেকে হকচকিয়ে যায়। একটু সুস্থির হয়ে প্রায় সবাই কাদম্বরী বউঠানকে দোষ দিতে থাকে। ঠাকুরবাড়ির সুনাম ও মান-মর্যাদাকে দুর্নামের সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নতুন বউঠান আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছে বলে সবাই বিশ্বাস করল। বিশ্বাস করেনি একজন, সে রবিবাবু। বলেছিল, 'বউঠানকে সবাই দোষ দিলেও আমি দোষ দিইনি তাকে।'

প্রায় উনিশ বছরের দাম্পত্য জীবন আমার। দশ বছরের কাছাকাছি বয়সে আমার সঙ্গে রবিবাবুর বিয়ে হয়েছিল। মাস খানেক আগে আমার বয়স আটাশ বছর পুরিয়ে গেল। তিন কন্যা আর দুই পুত্রের জন্ম দিয়েছি আমি। হঠাৎ আমার ইচ্ছে জাগল আমার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কিছু লেখার। বাইরের মানুষ জানে, রবিবাবু আর মৃণালিনীর দাম্পত্য জীবন অনেক সুখের। কিন্তু প্রকৃত সত্য তো এটা নয়। রবিবাবু আমাকে কাদম্বরী বউঠানের মতন ভালোবাসেনি, আনার মতো পছন্দ করেনি আর ইন্দিরার মতো মর্যাদাও দেয়নি।

রবিবাবু কোথায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র আর কোথায় আমি ফুলতলি গ্রামের বেণীমাধবের মেয়ে ভবতারিণী! মনমানসিকতা আর দেহসংগঠনের তুল্যমূল্যে অনেক ফারাক আমাদের দুজনের মধ্যে! আমার পিতৃদত্ত নাম পাল্টে দিয়েই রবিবাবু প্রথম জানান দিয়েছিল—আমাকে সে জীবনের শুরুতেই কতটুকু অপছন্দ করে। বিয়ের পর প্রথম রাতেই রবিবাবু আমাকে বলেছিল—আমার কাছে তুমি ভবতারিণী নও, তুমি মৃণালিনী। কেন রবিবাবু আমার নাম পাল্টে দিয়েছিল, সে কথা সেদিন জিজ্ঞেস করার বয়স ও সাহস আমার ছিল না। রবিবাবুর কথাকে নীরবে মেনে নিয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু জিজ্ঞাসাটা আমার মনের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। রবিবাবুর অন্য ভাইয়েরা তাঁদের বউদের নাম পাল্টাননি। সবাই তাঁদের স্ত্রীদেরকে পিতৃদত্ত নামে এই বাড়িতে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন; শুধু বঞ্চিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিলাম আমি। এখানে কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলবেন—কাদম্বরীর নামটাও তো পাল্টানো নাম। মাতঙ্গিনী থেকে কাদম্বরী করা হয়েছে। কথাটা সত্যি নয়। কাদম্বরী বউঠানের বাপের বাড়িতে মাঝে মাঝে কেউ কেউ নতুন বউঠানকে মাতঙ্গিনী নামে সম্বোধন করত। কিন্তু সেখানে নতুন বউঠান কাদম্বরী নামেই বেশি সম্বোধিত হতো। ঠাকুরবাড়িতে নতুন বউঠানের কাদম্বরী নামটাকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেরকম হয়নি।

কিন্তু আজ আমি জেনে গেছি—এত রকমের বৈচিত্র্যময় নাম থাকা সত্ত্বেও সে রাতে কেন রবিবাবু আমার নাম মৃণালিনী রেখেছিল। রবিবাবুর জীবনে আনা তড়খড় অন্য রকম একটা মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। রবিবাবু আনার নাম দিয়েছিল—নলিনী। গভীরভাবে এই তরুণীকে ভালোও বেসেছিল রবিবাবু। নইলে কেন এতগুলো বছর পেরিয়ে আসার পরও আমার যখন নতুন নাম রাখার তাগিদ অনুভব করল রবিবাবু, নাম রাখল ওই নলিনীই। মৃণালিনী আর নলিনী তো সমার্থক শব্দ। যা নলিনী, তা-ই মৃণালিনী। বিয়ের অনেক দিন পর এক শীতদুপুরে আমরা পাশাপাশি শুয়ে ছিলাম। রথী-মাধুরী দরদালানে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলতে গেছে। দরজা ভেজানো ছিল। রবিবাবু আমাকে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে সোহাগে মত্ত হয়ে উঠেছিল। আমার ঠোঁটে-গণ্ডদেশে তার আদরের ঠোঁট বুলিয়ে যাচ্ছিল। আর মৃদু অথচ গাঢ় কণ্ঠে বারবার বলছিল, 'মৃণালিনী, আমার মৃণাল, মৃণাল।' আমারও উচিত ছিল তার আদরের প্রত্যুত্তর দেওয়া। কিন্তু আমি ওই সময় কেন জানি আমার ভেতরে কোনো সাড়া পাচ্ছিলাম না। রবিবাবুর সেই দুপুরে ভরিয়ে দেওয়া সোহাগের মধ্যে হঠাৎ আমার নাম পাল্টানোর কথাটি মনে পড়ে গিয়েছিল। আমি বারবার চেষ্টা করছিলাম—কথাটিকে আমার মন থেকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিতে।

কিন্তু পারছিলাম না। আমার নিজের অজান্তেই ওই সময় মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, 'আচ্ছা, তুমি আমার পিতৃদত্ত নামটা পাল্টেছিলে কেন? মৃণালিনী নামটাই বা রাখতে গিয়েছিলে কেন?'

আমার কথা শুনে হঠাৎ রবিবাবুর আদর থেমে গিয়েছিল। একধরনের শিথিলতা আমি তার দেহ ও চেহারায় লক্ষ করেছিলাম। তার পরও আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মৃণালিনী কেন?'

রবিবাবু অলস ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছিল, 'এমনিতেই। ভালো লেগেছিল বলেই নামটা দিয়েছিলাম।'

'মৃণালিনী মানে পদ্ম, নলিনীও তাই। তুমি আনার নাম দিয়েছিলে নলিনী। নলিনী তোমার তরুণ বুকে বিপুল একটা জায়গা করে নিয়েছিল। তাকে ছেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসার পরও ভুলতে পারোনি তাকে, স্ত্রীকে ওই নাম দিয়ে নিত্যদিন সেই আনা তড়খড়কে নিয়েই তোমার মানসিক জীবনযাপন।' আমি রবিবাবুর চোখে চোখ রেখে সে-বেলা কথাগুলো বলেছিলাম।

'কী পাগলামি করছ তুমি? মনগড়া সংযোগ ঘটিয়ে কাহিনি তৈরি করছ তুমি।' রবিবাবুর গলাতে দৃঢ়তার অভাব ছিল।

আমি আমার উত্তর পেয়ে গিয়েছিলাম সেই দুপুরে। রবিবাবুর নড়বড়ে কণ্ঠ তার ভেতরের আসল চিত্রকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। আমি আর কথা বাড়াইনি। চিত হয়ে শুয়ে সিলিংয়ের দিকে নীরবে তাকিয়ে থেকেছিলাম। রবিবাবুর কী অবস্থা জানি না, আমার কিন্তু সে সময় খুব অসহ্য লাগছিল তাকে, তার পাশ থেকে উঠে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আমার সে সাহস ছিল না। এত বড় মাননীয় একজন লোককে ওভাবে কষ্ট দিতে আমার মন চাইছিল না। এই সময় আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল মাধুরী। দরজার বাইরে থেকে ডেকে উঠেছিল, 'মা।'

আমি রবিবাবুর পাশ থেকে উঠে যাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। আঁচল ঠিক করে বিছানা থেকে নেমে বলেছিলাম, 'আয় মা।'

এর পরও আমি আজীবন রবিবাবুর মৃণালিনী হতে চেষ্টা চালিয়ে গেছি। রবিবাবু ভালোবেসেছে আনা তড়খড়কে, ভালোবেসেছে তার নতুন বউঠানকে। আমাকে ভালোবাসেনি। বউঠানের আত্মহত্যার প্রসঙ্গটি টেনে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন তুমি বউঠানকে দোষ দাওনি। আত্মহত্যা যেমন কলঙ্কের, আত্মহত্যার চেষ্টাও তেমনি নিন্দার। কী বলো?'

'আমি মানি না। তুমি আজ স্থান ও সময়ের দূরত্বে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় কথাগুলো বলে যাচ্ছ, কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। একজন বাইরের মেয়ে বলে, সহায়হীন বলে সবাই সেদিন তাকে আত্মহত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত করতে চেয়েছে। কিন্তু কেউ ভেবে দেখেনি বউঠানের অন্তরের ব্যথাটি।' রবিবাবু ধীরে ধীরে বলে গেছে।

'সে কেমন?' আমি জানতে চেয়েছি।

রবিবাবু আমাকে বুঝিয়েছিল—একটা বিরূপতার মধ্যে ঠাকুরবাড়িতে নতুন বউঠানের জীবনযাপন। এ বিরূপতা জ্ঞানদা বউদির, এ বিরূপতা সন্তানধারণের অক্ষমতার। সন্তান হিসেবে যাকে আঁকড়ে ধরেছিল বউঠান, দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু ঘটেছিল। প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে পড়েছিল বউঠান। রবিবাবু হাজার চেষ্টা চালিয়েও তাকে স্বাভাবিক করতে পারেনি। বারো বছরের বিবাহিত জীবনে প্রকৃত স্বামীসান্নিধ্য যাকে বলে, তা খুব ভালো করে পায়নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বউঠান। এসব কারণে নতুন বউঠানের চারদিক থেকে দিনের আলো নিভে এসেছিল। সে ঠিক করেছিল—আত্মহত্যাই শ্রেয়। কিন্তু সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল বউঠান।

এই ঘটনার পর বড়কর্তার নির্দেশে জ্যোতিদা নতুন বউঠানকে নিয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বউঠান প্রথমে রাজি হয়নি। জ্যোতিদাও যে স্ব-উদ্যোগে কাদম্বরী বউঠানকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তা নয়। শ্বশুরঠাকুরের কড়া নির্দেশে জ্যোতিদা বেরোতে বাধ্য হয়েছিলেন। বড়কর্তা বেশির ভাগ সময় ঠাকুরবাড়ির বাইরে অবস্থান করলেও অন্দরমহলের কূটনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ভেতরমহলের অধিকাংশ স্ত্রী-কন্যা-দাসীদের রসনা যে শিথিল, তা-ও অবগত ছিলেন তিনি। প্রতিকূল পরিবেশ আর নিজের সন্তানের বিশৃঙ্খল জীবনযাপন শ্বশুরঠাকুরের মনকে কাদম্বরী বউঠানের অনুকূল করে তুলেছিল। তিনি ভেবেছিলেন—কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ থেকে কিছুদিনের জন্য দূরে থাকলে হয়তো জ্যোতির বউ সুস্থ জীবনে ফিরে আসবে।

রবিবাবুর এই সব কথা বলার একফাঁকে আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি যাওনি সঙ্গে? বেড়াতে?'

কেন জানি রবিবাবুর মেজাজটা অত্যন্ত রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। আমার প্রশ্নকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারত সে। বলতে পারত, কী যে বলো, আমি কেন যাব? ব্যথাতুর বউঠান স্বামীসান্নিধ্যে আনন্দ পাবে। আমি কেন তাদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াব? কিন্তু রবিবাবু ওদিকে গেল না। রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'কী বলতে চাইছ তুমি? ওদের সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম কি না! মানে?'

আমি অভ্যস্ত শান্ত কণ্ঠে বলেছিলাম, 'অন্যান্য বার তো তুমি গিয়েছিলে তাদের সঙ্গে। ওই যে শ্রীরামপুরের চাঁপদানির বাগান, মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি!'

এবার তীব্র গলায় রবিবাবু বলে উঠল, 'অশিক্ষিত নারীর মতো কথা বলছ কেন? বাগানবাড়ির কথা বলে কী বোঝাতে চাইছ তুমি?'

আমি কিন্তু কিছুই বোঝাতে চাইনি। রবিবাবু তো এর আগে জ্যোতিদা-বউঠানের সঙ্গী হয়েছে। আনন্দ-উল্লাসে দিন কেটেছে তাঁদের। সেবারও তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিল কি না জানতে চেয়ে কোনো অপরাধ করেছি বলে তো আমার মনে হলো না। আমার সহজ জিজ্ঞাসার উত্তরে এত কঠিন গলায় রবিবাবু এসব কী বলল? অশিক্ষিত নারী বলল আমাকে! হ্যাঁ, আমি যে অশিক্ষিত ছিলাম, সেটা তো ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে। অশিক্ষিত ছিলেন জ্ঞানদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বউদি, অশিক্ষিত ছিল নতুন বউঠান। আমিও শুধু অক্ষরজ্ঞানটা নিয়েই শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলাম। কিন্তু আমার হৃদয়বান শ্বশুর আমাকে অশিক্ষিত করে রাখেননি। ইংরেজি শেখার জন্য তিনি আমাকে লরেটো হৌসে পাঠিয়েছিলেন। বিয়ের পরবর্তী দুবছর আমি খুব যত্ন নিয়ে ইংরেজি শিখেছিলাম। এই রবিবাবু নিজেই ইংরেজির পাশাপাশি রামায়ণাদি গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ যাতে আমি অনুধাবন করতে পারি, সে ব্যবস্থা নিয়েছিল। তা ছাড়া রবিবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ আমাকে ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলায় দক্ষ করে তুলেছিল। তবে জ্ঞানদা বউদি বা কাদম্বরী বউঠানের মতো শিক্ষিত হয়ে ওঠা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তাই হয়তো আমার স্বল্পশিক্ষিত হবার ব্যাপারটি রবিবাবু তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। সে হয়তো আমাকে শিক্ষায় কাদম্বরী বউঠান বা আনা তড়খড় বানাতে চেয়েছিল। আমি রবিবাবুর সে আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। শুধু সময়ের অভাবেই তা সম্ভব হয়নি। বলা যায়, রবিবাবুই আমাকে শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ দেয়নি।

উনিশ বছরের বিবাহিত জীবনের অধিকাংশ সময়ই তো আমাকে আঁতুড়ঘরে কাটাতে হয়েছে। বিয়ের দুবছর পর আমার প্রথম সন্তান বেলা জন্মাল। ঠিক পরের বছর দ্বিতীয় সন্তান রথীন্দ্রনাথ এল আমার পেটে। পনেরো বছর বয়সের মা আমি। দুটো বাচ্চা নিয়ে কী যে হাল আমার, তা সহজে অনুমেয়। বছর তিনেক কাটতে না কাটতেই রবিবাবু তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিল আমার গর্ভে। রেণুকার বয়স দুবছর হতে না হতেই চতুর্থ সন্তান মীরার জন্ম হলো। আমার শরীর তখন ক্লান্ত। মানসিক অবসন্নতা আমাকে পেয়ে বসেছে। এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি তখন পাগলপ্রায়। রবিবাবু তখন তার বিশ্ব নিয়ে মশগুল। সাহিত্য রচনা, নানা সভা-সমিতিতে যোগদান আর জমিদারির দেখভালে সে পরিপূর্ণভাবে মগ্ন। সন্তান দেখাশোনার সমুদয় দায়িত্ব আমার ওপর। সংসার আর সন্তান নিয়ে আমি তখন দিশেহারা। মনে করেছিলাম, মীরার জন্মের মধ্য দিয়ে আমার মা হবার ব্যাপারটি সমাপ্ত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, মীরাতে রবিবাবু থেমে গেল না। মীরার জন্মের ঠিক পরের বছর রবিবাবু শমীন্দ্রকে জন্ম দিল আমার পেটে। একুশ বছরের একজন নারীর পক্ষে পাঁচ-পাঁচটি সন্তান লালন-পালন করা সম্ভব কি না ভাবার বিষয়। তার পরও আমি কিন্তু ভেঙে পড়িনি। ঠাকুরবাড়ির কোলাহলের মধ্যে পাঁচটি সন্তানের বোঝা কাঁধে নিয়ে আমি অবিরাম রবিবাবুর উপযুক্ত হয়ে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে গেছি। কিসে রবিবাবুর সুখ, কিসে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাচ্ছন্দ্য—অবিরত তার অনুসন্ধান করে গেছি।

কিন্তু আজ রবিবাবুর কথা শুনে আমার মনে হলো আমার সকল সাধনা, সকল চেষ্টা নিরর্থক। নইলে কেন অশিক্ষিত নারীর সঙ্গে আমায় তুলনা করল রবিবাবু? আসলে রবিবাবু আমার সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্যে কাটানোর সময়ও মনে হয়েছে—রবিবাবু আমার নয়, অন্য কারও। মনকে জিজ্ঞেস করেছি—সেই অন্যজন কে? মন বলেছে—কাদম্বরী।

সেদিন কিন্তু রবিবাবুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠার উচিত জবাব দিয়েছিলাম আমি। বলেছিলাম, 'তোমার বিদ্যার তুলনায় আমি অশিক্ষিত, মানি। কিন্তু জ্ঞানদা বউদি বাদে অন্যান্য বউয়ের তুলনায়? আর অশিক্ষিত যদি হয়েই থাকি সে তোমার জন্য। তুমিই আমাকে শিক্ষাগ্রহণ করার সময় দাওনি।'

রবিবাবু বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমি সময় দিইনি মানে!'

'বিশদে যাব না। শুধু বলব, নয় বছরে পাঁচ-পাঁচটি সন্তান জন্ম দিয়েছ তুমি। নিজের দিকে তাকানোর পর্যন্ত অবকাশ দাওনি তুমি আমাকে।' আমি বলেছিলাম।

রবিবাবুর মুখে রা নেই। আসলে সে কী বলবে, ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। তার বোকাসোকা সহজ-সরল গ্রামীণ স্ত্রীটি কী বলছে এসব? এত কঠিন কথা শুনবার জন্য প্রস্তুত ছিল না রবিবাবু। অনেকটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। আমি সুযোগ নিলাম। আবার বললাম, 'তোমার দিদিমা দিগম্বরী দেবী ছয় বছর বয়সে প্রিন্স দ্বারকানাথের বউ হয়ে এ বাড়িতে এসেছিলেন। লেখাপড়া জানতেন না তিনি। তোমার ঠাকুরদা কোনো দিন অশিক্ষার খোঁটা দেননি তাঁকে। তোমার ঠাকুরদা তোমার ঠাকুরমাকে প্রচণ্ড ভয় করতেন বলে শুনেছি। তোমার বাবা, মানে আমার শ্বশুরঠাকুরের কথাই ধরো। ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন স্বর্গীয় কর্তামা সারদা দেবীকে। তিনি পড়তে পারতেন না। সাক্ষী তুমি। তোমাকেই তো তিনি রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনাবার জন্য ডাকতেন অন্দরমহলে। তুমি কি কখনো শুনেছ অশিক্ষিত নারী বলে তোমার পিতা শাশুড়িমাতাকে অপমান করেছেন? পিতামহ বা পিতা যা করেননি, তা তুমি আজকে করলে। পরোক্ষে অশিক্ষিত ডাকলে আমাকে! এ আমার দুর্ভাগ্য নয় তো কী?'

আমার তীব্র ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখে রবিবাবু সেদিন একেবারে মিইয়ে গেল। সাহিত্যিক মানুষ। কথার পিঠে কথা জুড়ে সেদিন সে অনেক কথা বলতে পারত আমাকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমার এতগুলো কথা শোনার পরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাল না সে।

অনেকক্ষণ চুপ মেরে থাকল শুধু। তারপর মাথা তুলে আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'না, সে যাত্রায় বউঠানদের সঙ্গে আমি যাইনি। যেতে চাইওনি। ভেবেছি, ওরা স্বামী-স্ত্রী মিলে নিজেদের জীবন সম্পর্কে বোঝাপড়া করুক। দাদা ক্ষমা প্রার্থনা করুক বউঠানের কাছে আর দাদাকে ঘিরে তার যেসব অস্বস্তি, বউঠান তা ঝেড়ে-কেশে বলুক। ওই সময় আমি বেমানান তাদের মধ্যে। তাই আমি যাইনি।'

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—অশিক্ষা বিষয়ে আমি এতক্ষণ যেসব কথা বললাম, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্যই করল না রবিবাবু।

সে যাত্রায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়া হয়নি। তাঁরা কিছুদিন এখানে-ওখানে ভ্রমণ করেছেন বটে, কিন্তু সে ভ্রমণের শুভ কোনো প্রভাব অন্তত নতুন বউঠানের ওপর পড়েনি। যদি পড়ত, তাহলে বউঠান দ্বিতীয়বার আর আত্মহত্যার চেষ্টা চালাত না।

আমার বিয়ের চার মাস দশ দিন পর নতুন বউঠান দ্বিতীয়বার আত্মহত্যার উদ্যোগ নিল এবং সফলকাম হলো। আমি তখন নিতান্ত এক বালিকাবধূ, ঠাকুরবাড়ির। ঘোমটার আড়াল থেকে মুখ বার করবার অধিকার আর সাহস কোনোটাই হয়নি তখনো আমার। সবাই ফিসফাস করছে। কেউ স্পষ্ট করে মুখ খুলছে না। সবাই বিমর্ষ, আতঙ্কিত। সবচেয়ে বেশি বিচলিত শ্বশুরঠাকুর। দাসী-চাকরদের ফিসফিসানি থেকে যা দু-চারটি ছুটকাছাটকা কথা আমার কানে এসে বাজল, তাতে বোঝা গেল—ঠাকুরবাড়ির জন্য নতুন বউঠানের আত্মহত্যার ব্যাপারটি বড়ই অস্বস্তিকর।

সবচেয়ে বেশি বিষণ্ন দেখলাম রবিবাবুকে। নির্বাক, স্তব্ধ। চেতনাবিহীন একজন মানুষ যেন সে। চোখ খোলা কিন্তু দেখছে না; শ্বাস নিচ্ছে যেন বেঁচে নেই, শুনছে যেন বোবা। দরজা-জানালা লুণ্ঠিত হওয়া একটা প্রাসাদ প্রান্তরের মাঝখানে একাকী দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন দেখায়, সেরকমই দেখাচ্ছিল রবিবাবুকে। ঝড় শেষে ডালপালাহীন একটি বৃক্ষের মতো অসহায় অবস্থা তখন রবিবাবুর। সবকিছু দেখছি; কিন্তু কিছুই বলার সামর্থ্য নেই আমার। বউঠানের আত্মহত্যায় আমিও কম স্তম্ভিত হইনি। ঠাকুরবাড়িতে এই বউটি যে জ্ঞানদা বউদির পরই গুরুত্বপূর্ণ, তা চার মাসে আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। তার আত্মহত্যাতে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি কোনোভাবেই বউঠানের আত্মহত্যার হিসাব মেলাতে পারছিলাম না। যে বউটি স্বামীর পাশাপাশি চিৎপুরের রাস্তায় আর গড়ের মাঠে ঘোড়া ছুটিয়ে যেত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকলজ্জাকে থোড়াই পাত্তা দিত, সে বউ কেন আত্মহত্যা করবে? যার 'নন্দনকানন' সংগীত ও সাহিত্যচর্চায় নিত্য মুখর হয়ে উঠত, সে কেন আত্মহত্যা করবে? যাকে কবি বিহারীলাল *সাধের আসন* কাব্য উৎসর্গ করেন, সে কেন আত্মহত্যা করবে? সে সময় হিসাব মেলাতে পারিনি আমি। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার যতই বয়স হয়েছে, ততই বউঠানের আত্মহত্যার রহস্যটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিয়ের পর রবিবাবু আমাকে নিয়ে মত্ত হয়ে পড়েছিল। যে বউঠান তার সব আদরের কেন্দ্রস্থল, আমি সেই জায়গায় ভাগ বসালাম। রবিবাবু নতুনের পূজারি। নতুন বউঠান তখন পুরাতনের দলে। আমি বালিকা হলেও রবিবাবুর কাছে আকর্ষণীয়। আমার রহস্য তার কাছে তখনো পুরোদমে অনুন্মোচিত। আমাকে আবিষ্কারের নেশায় মেতেছে তখন সে। নতুন বউঠানের কাছে যাবার সময় নেই তখন তার। একদিকে মৃণালিনী আর অন্যদিকে কবিতা রচনা—এই দুটো নিয়ে মশগুল তখন রবিবাবু। এক এক রাতে আমার কানের কাছে মুখ এনে কবি তার সদ্যরচিত কবিতা শোনাচ্ছে—

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি,
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।

অথবা—

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কি রে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয়-সযতন-গোপন হৃদয়।

নতুন বউঠান হেরে যাচ্ছে ছোট একটি বালিকার কাছে, এ বড় অসহনীয়। সময়, সান্নিধ্য, ভালোবাসা—সবই কেড়ে নিতে বসেছে গ্রাম্য এক বালিকা। এ অপমান রাখে কোথায় নতুন বউঠান! ব্যথায় তার বুক চিনচিনিয়ে ওঠে। রবিকে হারিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরতে যায় বউঠান। কিন্তু স্বামীর হৃদয়েও তখন জায়গা নেই নতুন বউঠানের—জ্যোতিদা তখন অন্যলগ্ন। সে এক বিখ্যাত অভিনেত্রী। জ্যোতিদার জ্ঞানদা বউদি-মগ্নতা কোনো রকমে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু এক নটির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা মেনে নেওয়া অসম্ভব। একদিন ধোপার বাড়িতে দেওয়া জ্যোতিদার জোব্বার পকেটে সেই নটির সঙ্গে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তরঙ্গতার কতগুলো চিঠি পেয়ে যায় নতুন বউঠান। নারীরা স্বামীকে যমের হাতে তুলে দিতে রাজি, কিন্তু অন্য নারীর হাতে নয়। কাদম্বরী বউঠানের সেদিনের মানসিক অবস্থা সহজে অনুমেয়। প্রধানত এ দুটো কারণে নতুন বউঠান ভেঙে পড়ে।

স্বামী উদাসীন ও অন্য নারীতে আসক্ত। স্নেহ, কৌতুক আর ভালোবাসায় যে দেবরটি নতুন বউঠানকে বিভোর করে রাখত, সে এখন স্ত্রীলগ্ন, স্ত্রীমগ্ন। তার আরেক অবলম্বন ছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। জ্যোতিদা সময় দিচ্ছেন না বলে তেতলার নন্দনকাননের কবি-আসরে তিনিও আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। এ ছাড়া তখন জ্যোতিদা জাহাজের ব্যবসায় ব্যস্ত ভীষণ। তাঁরও সময়ের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। কখন আসেন কখন যান, তার কোনো রীতিপদ্ধতি নেই। কোনো কোনো দিন রাতেও আপন ঘরে ফেরেন না জ্যোতিদা। প্রণয়-সম্পর্কিত দেবরকে হারিয়ে, ছোট বালিকার কাছে হেরে গিয়ে, স্বামীর অবিশ্বস্ততার নিদর্শন হাতে পেয়ে বউঠান তখন দিশেহারা। এরকম অবস্থায় একদিন স্বামীর মুখোমুখি হয় নতুন বউঠান।

'এত দিন আমার প্রতি যে ভালোবাসা তুমি দেখিয়েছ, তা খাদ মেশানো ছিল।' ব্যথাতুর কণ্ঠে বলেছিল নতুন বউঠান।

জ্যোতিদা টেবিলে বসে ব্যবসার কী সব কাগজপত্রে নিমগ্ন তখন। রাত অনেক।

স্বামীর কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে নতুন বউঠান রুক্ষ কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করেছে, 'তুমি আমার কথা শুনতে পাওনি?'

'শুনতে পেয়েছি। উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না।' তাচ্ছিল্যের ছোঁয়া জ্যোতিদার গলায়।

'উত্তর তুমি দেবে কোত্থেকে? তোমার কাছে তো আমার প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই। যে নিজের বউকে ছেড়ে বাজারে নারীতে আসক্ত হয়, তার কাছে আমার প্রশ্নের কী উত্তর থাকবে?'

'কথাটা একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?' উপহাসের সুরে জিজ্ঞেস করেন জ্যোতিদা। লজ্জাহীন তাঁর কণ্ঠ।

'মানে?' বিস্মিত কণ্ঠ নতুন বউঠানের।

এবার ধীরে ধীরে বলেন জ্যোতিদা, 'যে নারী নিজের স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষে মগ্ন হয়, তাকে কী বলবে তুমি? বিশ্বস্ত?'

বরফশীতল কণ্ঠে এবার নতুন বউঠান জিজ্ঞেস করে, 'কী বোঝাতে চাইছ তুমি? রবির বিষয়ে ইঙ্গিত করছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার চুপচাপ হয়ে গেলেন জ্যোতিদা। ক্রোধান্বিত চোখে নতুন বউঠান স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক চিরে। এবার দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'তোমার কথা অমূলক নয়। হ্যাঁ, রবিকে আমি ভালোবাসি। তাকে ভালোবাসতে বাধ্য হয়েছি আমি। তুমিই আমাকে বাধ্য করেছ।'

দ্রুত চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন জ্যোতিদা। মুখে কিছু বললেন না। চেহারায় বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা। নতুন বউঠান আবার বলতে শুরু করল, 'তুমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জ্ঞানদা বউদির ঘরে কাটিয়েছ, মশগুল থেকেছ নাটক, সাহিত্য এসব নিয়ে। পরে জড়িয়েছ নটিনীর সঙ্গে। ব্যবসা-বাণিজ্যের নাম করে তুমি বহুদিন আমার কাছ থেকে দূরে সরে থেকেছ। এই সময় আমি কী করব? একজন উঠতি বয়সের তরুণী আমি। আমার মানসিক এবং দৈহিক অবলম্বন চাই। সেই অবলম্বন তুমি হতে পারতে, কিন্তু তুমি দূরে সরে গেছ। আমি হাতের নাগালে পেয়েছি রবিকে। তাকেই আঁকড়ে ধরেছি। আমার বেপথী জীবনযাপনের জন্য কে দায়ী? তুমিই দায়ী। তোমার অবহেলার জবাব দিতে গিয়ে আমি রবিকে জড়িয়ে ধরেছি। তুমি আমার দেহকে জাগিয়েছ, প্রয়োজনের সময় তোমাকে কাছে পাইনি। তাই রবি আমার মানসিক স্বস্তির এবং নিবিড় সান্নিধ্যের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে, অপরাধই করেছি আমি। এই পরিবারে এই অপরাধ শুধু আমি একা করিনি, করেছে জনাকয়েক বউঠানও।' সুতীব্র আক্রোশ ঝরে পড়তে লাগল নতুন বউঠানের গলা থেকে।

সে রাতে জ্যোতিদা চেয়ার ছেড়ে উঠে নতুন বউঠানের গালে নাকি কষে একটা চড় বসিয়েছিলেন। চড় খেয়ে বউঠান কাঁদেনি, একটি টুঁ শব্দও করেনি। আঁধার-ঘেরা বারান্দায় বসে থেকেছিল সারা রাত। সকালে জ্যোতিদা বেরিয়ে পড়েছিলেন নিজের কাজে। বউঠান স্বাভাবিক আচরণ করেছিল সবার সঙ্গে। বাড়ির কেউই তার অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করেনি সেই সকালে বা তার পরের দুদিন। কিন্তু বউঠানের ভেতরে তখন উন্মাতাল ঢেউ। চড় খাওয়ার সে রাতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল তার পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে। ভেতরে আগুন জ্বললেও বাইরে ধোঁয়া বেরোতে দেয়নি বউঠান।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের কাছে কাপড় বেচতে আসত এক কাপড়ওয়ালি। বহু বছর আগে থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এ প্রথা। কাপড়চোপড়, প্রসাধন সামগ্রী, পাদুকা—এসব জিনিসের নারী বিক্রেতাদের বাছাই করা কয়েকজনের ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশের সুযোগ ছিল। বড়কর্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমতিক্রমেই এরা নারীমহলে ঢোকার অধিকার পেয়েছিল। বিশু কাপড়ওয়ালি তাদের একজন। বিশুর সঙ্গে কথা বলার ফুরসত নেই অন্যান্য বউ বা ঠাকুরকন্যার। সন্তান-সংসার নিয়ে ব্যস্ততার কারণে ওঁরা নিজেদের পছন্দ মতন কাপড় বাছাই করে দ্রুত বিদেয় করত বিশুকে। বিশু দুদণ্ড স্বস্তি পেত নতুন বউঠানের ঘরে গিয়ে। দু-চার কথা জিজ্ঞেস করত সে বিশুকে, আর বিশুও তাকে দু-চারটা সুখদুঃখের কথা বলে মনে স্বস্তি পেত। এভাবে বিশু কাপড়ওয়ালির সঙ্গে নতুন বউঠানের একটা সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এই সহজ সম্পর্কের সুযোগ নিয়েছিল নতুন বউঠান। জ্যোতিদার সঙ্গে মনোমালিন্যের এক দিন পর বিশু ঠাকুরবাড়িতে এসেছিল কাপড় বেচতে। অন্যান্য ঘরে কাপড় বেচে বিশু উপস্থিত হয়েছিল নতুন বউঠানের দরজায়। বউঠানকে দেখে সেদিন বিশু হতবাক হয়ে গিয়েছিল। চোখের নিচে কালি, আলুথালু পোশাকে বসে আছে খাটে। বিশুর ডাকে কী রকম চোখে তাকাল বউঠান! অন্যান্য দিনের মতো খলবল করে এগিয়ে এল না। খাটে বসা অবস্থায় বলল, 'আজ কিছু নেব না রে, বিশু।'

'কেনে বউঠান? মন খারাপ বুঝি? আজকে বড় ভালো শাড়ি এনেছিলাম একখান। বালুচরি শাড়ি। সবুজ আর লালে মেশানো।' বিশু বলেছিল।

ক্লান্ত বিষণ্ন চোখ তুলে নতুন বউঠান বলেছিল, 'না রে বিশু, কাপড় নিতে আজ ইচ্ছে করছে না।'

'তাহলে যাই বউঠান।' বলেই ফিরে যাচ্ছিল বিশু।

ওই সময় ব্যগ্রকণ্ঠে নতুন বউঠান বলে উঠেছিল, 'তুই আমার একটা কাজ করে দিতে পারবি, বিশু? আমাকে আফিম এনে দিতে পারবি?'

'আফিম! তুমি মেয়েমানুষ, আফিম দিয়ে তুমি কী করবে? শুনেছি, পুরুষরাই খায় আফিম। শরীরে তাগদ আনবার জন্য।' বলেই মুচকি হেসেছিল।

বিশুর কথা শুনে থতমত খেয়ে গেল বউঠান। তবে তা সামান্য সময়ের জন্য। নিজেকে সামলে নিয়ে বউঠান মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আমার ঘরে কি পুরুষ নেই রে, বিশু?'

বিশু খলখলিয়ে হেসে উঠে বলল, 'অ, তাই তো। আমি তো সেদিকে ভাবিনি? আচ্ছা বলো, কতটুকু আনতে হবে।'

নতুন বউঠান কী জানে কোন পদ্ধতিতে আফিম বেচে দোকানদাররা? শুধু জানে, কবিরাজি দোকানে অন্যান্য মহৌষধির সঙ্গে আফিমও বিক্রি হয়। বিশুর কথা শুনে বউঠান বলল, 'আনিস তোর বুদ্ধিতে যতটুকু কুলোয়।' তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে নিচু স্বরে বলল, 'মরবার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুই আনিস।'

বিশু বউঠানের বিড়বিড়ানি শুনে বলল, 'কিছু বলছ গা, নতুন বউঠান?'

'না, তুই এখন যা। আর এই নে টাকা। কালকেই নিয়ে আসিস।' বলল সে।

'ঠিক আছে, বউঠান।'

বিশুর আনা আফিম খেয়েই আত্মহত্যা করেছিল বউঠান। আফিম খাওয়ার পরপরই তার মৃত্যু হয়নি। ঝিম ধরে শয্যায় শুয়ে ছিল সে। কোনো ছটফটানি নেই, নেই কোনো হাহাকার। দেহটিকে বিছানায় শুইয়ে রেখে যেন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল নতুন সে। এরকম ক্ষেত্রে আত্মহত্যা প্রয়াসীরা সাধারণত বাঁচবার জন্য আকুলিবিকুলি করে। আশপাশের মানুষজনকে অনুরোধ করে—আমাকে বাঁচাও, আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু নতুন বউঠান এসবের কোনোটাই করল না। নিমীলিত চোখে বিছানায় পড়ে ছিল শুধু। মৃদু লয়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। কিছুক্ষণ পরপর দেহটি হঠাৎ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

মুহূর্তে সংবাদটি চাউর হয়ে গেল গোটা ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ি নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল। চারদিকের আলো যেন হঠাৎ করে নিভে গেল। প্রচণ্ড হাহাকার সমস্ত বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল। তবে এই হাহাকারের কোনো শব্দ নেই, কোনো আকার-আকৃতি নেই, নেই কোনো উদ্বাহু নৃত্য। সমুদ্রের তীব্র অন্তঃস্রোতের মতো সারা ঠাকুর-পরিবারে আর্তনাদের নিঃশব্দ স্রোতটি বয়ে যেতে লাগল শুধু।

শ্বশুরঠাকুরের নির্দেশে দ্রুত ডাক্তার ডাকা হলো। নিয়ে আসা হলো কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার ডি বি স্মিথ, ডাক্তার নীলমাধব হালদার ও ডাক্তার সতীশ মুখোপাধ্যায়কে। দুদিন আপ্রাণ চেষ্টার পরও ডাক্তাররা নতুন বউঠানকে ভালো করে তুলতে পারলেন না। অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে গেল। নতুন বউঠানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন ডাক্তাররা। কিন্তু মহর্ষি কিছুতেই রাজি হলেন না। বললেন, হাসপাতালে নিলে আত্মহত্যার সংবাদটি লোকসমাজে চাউর হয়ে যাবে। মুখ দেখানোর জো থাকবে না কলকাতার সমাজে। হাসপাতাল না, ঘরেই চিকিৎসা করে ভালো করে তুলতে হবে জ্যোতির বউকে। শ্বশুরঠাকুরের কঠোর অবস্থানের কারণে নতুন বউঠানকে হাসপাতালে নেওয়া হলো না। এক সকালে সূর্যের আলো যখন জানালার কাচ ভেদ করে বউঠানের শরীরে এসে পড়ল, ঠিক তখনই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

অস্বাভাবিক মৃত্যু। পুলিশকে জানানো হলো। এরকম পর্যায়ে মৃতদেহ মর্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির মর্যাদা বলে কথা! মহর্ষি আপন শক্তি প্রয়োগ করলেন এ ক্ষেত্রে। মর্গে গেলে শুরু হবে নানা কানাঘুষা ও রটনার। সাংবাদিকদের কানে যাবে। ওঁদের খোঁড়াখুঁড়িতে আসল সত্য বেরিয়ে পড়বে। আসল সত্য মানে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের কলঙ্ক। এ কলঙ্ক কোনোভাবেই প্রকাশ করা যাবে না। তাই শ্বশুরঠাকুর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই করোনার কোর্ট বসালেন। কোর্ট তাইরে নাইরে করে একটা রিপোর্ট লিখে দিয়ে ঠাকুরবাড়ির ইজ্জত বাঁচাল সে যাত্রা।

এরপর যথানিয়মে কাদম্বরী বউঠানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। এই কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। নিমতলা ঘাটের শ্মশানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন সোমেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ ও রবিবাবু।

ঠাকুরবাড়ির প্রতিটি খুঁটিনাটি সংবাদপত্রে ছাপানো হতো। সাংবাদিকেরা মুখিয়ে থাকতেন এ বাড়ির সংবাদের জন্য। কিন্তু সেই বাড়ির এত বড় আত্মহত্যার খবর সে সময়ের কোনো সংবাদপত্রে ছাপা হলো না। আমার শ্বশুরঠাকুর অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। মাঝেমধ্যে তিনি ধুরন্ধরতারও পরিচয় দিতেন। কাদম্বরী বউঠানের আত্মহত্যার খবরটি সংবাদপত্রে না ছাপানোর ব্যাপারে তিনি শেষোক্ত চরিত্রের পরিচয় দিলেন। বউঠানের মৃত্যুর পর সম্পাদকদের তিনি কলকাতার সামজাদা হোটেলে নৈশভোজে ডেকেছিলেন এবং সংবাদটি না ছাপানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শ্বশুরঠাকুর ছিলেন কলকাতার প্রতাপশালী ব্যক্তি। ধনে আর মানে মাত্র কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলত। তাই তাঁর অনুরোধকে সম্পাদকরা অগ্রাহ্য করেননি। তবে এ জন্য শ্বশুরঠাকুরকে মোটা অঙ্কের টাকা গুনতে হয়েছিল। কত টাকা খরচ করেছিলেন সে রাতে, তা হয়তো ঠাকুরবাড়ির আয়ব্যয়ের হিসাবের খাতা ঘাঁটলে পাওয়া যাবে।

নতুন বউঠানের মৃত্যুতে রবিবাবুর জীবনে অসহনীয় বেদনা নেমে এল। তার প্রিয়তমা বউঠানের মৃত্যুশোক তার কাছে কতটুকু গভীরতর হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এত দিন পর্যন্ত মৃত্যু সম্পর্কে তার কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। মায়ের মৃত্যুর সময় রবিবাবু ঘুমিয়ে ছিল, বড় বউঠাকুরানী সর্বসুন্দরী দেবীর মৃত্যুর সময় কবি ছিল আমেদাবাদে, ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হয় আমাদের বিয়ের রাতে, শিলাইদহে। কিন্তু কাদম্বরী বউঠানের যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু ঘটল রবিবাবুর চোখের সামনেই। বউঠানের সুগঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকর্ষণীয় দেহটি তারই চোখের সামনে জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেল! এ ভীষণ বেদনার, মর্মান্তিক কষ্টের! সেই কষ্টের কথাটি রবিবাবু নিজের মধ্যে চেপে রাখেনি। তার কাছে তখন লোকলজ্জা গৌণ, স্ত্রী নগণ্য, সমাজসংসার অসার। সে তার মনোভাব প্রকাশ করার জন্য হাতে কলম তুলে নিল। বউঠানের আত্মহত্যার অব্যবহিত পরই রবিবাবু লিখল 'পুষ্পাঞ্জলি'। এই লেখাটি *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন ওই লেখাটি পড়ার মতো বিদ্যা আমার হয়ে ওঠেনি। বয়সও অনুকূল ছিল না। এই ঘটনার বহু বছর পর *ভারতীর* পুরোনো সংখ্যা ঘাঁটতে গিয়ে রবিবাবুর ওই লেখাটির ওপর আমার চোখ আটকে যায়। রচনাটির একটা অংশ আমি বারবার পড়ি। লেখাটির ওই অংশটি পড়ে আমার বারবার মনে হয়েছে, আমার স্বামীর কাছে আমি কিছুই না। গৃহসজ্জার সামগ্রী ছাড়া তার কাছে আমার কোনোই মূল্য নেই। আমি তার সত্তায় নেই, স্মৃতিতেও থাকব কি না, সন্দেহ। তার সকল স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ জুড়ে কেবলই নতুন বউঠান। 'পুষ্পাঞ্জলি'তে রবিবাবু লিখেছে—'হে জগতের বিস্মৃত, আমার চির স্মৃত, ...এ-সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না!'

রবিবাবু অকপটে কাদম্বরী বউঠানের প্রতি তার দুর্বলতার কথা লিখেছে 'পুষ্পাঞ্জলি'তে। এই মর্ত্যে যা কিছু করেছে বউঠানের সঙ্গে বা যা কিছু পেয়েছে তার কাছ থেকে, তাতে সে তৃপ্ত নয়। তার চাহিদা মর্ত্য ছাড়িয়ে অমর্ত্যলোকে প্রসারিত হয়েছে। তাই অনন্তের পথে চলতে চলতে নতুন বউঠানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আশা সে ছেড়ে দেয়নি। পুনরায় সাক্ষাতে বউঠান যাতে আগের মতো তাকে চিনতে পারে, সেই আকুতি প্রকাশ করে। এই আকুতি প্রকাশ করে 'পুষ্পাঞ্জলি'র স্তবকগুলো তার ডায়েরিতে অনেক দিন ধরে লিখে গেছে সে। এই লেখায় রবিবাবু রাখঢাকের ধার ধারেনি। খোলামেলাভাবে বউঠানের প্রতি তার নিবিড় ভালোবাসার সৌরভটুকু ছড়িয়ে দিয়েছে। তার স্মৃতিকে নিজের মধ্যে যেমন আমরণ ধারণ করে রাখবার বিষয়টি এই লেখায় প্রকাশমান, আবার বউঠানের হৃদয়েও অম্লান থাকার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা তাতে স্পষ্ট।

এখন প্রশ্ন—তাহলে রবিবাবুর হৃদয়ে আমার স্থান কোথায়? বউঠানের জন্য তার সমস্ত ভালোবাসা যদি মর্ত্য ছাড়িয়ে অমর্ত্য পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে থাকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে আমার জন্য কী আছে তার বুকে?

আসলে তার হৃদয়কে আমি ছুঁতে পারিনি কখনো। তার হৃদয়ের বাইরে ঠাকুরবাড়ির ইট-কাঠের চৌহদ্দি বা অন্দরমহলের ঘরদোরে আমার অবস্থান। রবিহৃদয়ের বহির্দরজা থেকে অন্তর্লোকে প্রবেশ করার কোনোই অধিকার আমি পাইনি কোনো দিন। আমি সারা জীবন তার শয্যাসঙ্গিনী আর প্রয়োজনসঙ্গিনী হয়েই থাকলাম, হৃদয়সঙ্গিনী হতে পারলাম না।

নয়

শয্যাকক্ষের পশ্চিমের দেয়ালে আমাদের একটা ছবি টাঙানো আছে। আমাদের মানে আমার আর রবিবাবুর। বিয়ের পর প্রথম ছবি এটি। নিত্যদিনের দেখার অভ্যাসে এই ছবিটি আমার কাছে গুরুত্ব হারিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে দর্শনী দাসী ছবিটা নামিয়ে একটু ঝাড়পোছ করে, এই যা। তারপর যথাস্থানে রাখা হয়, দু-চার দিন চোখ যায়। আবার দৈনন্দিন কাজের চাপে ওটা দেয়ালের ছবি হয়ে যায়। মাধুরী যখন খুব ছোট, ওই ছবির দিকে আঙুল তুলে বলত, 'মা, বাবা, বাবা, মা।' ও যখন আরও একটু বড় হলো, একদিন ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, বাবা তোমার চেয়ে অ-নে-ক সুন্দর।'

রবিবাবু সেদিন ঘরে ছিল। মেয়ের কথা শুনে তার চোখে অহংকার ঝিলিক দিয়ে উঠল, তবে তা একটুক্ষণের জন্য। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মাধুরীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, 'মা, ওরকম করে বলতে নেই। মা সব সময়ই সুন্দর।'

মাধুরী তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বসল, 'না বাবা, তুমি মিথ্যে বলছ, মা তোমার চেয়ে সুন্দর না।'

রবিবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, 'তোমার মেয়েকে সামলাও।' বলে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল রবিবাবু।

আমি তো ঠাকুরবাড়ির বউদের মধ্যে সবচাইতে সাধারণ। সাধারণ চেহারায়, সাধারণ বিদ্যায়, সাধারণ আচরণে। রবিবাবুর সৌন্দর্যের কাছে আমি যে নিতান্ত নগণ্য—এই কথাটি বিয়ের পর থেকে আজ অবধি শুনে আসছি। অন্যদের মন্তব্য হজম করেছি স্বভাববশে আর সত্যের তাগিদে; কিন্তু আপন মেয়ে যখন বলে, সে যতই অবুঝ হোক, শুনতে খারাপ লাগে বৈকি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধুরী যখন আমার অসুন্দর চেহারার কথা বলল, তখন বুকটা একটু টনটনিয়ে উঠেছিল। রবিবাবু যখন মেয়ের দিকে এগিয়ে গেল এবং মেয়েকে শাসন করল, তখন খুব ভালো লাগল। কিন্তু এই ভালো লাগা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। রবিবাবু যখন 'তোমার মেয়েকে সামলাও' বলে কক্ষ ত্যাগ করল, তখন বুকের নিচে আগের ব্যথাটা চিনচিনিয়ে উঠল। আমি আশা করেছিলাম, রবিবাবু শেষ পর্যন্ত মেয়েকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবে যে সত্য হলেও কারও সামনে ওভাবে বলতে নেই। সত্য সর্বদা সব জায়গায় বলা উচিত নয়। কিন্তু আদতে তা করল না সে। বরং মেয়ের শেষোক্ত কথাগুলো শুনে মেয়ের দিকে একধরনের প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে কক্ষ ত্যাগ করল রবিবাবু। সেদিন আমি ব্যথা পেয়েছিলাম বৈকি! কিন্তু ওই ব্যথার কথা কোনো দিন কাউকে বলিনি।

আজ বহুদিন পর ছবিটির দিকে হঠাৎ নজর পড়ল আমার। পায়ে পায়ে ফ্রেমটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। দেখলাম, কাচের গায়ে পাতলা ধুলোর আস্তরণ। নাকি দীর্ঘ দিন ও রাতের সময়-স্রোতের আঘাতে আঘাতে কাচটাই মলিন? হঠাৎ আমার মধ্যে বেশ মায়া জাগল। টুলে দাঁড়িয়ে ফ্রেমটি নামালাম। শাড়ির আঁচল দিয়েই তার কাচ মুছতে শুরু করলাম। মুছতে মুছতে হঠাৎ আমার খেয়াল হলো—আরে, এ আমি কী করছি? ওই তো ঘরের কোণে চেয়ার-টেবিল-আলমারি মোছার ন্যাকড়াটা পড়ে আছে, ওটা দিয়েই তো ছবির ফ্রেমটা মোছার কথা আমার! তা না করে নিজের শাড়ির আঁচল দিয়েই কাজটা করতে শুরু করলাম কেন? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমার কাছে নেই।

মায়েরা তাদের সন্তানদের মুখহাত মুছিয়ে দিতে গিয়ে সাধারণত নিজেদের শাড়ির আঁচল ব্যবহার করে থাকে। মাধুরী-রথী খেলাধুলা শেষে যখন আমার কাছে দৌড়ে আসে, আমি আমার শাড়ির আঁচল দিয়েই ওদের হাতমুখের ঘাম মুছিয়ে দিই। ওরা বড় তৃপ্তি পায় তখন। আঁচলের মাধ্যমে মায়ের ভালোবাসার স্পর্শ পেয়ে তরতাজা হয়ে ওঠে ওরা। ওই ফ্রেমটির প্রতি আমি হয়তো মাতৃস্নেহ পোষণ করেছি। সন্তানদের মতো স্নেহাঞ্চলে ফ্রেমটি মুছে আমি বড় তৃপ্তি পাচ্ছিলাম। বিয়ের প্রথম ছবিটি প্রথম সন্তানের মতো আমার ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার রাখে।

যা-ই হোক, মোছার পর ফ্রেমটি যথাস্থানে রাখলাম। দু'কদম পিছিয়ে এসে কাঙালের মতো তাকিয়ে থাকলাম ওটার দিকে। যে সময়ের ছবি ওটা, সে সময় ভালোবাসাবাসির ব্যাপারটা যে কী, সেটা বোঝার বয়স নয় আমার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার সকল তৃপ্তি সকল আনন্দ যেন জমাট বেঁধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে ওই ছবিতেই। আর রবিবাবু! সুখৈশ্বর্যে তার দুচোখ ভেসে যাচ্ছে। তার সমস্ত মুখমণ্ডল ঘিরে প্রশান্তি। বাঁ কাঁধে শাল জড়ানো তার, পায়ে জুতো। রবিবাবু তখন গোঁফ রাখা শুরু করেছে। পেছনের চুলগুলো লম্বা। মাঝখানে সিঁথি। সিঁথি ছাড়িয়ে সামনের চুলগুলো একটু বেঁকে গেছে। আমাকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়ে সে ছবিতে পোজ দিয়েছে। আমার পরনে ঠাকুরবাড়ির পুরোনো ধাঁচের শাড়ি। জ্ঞানদা বউদির প্রচলিত শাড়ি পুরোদমে ঠাকুরবাড়ি গ্রহণ করেনি তখনো। পাতলা সুতোর কাপড় জড়ানো আমার ঊর্ধ্বাঙ্গে। কাপড়ে মাথা-কান ঢাকা। শুধু মুখটাই দেখা যাচ্ছে আমার। সেই মুখে কোনো দ্বিধা বা ভয় নেই। আমার কী রকম যেন ভালোবাসাময় অভিব্যক্তি। আমার ওই দিনের চোখমুখই বলে দিচ্ছে, আমি রবিবাবুকে পেয়ে কত সুখী! ছবিটি আমাদের বিয়ের কত দিন পরে তোলা, তা আমার মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে—বিয়ের পরপর স্বামীকে নিয়ে আমি বেজায় আনন্দে ছিলাম। পরবর্তী জীবনে এই আনন্দ ধরে রাখার ব্যাপারে আমার দিক থেকে কোনো ধরনের কার্পণ্য ছিল না। তার পরও আমার জন্য রবিবাবুর প্রগাঢ় ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত অটুট থাকেনি।

রবিবাবু খুব বঙ্কিমচন্দ্র পড়ত। বলত—বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে কথাসাহিত্যকে বঙ্কিমবাবু মুক্তি দিয়েছেন। ভগীরথের মতো তিনি বাংলা গদ্যকে মরুভূমি পার করে বিপুল জলরাশির সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। *ঘরে-বাইরে* তার খুব প্রিয় উপন্যাস। বিমলাকে তার খুব পছন্দ। মাঝেমধ্যে *ঘরে-বাইরে* পড়ে শোনাত আমাকে। বঙ্কিমচন্দ্র পড়বার জন্যও আমাকে তাগাদা আর উৎসাহ দুটোই জোগাত। এই কথাটা বলার একটা কারণ আছে। 'উত্তরচরিত' বলে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা প্রবন্ধ আছে। ওই প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, স্ত্রী হলো বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে সংসার-সৌন্দর্যের প্রতিমা আর বার্ধক্যে জীবনাবলম্বন। বালিকা বয়সেই রবিবাবুদের বাড়িতে এসেছিলাম বউ হয়ে। বার্ধক্য ছাড়া জীবনের অন্যান্য স্তর রবিবাবুর সংসর্গেই কেটেছে আমার। বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীর যেসব গুণের কথা বলেছেন, তার সবটাই আছে আমার। তাকে রোগে সেবা দিয়েছি, শোকে সান্ত্বনা দিয়েছি, রতিক্রিয়ায় সঙ্গী হয়েছি। তার পরও রবিবাবু আমাকে তার হৃদয়ে জায়গা দেয়নি। মানুষের তো দুটো সত্তা—দৈহিক আর মানসিক। আমার দেহ রবিবাবুর কাছে অপরিহার্য ছিল। কিন্তু মন? আমার মন বা হৃদয় বা অন্তরের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হদিস রাখেনি সে কখনো। তার মানসসঙ্গিনী ছিল অন্যজন, সে ইন্দিরা। স্বামীকে শুধু দেহের দিক থেকে পরিতৃপ্ত করাটাই তো স্ত্রীর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হতে পারে না। দেহ বাদ দিয়ে স্বামীর মনোজগতের গভীরে প্রবেশ করার অধিকারও তো একজন স্ত্রী চাইতে পারে। রবিবাবুর কাছে এই অধিকার চাইবার অধিকার আমারও ছিল। কিন্তু সমস্ত জীবন, আমার মনে হয়েছে, রবিবাবুকে দেহগতভাবে আমি পেয়েছি, তার মন পাওয়া আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি।

আমি মানি—আমার যখন বিয়ে হয়, তখন আমি শীর্ণ ক্ষুদ্র শরীরের এক বালিকা ছিলাম। বয়সে, শরীরে, মনমেজাজে স্বামীর সঙ্গে আমার বিস্তর ব্যবধান। মুহূর্তে আমার মতো ক্ষুদ্র এক বালিকাকে মনের সঙ্গীরূপে বরণ করে নেওয়া রবিবাবুর মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। স্ত্রীকে তাই সে মানসসঙ্গীর পরিবর্তে প্রাথমিক পর্যায়ে দাম্পত্য জীবনের জৈবিক সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে আমি বছরের পর বছর সন্তানসম্ভবা হয়েছি। সে সময় রবিবাবু আমার শারীরিক সামর্থ্যের কথা এতটুকুও ভাবেনি।

জৈবিক চাহিদা দাম্পত্য জীবনের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, শারীরিক সংযম দাম্পত্য জীবনের আরেক সুখকর বিষয়। কিন্তু রবিবাবু সংযমের বাধ্যবাধকতা তার দাম্পত্য জীবনে মেনে চলেনি। তাই বালিকা বয়স থেকে আমাকে উপর্যুপরি পাঁচ-পাঁচটি সন্তানের জননী হতে হয়েছে। একজন মানবীর সঙ্গে একজন মানব দীর্ঘদিন মেলামেশা করলে পরস্পরের মনে পরস্পরের জন্য ভালোবাসার স্ফুরণ ঘটে। আর তাদের মধ্যে সম্পর্কটা যদি স্বামী-স্ত্রীর হয়, তাহলে সেই ভালোবাসা আরও গভীরতা পায়। যদি স্ত্রী স্বামী অনুরাগিণী হয়, যদি কর্তব্যপরায়ণা হয়, যদি স্বামীর দুঃখ-আনন্দ নিজের দুঃখ-আনন্দ হিসেবে গ্রহণ করে, তবে সেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা প্রগাঢ় হওয়া উচিত। যথার্থ স্ত্রী হওয়ার সকল নিষ্ঠা ও বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও রবিবাবুর ভালোবাসা আমি তেমন করে পাইনি। রবিবাবুর মানস-ভালোবাসা পাওয়ার অন্যতম অন্তরায় ছিল ইন্দিরা দেবী।

ইন্দিরা সম্পর্কে আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী। আমাদের মানে রবিবাবুর। রবিবাবুর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা। জ্ঞানদা বউদির শিক্ষিত, মার্জিত, সুন্দরী কন্যা ইন্দিরা। ইন্দিরা আর আমি প্রায় সমবয়সী। আমার চেয়ে দুই মাস দুই দিনের ছোট ছিল ও। কিন্তু শিক্ষায়-দীক্ষায়, সৌন্দর্যে সে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ে অনেক বাড়া। ইন্দিরা বিলেতফেরত। সিমলার অকল্যান্ড হাউস আর কলকাতার লরেটো কনভেন্টের ছাত্রী ইন্দিরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা ইন্দিরা। ফরাসি ভাষা আর ইংরেজি ভাষা ছিল তার বিশেষভাবে অধিগম্য।

ইন্দিরা সম্পর্কে আমার এতগুলো কথা বলার একটা কারণ আছে। তা হলো—আমার সঙ্গে তার বিদ্যের আর সৌন্দর্যের তফাতটা বোঝানো। এই স্বল্প বিদ্যে ও অনাকর্ষণীয় চেহারা নিয়ে ইন্দিরার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা বামনের চাঁদ ছোঁয়ার বাসনার মতো ব্যাপার। রবিবাবু তার ভালোবাসাকে ঘরের সীমানা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। সে আনা তড়খড়কে ফেলে এসেছে, লুসি স্কটের উদ্দাম জীবন তার স্পর্শজগতের বাইরে আর কাদম্বরী বউঠানের গন্ধ-স্পর্শ-সাহচর্য-সংসর্গ থেকে সে বহু দূরে।

এ কথা একজন স্ত্রীর পক্ষে লেখা অত্যন্ত কষ্টকর, তার পরও আমি লিখব। না লিখলে যে সত্যের অপলাপ করা হবে। রবিবাবু নতুন বউঠানের কাছে পেয়েছিল মায়ের স্নেহ, বান্ধবীর প্রশ্রয় আর প্রেমিকার নিবিড় স্পর্শ। বউঠান নেই, স্ত্রী তো আর বউঠান নয়। স্ত্রী তো সহজলভ্য। মূল্যবান বস্তু পাওয়ার আগে মানুষের মধ্যে দুর্বার এক অধীরতা থাকে, কিন্তু প্রাপ্তির পর সেই মূল্যবান বস্তু প্রাপকের কাছে মূল্য হারায়। একজন নারীর বেলাতেও তা-ই। অধরা, অপ্রাপণীয়া নারীর জন্য পুরুষের ভেতরে প্রবল এক বাসনা ঘুরপাক খায়, কিন্তু সেই নারী যখন স্পর্শের আর প্রাপ্তির সীমানায় চলে আসে, তখন সেই নারী ওই পুরুষের কাছে তার মহার্ঘতা হারায়। আমাকে নিয়ে রবিবাবুর বেলায় তা-ই হয়েছে। রবিবাবু প্রাপণীয়াকে ছেড়ে অপ্রাপণীয়ার পেছনে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ধাবিত হয়েছে। এক কাদম্বরীর মৃত্যুর পর আরেক ইন্দিরালগ্ন হয়েছে রবিবাবু। কাদম্বরীর মানস প্রবণতার সঙ্গে ইন্দিরার মানস গঠনের যে প্রচুর মিল। রবিবাবুর দেহ ও মন—দুটোই আমার, একান্তভাবে আমার। এটা আমার ভাবা কি খুবই অসংলগ্ন ব্যাপার বা অযৌক্তিক কিছু? কিন্তু আমি তো জানি, রবিবাবুর মানসরাজ্যের কতটুকু আমার দখলে।

বাহ্যিক আচরণ দেখে শত্রুরাও রবিবাবুকে স্ত্রীর প্রতি অবহেলার দুর্নাম দিতে পারবে না। স্ত্রীর প্রতি স্নেহে-যত্নে, আদরে-আপ্যায়নে কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। রবিবাবু একাধারে কর্তব্যপরায়ণ স্বামী এবং অফুরন্ত স্নেহশীল পিতা। বাইরের মানুষের পক্ষে তার অন্তর্চিত্রের হদিস পাওয়া কখনো সম্ভব নয়। মানুষের একান্ত ভেতরের সুলুকসন্ধানের জন্য প্রয়োজন নিবিড় সান্নিধ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সান্নিধ্য আমি পেয়েছিলাম দিনে-রাতে। ওই একান্ত সময়ে আমি রবিবাবুর মানসলোকের প্রকৃত সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি সূক্ষ্মভাবে অনুভব করতে পেরেছিলাম আমার প্রতি তার প্রকৃত মনোভাব কী? যত্ন-কর্তব্য এক কথা আর ভালোবাসা অন্য একটা ব্যাপার। ওই যে লিখেছি—কর্তব্যপরায়ণ স্বামী! সেটা বুঝেসুঝেই লিখেছি আমি। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে রবিবাবু দায়িত্বশীল, ত্রুটিমুক্ত। কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে? ভালোবাসার ক্ষেত্রে সে দায়িত্বশীল ও একনিষ্ঠ নয়। সেই একনিষ্ঠতার দাবি আমি করতে পারি, বুকে হাত দিয়ে সে দাবি রবিবাবু করতে পারে না। কারণ, দেহগতভাবে বা মনোগতভাবে সে স্ত্রীনিষ্ঠ নয়।

যা-ই হোক, ইন্দিরার কথা বলছিলাম। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ফুলতলি গাঁয়ে। বিয়ের আগে আমার বাপের বাড়ির উঠানে ইন্দিরার সঙ্গে আমার প্রথম চোখাচোখি হয়। প্রথম সাক্ষাতে ইন্দিরার নাক-চোখ কি একটু কুঁচকে গিয়েছিল! সে যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন জ্ঞানদা বউদি, জ্যোতিদা, কাদম্বরী বউঠান, রবিবাবু; ইন্দিরা আর তার দাদাও। সবাইকে তো সে সময় চিনে উঠতে পারিনি। বড়দের প্রতি ভীত চোখে তাকিয়েছিলাম। এক পলক দেখে নিয়েছিলাম রবিবাবুকে। সবাই বলাবলি করছিল—ভবর স্বামী কী সুন্দর রে! সত্যি কথা বলতে কি, নতুন বউঠানের প্রতি আমি তেমন করে তাকাইনি। কেন তাকাইনি, তা বলতে পারব না। তবে ভেবে ভেবে এই প্রশ্নের একটা উত্তর খাড়া করেছি আমি। নতুন বউঠানের গায়ের রং তত উজ্জ্বল ছিল না, অনেকটা মাজা। আমারও তাই। তার গায়ের রঙের জন্যই বোধ হয় সেই সময় কাদম্বরী বউঠান আমার দৃষ্টিকে তেমন করে টানতে পারেনি। কনে দেখার আসর থেকে যখন আমি মুক্তি পেলাম, তখন একটু আড়ালে গিয়ে দেবলোকের মানুষজনকে গভীর চোখে দেখে যেতে লাগলাম। কী অপূর্ব চেহারা ওই নারীটির! পরে তাঁকে আমি জ্ঞানদা বউদি বলে জেনেছি। দুধে-আলতায় মেশানো গায়ের রঙের ওই পুরুষ দুজন! অপলক চোখে বেড়ার আড়াল থেকে আমি তাদের অবলোকন করছিলাম। হঠাৎ একটা কচি কণ্ঠের আওয়াজে আমার ধ্যান ভেঙে গিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ আর ইন্দিরা তখন আমাদের উঠানে লাফালাফি করছিল। ওদের নাম যে সুরেন্দ্র আর ইন্দিরা, সেটা আমি জ্ঞানদা বউদির খবরদারি থেকে জানতে পেরেছিলাম। ওদের অবাক করা চিৎকারে দাওয়া থেকে জ্ঞানদা বউদি উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী হলো ইন্দিরা, সুরেন্দ্র চিৎকার করে উঠলে কেন?' প্রশ্নটা করেছিলেন বউদি, উত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনবার অবকাশ ছিল না তাঁর। আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপে ফিরে গিয়েছিলেন বউদি।

আসল ঘটনাটা এরকম—খোলা উঠান পেয়ে দুই ভাইবোন খুব ছোটাছুটি করছিল উঠানময়। আমাদের উঠানের চারদিক আম-কাঁঠাল-পেয়ারাগাছে ভরা। একটু-আধটু ঝোপঝাড়ও যে নেই বাড়ির আশপাশে, তা নয়। ওই সব গাছের ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্যের আলো এসে আমাদের উঠানে পড়েছে। শীতের দিন। নতুন জায়গা পেয়ে, ঝলমল সূর্যের আলো দেখে দুই ভাইবোন লাফঝাঁপে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ একটা বেজি তার ছেলেপুলে নিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। নিত্যদিনের অভ্যাসবশে ওরা উঠানের একদিকের ঝোপ থেকে অন্যদিকের ঝোপে যাওয়ার পথে উঠানের মাঝ বরাবর চলে এসেছিল। হঠাৎ ইন্দিরার চোখ পড়েছিল ওদের ওপর। আনন্দ-বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছিল ইন্দিরা। তার সঙ্গে গলা মিলিয়েছিল সুরেন্দ্র। তাদের চিৎকার ভয়ের ছিল না। ওই সময় তাদের চোখেমুখে গভীর বিস্ময় ছিল। দুই ভাইবোন একযোগে বলে উঠেছিল, 'কী, কী ও গুলো?'

জ্ঞান দেওয়ার আবেগটি তখন আমার মধ্যে খলবলিয়ে উঠেছিল। আমি দ্রুত তাদের কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম। ইন্দিরার চোখে চোখ রেখে প্রায় অশুদ্ধ উচ্চারণে বলেছিলাম, 'ও গুলা বেজি। পেছনের গুলা বাচ্চা। ওরা কামড়ায় না।'

আমার কথা শুনে ইন্দিরার বলা উচিত ছিল, 'তাই নাকি? বেজি ও গুলোর নাম!' কিন্তু ইন্দিরা এরকম কিছুই বলল না। কড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমি ভয়ানক উৎসাহ নিয়ে আবার কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সে সময় ইন্দিরা বলে উঠেছিল, 'চল রে দাদা, মায়েরা কী করছে গিয়ে দেখি।'

স্বভাবসুলভ জড়তা নিয়ে তখন সুরেন্দ্র একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার প্রতি ইন্দিরার অবহেলা তার বোধ হয় ভালো লাগেনি। দু'কদম এগিয়ে এসে সুরেন্দ্র বলেছিল, 'বড় বেজিটার পেছনের সবগুলিই বুঝি তার বাচ্চা?'

আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, অই সবগুলা তার বাচ্চা।'

দেখলাম, ইন্দিরা দ্রুত সরে যাচ্ছে। আমাদের ঘরের দিকেই যাচ্ছে সে। সূর্যের আলো তার গালের এক পাশে। দ্রুত অপসিয়মাণ ইন্দিরার পদক্ষেপে অবহেলা ঝনঝন করছে। ওই সময় ভালো করে না বুঝলেও পরে বুঝতে পেরেছি, ইন্দিরার ভেতরে আমাকে না-পছন্দের ব্যাপারটি সে সময় টগবগিয়ে উঠেছিল। সেই অবহেলার ব্যাপারটি যৌবনেও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ইন্দিরা। সেদিনের কনে দেখার ব্যাপারটির কথা ইন্দিরা বড় হয়ে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় লিখেছে, যশোরে পিরালি ব্রাহ্মণদের একটি আড্ডা ছিল, তাই জোড়াসাঁকোর বউদের অধিকাংশ সেখান থেকেই আসত। সেই বউরা যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। কিন্তু বেদনার ব্যাপার এই যে, যখন রবিকাকার বউ দেখার তোড়জোড় শুরু হলো, তখন যশোরের সুন্দরীকুল উজাড় হয়ে গিয়েছিল। তাই তো দেখতে অসুন্দর ভবতারিণীকে রবিকাকার জন্য নির্বাচন করতে বাধ্য হলো নির্বাচকমণ্ডলী। তাচ্ছিল্য করে ও আরও লিখেছে, ভবতারিণী হলো জোড়াসাঁকোর বাড়ির দপ্তরের কাজের লোক বেণী রায়ের কন্যা। পরে অবশ্য সে লিখেছে, কাকিমা দেখতে ভালো না হলে কী হবে, সে ছিল মিশুক। পরকে আপন করে নেবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল তার।

জুতো মেরে গরু দান করবার মতো প্রশস্তি ইন্দিরার। মিশুক, পরোপকারী—এসব কথা বলে সে আমাকে যথেষ্ট ওপরে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু নিজের অজান্তে এর আগে সে তার প্রকৃত মনোচিত্র এই লেখায় প্রকাশ করে ফেলেছে। আমি মন্দ চেহারার ছিলাম—এটা তো মিথ্যে নয়। দেখতে ভালো না—এরকম সত্য কথা ইন্দিরার মুখে মানায়। এ বিষয়ে আমারও মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই। কারণ ইন্দিরা তো সত্য কথা বলেছে। আর সত্যের ভার সহ্য করবার ক্ষমতা আমার ছিল। কিন্তু ওই কথাটি কীভাবে সহ্য করি? এ কথা সত্যি যে আমার বাবা ঠাকুর-পরিবারের বাজার সরকার-জাতীয় কিছু ছিল—এই কথাটা কাকিমার বাবার প্রসঙ্গে ওভাবে অশ্রদ্ধার সঙ্গে না লিখলেও পারত। কিন্তু ইন্দিরা লিখেছে। লিখেছে এ জন্য যে সে সুন্দরী, স্পষ্টভাষী, বিদুষী এবং বনেদি ঘরের কন্যা।

যা-ই হোক, সেদিন আমাকে আমার এক পিসিমাই বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। রাজলক্ষ্মী পিসিমা সম্পর্কে বাবার বোন। তিনি বাবার আপন বোনের সপত্নী ছিলেন। সপত্নী হলেও তিনি আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। রাজলক্ষ্মী পিসিমা বেশ শিক্ষিত ছিলেন। শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতেন তিনি। সড়গড়ে ইংরেজিও জানতেন। এই পিসিমা কনে নির্বাচকদের মধ্যে বসে ছিলেন। বাবাই অনুরোধ করেছিল তাঁকে ওই দিন উপস্থিত থাকার জন্য। তো পিসিমা দাওয়া থেকে বিষয়টি খেয়াল করেছিলেন—আমার উপযাচক হয়ে কথা বলা, সুরেন্দ্রের বিস্ময়, ইন্দিরার অবহেলা—এই সব। কাছে এগিয়ে এসেছিলেন পিসিমা। পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী হয়েছে ভব? মন খারাপ?'

'ও কিছু না, পিসিমা। ওদের বেজি চেনাতে এসেছিলাম।'

'আর তাতে ওরা তোমার প্রতি খুশি না হয়ে কী রকম যেন ব্যবহার করেছে, এই তো।' মমতাভরা কণ্ঠে পিসিমা বলেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চকিতে চোখ তুলে বলেছিলাম, 'সবাই না, সবাই না। শুধু ওই মেয়েটি কী রকম যেন অবহেলা দেখাল।'

'শহুরে মেয়ে। ওরা একটু ওই রকমই। তুমি কষ্ট পেয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।' আমার মাথায় হাত বোলোতে বোলোতে বলেছিল পিসিমা।

সব ঠিক হয়ে যায়নি শেষ পর্যন্ত। কাদম্বরী বউঠানের আত্মহত্যার পর রবিবাবুর মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতা লক্ষ করেছি আমি। তার একটা গুণ ছিল। সে কখনো ভেতরের উথালপাতাল ভাবকে বাইরে প্রকাশ করত না। বেদনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার অন্তরের কূলকিনারা ভেঙে ভেঙে চুরমার হতো, কিন্তু সেই ভাঙনপ্রবণ ঢেউয়ের শব্দ বাইরের কাউকে সে শুনতে দিত না। একমাত্র আমিই টের পেতাম তার রক্তক্ষরণের ব্যাপারটি। এক ঘরে এক বিছানায় জীবনযাপন যে আমাদের!

ভেতরের উন্মাতাল ভাবকে সংহত করে সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হয়ে উঠেছিল সে এই সময়। একের পর এক তার গ্রন্থ প্রকাশ পেতে লাগল। বউঠানের মৃত্যুর পর বেরোল *নলিনী* নামের নাটক, *শৈশব সঙ্গীত*, *ভানুসিংহের পদাবলী* নামের কবিতার বইগুলো। তার কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল কলকাতা ছাড়িয়ে বঙ্গদেশের আনাচেকানাচে। তার পরও কেন জানি তার মনে তৃপ্তি নেই। ক্ষণে ক্ষণে আনমনা হয়ে যায় রবিবাবু। গভীরভাবে কী যেন ভাবে, কার কথা যেন ভাবে!

তিন-তিনটি বছর কেটে গেল এভাবে। রবিবাবুর সবকিছু আছে, কিন্তু কী যেন নেই। তার পিতা আছে, স্ত্রী আছে, কন্যা আছে, পুত্র আছে, প্রাচুর্য আছে, খ্যাতিও আছে। তার পরও নাই-এর অতৃপ্তিতে মুহ্যমান রবিবাবু। আসলে তার মানসিক অবলম্বন নেই। আমি তো ইন্দ্রিয়সম্ভোগের প্রয়োজনে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত। আমার তো তার মানসজগতে তেমন করে প্রবেশের অধিকার নেই, যেমন করে ছিল নতুন বউঠানের। নতুন বউঠানের পর তার মনোজগতে আরেকজনকে প্রবেশের অধিকার দিল সে। আসলে রবিবাবু সেই নারীকে প্রবেশের অধিকার দেয়নি, বরং মনের দুয়ার খুলে সেই রমণীকে নিবিড়ভাবে আহ্বান জানিয়েছে তার অবলম্বনের জগতে প্রবেশ করার জন্য। ওই রমণী আর কেউ নয়, ইন্দিরা।

নতুন বউঠানের মৃত্যুর দুই বছর পর থেকে রবিবাবু ইন্দিরাকে চিঠি লেখা শুরু করেছিল। নয় বছর ধরে এদের মধ্যে চিঠির চালাচালি। বেলার জন্মের এক বছর পর থেকে শমীর জন্মের এক বছর পর পর্যন্ত অবিরামভাবে রবিবাবু আর ইন্দিরা পরস্পরকে চিঠি লিখেছে। প্রশ্ন হতেই পারে, একজন শিক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে একজন যশস্বী সাহিত্যিকের চিঠি চালাচালি তো হতেই পারে! এতে দোষের কী আছে?

এর উত্তর লেখার আগে আমাকে একটু দম নিতে হবে। কীভাবে লিখব আমি এ প্রশ্নের উত্তর? এর উত্তরটা আবেগ দিয়ে না লিখে যুক্তি দিয়ে লিখতে হবে। একদিনের কথা মনে পড়ে। রবিবাবু সেদিন কোথায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কোনো মিটিং বা আড্ডা অথবা জমিদারির কোনো প্রয়োজনে হয়তো তাকে বাইরে যেতে হচ্ছিল সেদিন। কোথা থেকে হঠাৎ বেলা আর রথী এসে উপস্থিত হলো ঘরে। বাবার সাজপোশাক দেখে রথী বায়না ধরল, সে-ও যাবে সঙ্গে। রথীর দেখাদেখি বেলাও একই আবদার করতে লাগল। রবিবাবু প্রথম দিকে কোমল স্বরে সন্তানদের বোঝাতে চাইল, জরুরি কাজ, তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বেলা আর রথী নাছোড়। হঠাৎ রবিবাবু কঠোর গলায় বলে উঠল, 'বললাম না, তোমাদের এখন সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' তারপর ক্রুদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখছ না, এরা আমাকে জ্বালাতন করছে? এদের সংযত করতে পারো না?'

আমি কেন জানি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'আহা, বায়না ধরেছে যখন, নিয়ে যাও না সঙ্গে।'

আমার কথা শুনে রবিবাবু নিজের মনের ক্ষোভকে আর চেপে রাখতে পারল না। রাগত কণ্ঠে বলল, 'মেয়েমানুষ তো! সবকিছুকে হালকাভাবে দেখো। বাস্তবদৃষ্টি দিয়ে দেখার অভ্যেস তোমাদের নেই। সবকিছু হৃদয় দিয়ে বিচার করতে নেই, মস্তিষ্ক দিয়েও বিচার করতে হয়।'

আমি প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলাম। এত কোমল অনুরোধের এত কঠোর উত্তর কেন? সন্তানরা বায়না ধরেছে পিতার সঙ্গে বাইরে যাবার, হয়তো তাদের আবদার রক্ষা করা রবিবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। আদর দিয়ে সন্তানদের বোঝানো যেত। কিন্তু রবিবাবু তা করল না। আর আমি কেন তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে রবিবাবুকে অনুরোধ করলাম? রথী-বেলা এর আগে কখনো তাদের বাবার কাছে এরকম করে বায়না ধরেনি। রবিবাবু নিত্যদিন কত সভাসমিতি, আড্ডা বা জমিদারি দেখভালের কাজে সকাল-দুপুর-সন্ধেয় বের হয়। তার সন্তানদের সামনে দিয়েই বের হয় সে। কোনো দিন রথী বা বেলা পিতার সঙ্গে যাবার বায়না ধরেনি। আজ কী হলো কে জানে, পিতার সঙ্গী হবার জন্য আবদার করে বসল তারা। আমারও কী হলো কে জানে, আমিও বললাম, নিয়ে যাও না সঙ্গে! এটাই এই পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম—সন্তানের বাসনা পূরণে পিতার তুলনায় মা-ই এগিয়ে আসে আগে। এটা প্রকৃতির নিয়ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, মায়েদের সকল ভাবনার জগৎ তৈরি হয় সন্তানদের জন্য, সন্তানদের ঘিরেই। হয়তো এ কারণেই ওই দিন আমি রথী-বেলার পক্ষ নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সন্তানদের পক্ষ নেওয়ার অপরাধে রবিবাবুর মুখ দিয়ে কঠিন কথাগুলো বেরিয়ে এল! তার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ সেদিন বজ্রের শক্তিতে আমাকে আঘাত করেছে। আমি স্তম্ভিত, হতবাক। আমার মন বলে উঠল—ভব, রবিবাবুর এই রূঢ় আচরণের একটা জবাব তোমার দেওয়া উচিত। আমি নিজেকে সংহত করলাম। সংযত কণ্ঠে বললাম, 'মেয়েরা সব সময় আবেগ দিয়ে জীবনকে বিচার করে না। বুদ্ধি দিয়েও বিচার করে। কেউ কেউ হয়তো আবেগতাড়িত। যেমন তোমার নতুন বউঠান, যেমন আনা তড়খড়। আমি নই। আমার কাছে আবেগের চেয়ে যুক্তি বড়, কল্পলোকের চেয়ে বাস্তবজগৎ গুরুত্বপূর্ণ।

আমার কথা শুনে রবিবাবুর চেহারা থেকে ক্ষুব্ধ ভাবটি উধাও হয়ে গেল। তার চোখেমুখে অপার বিস্ময়। হয়তো ভাবছে, এ কী! যে নারীটিকে এত দিন অতি সাধারণ মানের, অতি সাধারণ স্বভাবের মনে করেছি, সে-ই কিনা বলে এ কথা! এ তো একজন স্থিতধী, বুদ্ধিমতী, বাস্তববাদী নারীর কথা! তার মুখ থেকে এরকম কথা শুনব, কখনো আশা করিনি তো!

আমাকে তখন কথায় পেয়ে বসেছে। রবিবাবুর দিকে তাকাবার কোনো ইচ্ছে তখন আমার মধ্যে কাজ করছে না। রথী-বেলা যেমন হঠাৎ করেই আমাদের ঘরে এসেছিল, ঠিক তেমনি করেই চলে গেল। গলায় আমার উষ্মা ছিল। বাইরে তাকিয়ে আমি আরও বললাম, 'দেখো, পরনারী যখন কোনো পুরুষের ওপর ভর করে, তখন সেই পুরুষের বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পায়। বাৎসল্য তার কাছে মূল্য হারায়। স্ত্রীর সান্নিধ্য তার কাছে বিষতুল্য মনে হয়। স্ত্রীর কথা তার কাছে অর্থহীন মনে হয়।'

রবিবাবু শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী বলতে চাইছ?'

'আমি কিছুই বলতে চাইছি না। শুধু নিজের বিবেকের সামনে দাঁড়াতে বলছি।' ভেতরটা আমার বেশ অশান্ত তখন। 'তুমি যে বললে আমি আবেগতাড়িত, যুক্তির ধার ধারি না—এ কথা ঠিক নয়। আমার আবেগ তোমাকে ঘিরে, সন্তানদের ঘিরে। ঠাকুরবাড়ির অজস্র ঝুঁটঝামেলার মধ্যে আমি তোমাকে আর রথী-বেলাকে ভালোবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছি। কত ঝড়ঝঞ্ঝা, কত অসহনীয় বেদনা আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেল, বয়ে যাচ্ছেও, আমি বিচলিত হইনি, ভেঙে পড়িনি। ওই হৃদয় দিয়েই আঁকড়ে আছি তোমাকে। তোমার সব অবহেলাকে আমি হেলায় উড়িয়ে দিয়েছি। তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীত ও বর্তমানের জীবনাচরণের প্রেক্ষাপটে বিচার করে দেখো আমার কথাগুলো ঠিক কি না।' আমি চুপ মেরে গেলাম।

রবিবাবু চুপসে গেল। সে-বেলা রবিবাবু আর অনুষ্ঠানে গেল না। শান্ত গলায় বলল, 'তুমি রথী-বেলাকে সাজিয়ে দাও। তাদের নিয়ে আমি গড়ের মাঠে যাব। কোচোয়ানকে বলি গাড়ি প্রস্তুত করতে।' বলেই নিচে নেমে গিয়েছিল রবিবাবু সেদিন।

দশ

নয় বছরের মধ্যে রবিবাবু ইন্দিরাকে অনেক অনেক চিঠি লিখেছে। এসবের উত্তরে সে কতটি চিঠি রবিবাবুকে লিখেছে, তার সংখ্যা আমার জানা নেই। তবে এ সংখ্যা নেহাত কম হবে বলে মনে হয় না। তাদের দুজনের ওপর তখন চিঠি লেখার ভূত চেপে বসেছিল। ইন্দিরাকে লেখা রবিবাবুর চিঠিগুলোতে কত কিছু যে ফুটে উঠেছে! সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রকৃতি, মানবজীবন, জমিদারির কথার পাশাপাশি কত কী? এসব চিঠিতে আরেকটা জিনিস ধরা আছে, তা রবিবাবুর উন্মুক্ত হৃদয়। তার চিঠিতে লেখা আছে—আমাকে নিয়ে তার অতৃপ্তির কথা, আছে ইন্দিরার মতো, কাদম্বরী বউঠানের মতো, লুসি স্কটের মতো একজন নারীকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে না পাওয়ার হাহাকারের কথা।

চিঠি আমাকেও লিখত রবিবাবু, তবে সেসব চিঠি কেজো কথায় ভরা। কিছু কিছু চিঠিতে যে আবেগ ছিল না, এমন নয়। বিদেশ থেকে লেখা চিঠিতে আমার জন্য তার ব্যাকুলতা স্পষ্ট। আদর জানাচ্ছে আমাকে, হামি পাঠাচ্ছে ছেলেমেয়ের জন্য। চিঠির একটা টুকরো অংশ এরকমের—'রবিবারদিন রাত্রে আমার ঠিক মনে হলো আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে জোড়াসাঁকোয় গেছে। একটা বড়ো খাটে একধারে তুমি শুয়ে রয়েছ আর তোমার পাশে বেলা খোকা শুয়ে। আমি তোমাকে একটু-আধটু আদর করলুম আর বল্লুম, ছোট বউ মনে রেখো, আজ রবিবার রাত্রিরে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলুম—বিলেত থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করব, তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে কি না।'

আবেগে ভরপুর এ চিঠি। যেকোনো স্ত্রী এরকম চিঠি পেয়ে খুশিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডগমগ হবে। আমারও হওয়া উচিত। কিন্তু আমি হতে পারিনি। চিঠির কথাগুলোকে একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে, রবিবাবু এখানে শরীরে মগ্ন। তার মন বা আত্মা ছুটে এসেছে আমার সান্নিধ্য-কামনায়। এ স্বাভাবিক। একজন স্বামী তার তরুণী স্ত্রীকে দীর্ঘদিন কাছে না পেলে এরকম ভাবতেই পারে। কিন্তু একজন স্বামী স্ত্রীকে যখন আদর করার সুযোগ পেল, সময় অনুকূল, বিশাল খাট, দীর্ঘদিনের বুভুক্ষা, তাহলে আদরের পরিমাণটা একটু-আধটু কেন? পূর্ণতায় ভরিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা কেন রবিবাবু প্রকাশ করল না ওই চিঠিতে। আমার জন্য সে তার ভালোবাসার ওই একটু-আধটুই তুলে রেখেছে; তার ভালোবাসার ভান্ডার যে অন্যের জন্য অবারিত।

রবিবাবু ছিল স্বপ্নের কারিগর। কল্পলোকের স্বপ্ন দিয়ে বাস্তবকে মাঝেমধ্যে আবৃত করে ফেলত সে। যা কখনো হবার নয়, তারই স্বপ্নজাল বিস্তার করত আমার সামনে। আরেকটা চিঠির কথা বলি। সে-বার সে জাহাজে করে গ্রিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। দু'ধারের প্রকৃতি দেখতে দেখতে সে আমাকে লিখল—বড় মনোমুগ্ধকর এ দেশের প্রকৃতি, সমুদ্র উপকূল, পাহাড়ের ওপর সুশোভিত বাড়িঘর। চিঠিতে সে আরও জিজ্ঞেস করল, এগুলো দেখার লোভ হচ্ছে কি না আমার। বলল, আমি তোমাকে বিদেশে নিয়ে আসব। এই মনোলোভা পথ দিয়েই আসতে হবে তোমাকে। যে স্থান স্বপ্নজগতের মতো অধরা, সে স্থান তোমার স্পর্শের সীমানায় চলে আসবে তখন।

এ শুধু স্বপ্নময় বাতুলতা। কারণ এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন কখনো সম্ভব নয়। আমি তখন দুই সন্তানের জননী, তৃতীয় সন্তান আসি-আসি করছে। সংসারের নানা বেড়াজাল ছিন্ন করে আমাকে বিদেশভ্রমণে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি যেমন জানি, রবিবাবুও জানে। তার পরও সে এরকম স্বপ্নবিভোরতার কথা সাজিয়ে-গুছিয়ে আমাকে লিখেছে। ওই যে বললাম, রবিবাবু স্বপ্নের কারিগর। স্ত্রীর কাছে স্বপ্ন বিলাতে দোষ কী? বাস্তবায়ন দূরে থাক না।

পাশাপাশি আরেকটা চিঠির কথা বলি। তবে সেটা আমাকে লেখা নয়, ইন্দিরাকে লেখা। আমাকে লেখা চিঠিটির পাঁচ বছর পর লেখা। কবি তখন শিলাইদহে। জমিদারি দেখাশোনার প্রয়োজনে দীর্ঘদিন সেখানে থাকতে হচ্ছে তাকে। শরৎকালে লেখা চিঠি। চিঠিটির কিছু অংশ এরকম :

'সমস্ত আকাশ যেন হৃদয়পুঞ্জের মতো আমাকে বেষ্টন করে ধরেছে। আশ্চর্য এই যে, পরশু আমার এখানে যখন জনসমাগম হবে তখন এরা যেন আর থাকবে না—মানুষ এলে যেন প্রকৃতির মধ্যে আর প্রকৃতির স্থান থাকে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-বার কলকাতা থেকে আমাদের সন্তানরা আর আমিই গিয়েছিলাম শিলাইদহে। 'জনসমাগম'-এর মুখ্য উপাদান আমি। আমি রবিবাবুর ঘরনি। সন্তান নয়, স্ত্রী নয়, আমরা হয়ে গেলাম জনগণ। ব্যাকরণগত অর্থে রবিবাবুর এই শব্দটিতে কোনো ভুল নেই, কিন্তু হৃদয়গত ও সম্পর্কের তুল্যমূল্যে শব্দটি আপত্তিকর নয় কি? স্ত্রী-সন্তানরা বহুদিন পর দীর্ঘদিনের জন্য থাকতে এলে বাৎসল্যপ্রবণ যেকোনো পিতা উৎফুল্ল হবে, স্ত্রী-সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষী যেকোনো স্বামী শিহরিত হবে—এটাই কোনো পুরুষের সহজাত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু রবিবাবুর ক্ষেত্রে তা হয়নি। পরমাত্মীয়ের সান্নিধ্যের চেয়ে তার কাছে আকাশ বড়, প্রকৃতি আকর্ষণীয়। শিলাইদহে আমরা যাই—এটা রবিবাবু মন থেকে গ্রহণ করতে পারেনি। ওই সময় আমরা যেন তার কাছে অগ্রহণীয়, অসহনীয়। শিলাইদহে সে একলা থাকতে পছন্দ করছে, জানালার ধারে লম্বা কেদারায় আবিষ্ট চিত্তে বসে থাকতে পছন্দ করছে, এমনকি দিবাস্বপ্ন দেখতেও পছন্দ করছে। শুধু তার পছন্দ হচ্ছে না আমাদের আগমন। আমরা যেন তার নিরলস জীবযাপনের, প্রকৃতিলগ্নতার বিঘ্ন সৃষ্টিকারী।

এই চিঠি পড়ে আমার মানসিক অবস্থা কী দাঁড়াতে পারে? যাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি, আমার জীবনের সবচাইতে বড় মহার্ঘ বলে মেনেছি, সেবা দিয়ে, দেহ দিয়ে যার মনোরঞ্জনের জন্য অবিরত চেষ্টা করে গেছি, সেই রবিবাবু যখন লেখে—প্রকৃতির মধ্যে ডুবে থেকে আমি অমুকের বাবা, অমুকের স্বামী হতে ক্লান্ত বোধ করি, তখন আমার কেমন লাগে?

কয়েক বছর আগে এই রবিবাবুই তো আমাকে বিদেশ থেকে লিখেছে ঘরে ফেরার জন্য তার মন ছটফট করার কথা। আর ঘর যখন তার কাছে এল, তখন রবিবাবুর কাছে আমরা হয়ে গেলাম নির্জনতা-বিঘ্নসৃষ্টিকারী। আমার স্বামীর ভাবনাগুলো বৈপরীত্যে ভরা। কিছুদিন আগের ভাবনার সঙ্গে শিলাইদহের ভাবনাগুলো দ্বন্দ্বমুখর। রবিবাবুর কোন বার্তাটি যে বেশি সত্য, তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

ইন্দিরাকে লেখা রবিবাবুর সকল চিঠি আমার পড়তে পারার কথা নয়। কিছু কিছু চিঠি আমি পড়ার সুযোগ পেয়েছি। যে চিঠিগুলো অর্ধেক লেখার পর রবিবাবু ফেলে রাখত, সময়ের অভাবে সম্পূর্ণ লিখতে পারত না, পরে শেষ করত, এমন সব চিঠিই পড়তাম আমি। চিঠির পুরো অংশ লেখার পরও চিঠিগুলো টেবিলে কিছু সময়ের জন্য ফেলে রাখত রবিবাবু। লেখালেখির ক্ষেত্রে বড় খুঁতখুঁতে ছিল সে। একবার লেখার পর দ্বিতীয় তৃতীয়বারও পড়ত চিঠিগুলো। তখন শব্দ বদলাত, বাক্যও বদলাত। এই সুযোগে আমি পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতাম অসমাপ্ত বা সমাপ্ত চিঠিগুলো। এখন নৈতিকতার প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়ায়। অন্যের চিঠি অনুমতি ছাড়া আমার পড়া উচিত হয়েছে কি না? রবিবাবু আমার কাছে কি দূরবর্তী কেউ? অন্য জন? রবিবাবু তো আমার স্বামী, পরমাত্মীয়। তার আর আমার মধ্যে তো কোনো ফারাক নেই। সুতরাং সর্বদা আমার মনে হয়েছে, তার লেখা চিঠি পড়া কোনো অন্যায়ের নয়, অশোভনও নয়।

প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, অভিরুচি—এসব। সবগুলোই সদর্থক। কিন্তু প্রবৃত্তি শব্দের সঙ্গে আরেকটি অর্থ জড়িয়ে আছে, তা হলো ইন্দ্রিয়সেবার পথ। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য রবিবাবু প্রবৃত্তির প্রশংসা করেছে। বলেছে, মানুষ লোহার কল নয়। মানুষ রক্তমাংসের তৈরি। প্রবৃত্তিতাড়িত হওয়া তেমন কোনো দোষের নয়। মানুষের মন বড় বিচিত্র, বহুবিচিত্রপথগামী সে। আর তার চারদিকে যদি সহজলভ্য বস্তুনিচয় ছড়িয়ে থাকে, তাহলে তো মানুষের মন হেলবেই। এই বস্তুনিচয় যে কী, তা সহজেই অনুমেয়। প্রবৃত্তির দাহ ও তার চরিতার্থতার সমর্থনে রবিবাবু ইন্দিরাকে এমন এমন কথাও লিখে গেছে, যা মুদ্রণযোগ্যতা হারিয়েছে। মুদ্রণ-অযোগ্য শব্দাবলি দিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে চিঠি লেখা যায় কি না, তা প্রশ্নযোগ্য।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বড় খাটটিই আমার প্রধান আশ্রয়। সন্তান ধারণ ও প্রতিপালনের সকল দায় আমার। আমি বাইরের, অন্তরের নই; আমি ব্যবহারের, তুলে রাখার নই। রবিবাবুর কাছে আমি এতটাই সাধারণ যে আমার কাছে তার মনের যত ভাবনাচিন্তা-আকুলতা প্রকাশ করা যায় না। তার মনের নিভৃত অন্দরের বাসিন্দা অন্তত আমি নই, অন্য কেউ। নিজের অন্তরের কথাগুলো অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত করার মানুষ হিসেবে রবিবাবু কখনো আমাকে বেছে নেয়নি।

আমাকে লেখা আমার স্বামীর চিঠিগুলো পরম যত্ন করে সঞ্চিত রাখতাম। তার লেখা ছত্রিশটি চিঠি আমার কাছে আছে। প্রায় কুড়ি বছরের দাম্পত্য জীবনে আমিও তাকে কম চিঠি লিখিনি। কিন্তু আমার চিঠিগুলো তার সঞ্চয়ে নেই। আমার চিঠিগুলো যে সে যত্ন করে রক্ষা করেনি, তা একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেই জেনেছিলাম। একদিন আমি তোরঙ্গ পরিষ্কার করছিলাম। কী করে যেন একটা তেলাপোকা তোরঙ্গে ঢুকে পড়েছিল। সারা তোরঙ্গে তেলাপোকার নাদি। নাদি পরিষ্কার করতে গিয়ে রবিবাবুর লেখা চিঠিগুলো নেড়েঝেড়ে রাখছিলাম। আমার মূল্যবান দ্রব্যাদি ওই তোরঙ্গেই রাখি। দুপুরে খাটে শুয়ে ভাতঘুম দিচ্ছিল রবিবাবু। তোরঙ্গের ক্যাঁতকোঁৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিল সে। আমি হঠাৎ চিঠির তোড়াটি তুলে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এগুলো কার চিঠি, বলো তো?'

রবিবাবু ঘুমজড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কার?'

'তোমার। তোমারই লেখা চিঠিগুলো আমি পরম যত্নে তোরঙ্গে তুলে রেখেছি। আমার লেখা চিঠিগুলো তোমার কাছে আছে তো?'

রবিবাবু আমার কথার কোনো জবাব দিল না। আমার দিকে পেছন ফিরে কোলবালিশটি নিজের দিকে টেনে নিল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কই, কিছু বললে না যে?'

এবার রবিবাবু অলস গলায় বলল, 'কী বলব?'

রবিবাবু সাধারণত এই ধরনের প্রশ্নে 'হ্যাঁ' বা 'না' একটা জবাব দেয়। আমার চিঠিগুলো সে সঞ্চয় করে রেখেছে কি না—এ প্রশ্নের উত্তর তো সোজা—হ্যাঁ, রেখেছি। তার চিঠি আমার কাছে যেমন মহার্ঘ, তেমনি আমার চিঠিও তো তার কাছে মূল্যবান হওয়া উচিত। কিন্তু সে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইছে কেন? আমার মধ্যে রোখ চেপে বসল। আমি বললাম, 'কী বলবে মানে? তুমি কি আমার প্রশ্ন শুনতে পাওনি? যদি না পেয়ে থাকো, আবার বলছি—তোমায় লেখা আমার চিঠিগুলো কি তুমি রক্ষা করেছ?'

এবার স্পষ্ট গলায় রবিবাবু বলল, 'না।'

'মানে চিঠিগুলো তোমার কাছে নেই! হারিয়ে গেছে!' আমি স্তম্ভিত গলায় বললাম।

রবিবাবু শোয়া থেকে উঠে বসল। জোড়াসনে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখো, জমিদারি, লেখাজোখা, সভাসমিতি—এসব নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে। তোমার চিঠিগুলো যত্ন করে রাখার সময় করে উঠতে পারিনি। আছে বোধ হয় এধারে-ওধারে কোথাও।' রবিবাবুর কণ্ঠই বলে দিচ্ছে আমার চিঠিগুলোর মূল্য তার কাছে নিতান্ত কানাকড়ির সম্মানও নেই। মূল্যহীন চিঠিগুলো মূল্যবান রবীন্দ্রনাথ গচ্ছিত রাখার তাগিদ বোধ করেনি।

আমি দুঃখিত কণ্ঠে বললাম, 'এধারে-ওধারে কোথাও নেই। তোমার চোখমুখই বলে দিচ্ছে চিঠিগুলো তোমার কাছে মূল্যহীন। বাজারের ঠোঙা যেমন, ওগুলোর দামও তোমার কাছে তা-ই। একবার পড়ে অবহেলায় ফেলে দিয়েছ ওগুলো।'

রবিবাবু বলল, 'আহা, রেগে যাচ্ছ কেন? চিঠির চেয়ে চিঠি-লেখকের মূল্য বেশি। সেই চিঠি-লেখকই যখন তোমার সম্মুখে, তোমার স্পর্শের মধ্যে, তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠির চেয়ে চিঠিদাতাই তোমার কাছে মূল্যবান নয় কি?'

'বাহ্, চমৎকার যুক্তি তোমার। এ যুক্তি আমার সামনে খাড়া করে তোমার কাছে আমার মূল্যহীনতাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। কত কিছু তোমার সংগ্রহে আছে! নানাজনের চিঠিপত্র, ছেঁড়া টুকরো কাগজ, পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপি, এমনকি তোমার ড্রয়ারে সেদিন তোমার প্রথম রেলভ্রমণের টিকিটটি পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তোমার সঞ্চয়ে শুধু জায়গা পায়নি আমার চিঠিগুলো। কী চমৎকার! না?'

রবিবাবু বলল, 'মনকে ওভাবে পীড়িত করছ কেন? মনকে যথেচ্ছা খুঁতখুঁত করতে দিলেই সে আপনাকে আপনি ক্ষতবিক্ষত করবে। এই স্বেচ্ছাকৃত দুঃখ তুমি বহন কোরো না।'

'আমার চিঠিগুলোকে তুমি যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়েছ যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবার। ব্যাপারটি কি আপনাকে আপনি ক্ষতবিক্ষত করার মতো নয়?' আমি রবিবাবুর মতন করে রহস্যভরা উত্তর দিলাম।

রবিবাবু কিছুক্ষণ আমার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল। আমি নিশ্চিত জানি, সে ভাবছে, আমার সান্ত্বনা বাক্যের কী উত্তর দিল মৃণালিনী? আমার অবহেলাকে এরকমভাবে আক্রমণ করল আমার স্ত্রী!

কিছুক্ষণ পর সে কিছু বলতে চাইল, আমি ডান হাতটা তুলে তাকে থামিয়ে দিলাম। বললাম, 'তুমি সারা জীবন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গেছ, আমি তোমাকে বেশি বেশি চিঠি লিখি না। আজ আমি স্বীকার করছি—হ্যাঁ, আমি তোমাকে তেমন করে চিঠি লিখি না। কারণ, আমাকে লেখা তোমার চিঠিগুলো কেজো কথায় ভর্তি। এই কেজো কথার উত্তর তো কেজো কথায় হবে—কী বলো? তুমি চিঠিতে সংসারের প্রয়োজনীয় সংবাদাদি জানবার জন্য ব্যস্ত হও, পত্রোত্তরে আমি সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিই। কই, কোনো দিন ইন্দিরার মতো চিঠি লেখোনি তো আমাকে! যা-ই হোক, এখন আমার মনে হচ্ছে আমার চিঠিগুলো তোমার কাছে ক্ষণিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নয়।'

রবিবাবু আস্তে করে বিছানা থেকে নেমে শৌচাগারের দিকে এগিয়ে গেল। আমার কথার কোনো জবাব দিয়ে গেল না সে।

রবিবাবুকে চিঠি লেখার ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অনাগ্রহ ছিল না কোনো দিন। বড় বাড়ি। হরেক রকমের ঝুঁটঝামেলা অন্দরমহলে। কত কুটিলতা, কত জটিলতা! সব সময় চোখ কান খোলা রেখে সংসারের দেখভাল করে যেতে হয় আমাকে। কী করে কী করে যেন একসময় এত বড় ঠাকুরবাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্দরমহলের সকল দায়ভার আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। এ বাড়িতে বউ তো ছিলেন অনেক। অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না শ্বশুরঠাকুর। বা অন্য কোনো বউ অন্দরমহলের দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত আমার ওপরই চেপে বসল সংসারের জগদ্দল পাথর। এই পাথরকে আমি বোঝা মনে করিনি।

ভোরসকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সংসারের সকল দিকে আমাকে নজর রাখতে হয়েছে। রান্নাঘরের কাজকর্ম থেকে দাসদাসীদের ঝগড়াঝাঁটি মেটানোর মতো কাজগুলোও আমাকে করতে হতো। সকাল থেকেই গলদঘর্ম অবস্থা শুরু হতো আমার। মাঝখানে সন্তানদের স্নান করানো, খাওয়ানো-দাওয়ানো, স্কুলে পাঠানো—এসব তো ছিলই। গভীর রাতে যখন বিছানার কাছে আসতাম, তখন চিঠি লেখার মন-মানসিকতা থাকত না আমার। স্বামীকে যে শান্ত মনে চিঠি লিখব, সে সময়টুকু বের করা আমার জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াত। কাল লিখব বলে মনকে বুঝ দিয়ে শ্রান্ত দেহে বিছানায় গড়িয়ে পড়তাম। পরের দিন সেরকম অবসর আর আমার হাতে ধরা দিত না।

আর যদি হাতে সময় থাকতও, তাহলেও রবিবাবুকে চিঠি লিখবই বা কেন? রবিবাবুর কাছে তো আমার চিঠির কোনো দামই নেই। সেদিন তার টেবিলে স্তূপীকৃত চিঠিপত্রের বান্ডিলের মধ্যে বেলার একটা চিঠি দেখলাম। পাঁচ বছরের বেলা বাবাকে লিখেছে—'সত্য দাদা আজ কাশি যাচ্ছেন সেই জন্য নরু বউঠানদের জন্য মিষ্টি তৈরি হচ্ছে। মা-ও সেই সঙ্গে তোমাদের আর নাটোরের মহারাজকে কিছু খাবার নিজের হাতে করে পাঠাচ্ছেন। তাই আজ বড় ব্যস্ত আছেন বলে তোমাকে লিখতে পারলেন না, আমাকে বললেন লিখতে।'

ছোট্ট চিঠি, পাঁচ বছরের বালিকার। কেজো কথায় ভর্তি। এই চিঠিতে তেমন কোনো দামি সংবাদ নেই। কিন্তু সেই চিরকুটটিও রবিবাবু পরম যত্নে রক্ষা করে চলেছে। বালিকাকন্যার চিঠিপত্র রবিবাবুর অবহেলা পায়নি। যত অবহেলা শুধু আমার চিঠির প্রতি!

পুরো দাম্পত্য জীবনে রবিবাবু আমাকে যতগুলো চিঠি লিখেছে, তাতে আমার প্রতি তার সম্বোধনটি বিচিত্রতায় ভরা। ভাই ছোট বউ, ভাই ছোট গিন্নি, ভাই ছুটি—এসবের একটি দিয়ে চিঠি শুরু করত সে। 'ভাই ছুটি' সম্বোধনটিই বেশি। 'ভাই' লেখাটা রবীন্দ্র-পরিবারের একটা রেওয়াজ। কিন্তু 'ছুটি'? 'ছুটি' শব্দটি কেন রবিবাবু আমাকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে জানে! আমি এই পরিবারের পুত্রবধূদের মধ্যে সবচাইতে ছোট ছিলাম বলেই কি আমায় এই সম্বোধন? তাহলে দ্বিজেন দাদার স্ত্রী সর্বসুন্দরীকে ভাই বড় বলে সম্বোধন করা উচিত ছিল। কিন্তু সর্বসুন্দরীকে তো তাঁর স্বামী দ্বিজেনদা ওই নামে সম্বোধন করতেন না! ছোট শব্দ থেকে কি ছুটি হয়েছে? ছোট থেকে তো ছোটু হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ছোটু নামে সম্বোধন না করে রবিবাবু আমাকে ছুটি নামে সম্বোধন করত। ছুটি শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে একটি হচ্ছে—চিরবিদায়। রবিবাবু কি আমাকে তার জীবন থেকে চিরবিদায় জানিয়ে রেখেছিল? নইলে ছুটি কেন? এসব এলোমেলো ভাবনা আমাকে মাঝেমধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে তখন। নানা রকম চিন্তা আমাকে কুরে-কুরে খায়। ওই যে বিয়ের প্রথম রাতে রবিবাবু আমার নাম পাল্টে দিল, সে নামে সম্বোধন করে তো আমাকে কোনো দিন একটি চিঠিও লিখল না! কেন লিখল না? ওই নাম যদি শোভন হয়, ওই নামটি যদি রবিবাবু তার বউয়ের জন্য যথোপযুক্ত মনে করে থাকে, মনে যে করেছে, সেটা তো রবিবাবু অস্বীকার করতে পারবে না, তাহলে চিঠিতে কেন কোনো দিন ওই নামটি ব্যবহার করল না?

সাজাদপুর থেকে আমাকে লেখা চিঠিটার কথাই বলি। ওটাতে সে গাল দিয়ে শুরু করে আমাকে জানাচ্ছে, 'যেমনি গাল দিয়েছি অমনি চিঠির উত্তর এসে উপস্থিত।' দায়িত্ব সম্পাদনে আমার কী কী অবহেলা লক্ষ করেছে রবিবাবু, তারই ফিরিস্তিতে ভরা চিঠিটা। যশোরের মেয়ে আমি, রবিবাবুরা কলকাতার। কলকাতার অধিবাসীরা পূর্ববঙ্গের মানুষদের অত্যন্ত অবহেলার চোখে দেখে থাকে। বলে—বাঙ্গাল। নিন্দার্থে ব্যবহার করে তারা শব্দটি। রবিবাবু সেই নিন্দার্থেই 'বাঙ্গাল' শব্দটি ব্যবহার করেছে চিঠিতে। আমাকে জড়িয়ে রথীকেও খোঁটা দিতে ছাড়েনি। লিখেছে, 'ছি, ছি, ছেলেটাকে পর্যন্ত বাঙ্গাল করে তুল্লে গা।' মানে, তুমি তো বাঙ্গালই, তোমার মতো বাঙ্গালের হাতে পড়ে আমার ছেলেটিও বাঙ্গাল হয়ে উঠল। অভব্য, অশিক্ষিত অর্থে রবিবাবু 'বাঙ্গাল' শব্দটি লিখেছে কি তার চিঠিতে?

সংসারের আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে রবিবাবু বেশ হুঁশিয়ার ছিল। কী করে দু-চার-দশ টাকা তার ভাঁড়ারে আসবে এ নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। উপার্জনের নানা পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করে যেত সে। সকালে উঠে বই লিখতে বসত, সেই বই বিক্রির নানা উপায় খুঁজত সে। সংসারে দু-চার টাকা বেশি খরচ হলে খেপে যেত। আসলে বৃহৎ সংসার, নানা চাহিদা তার। কত ঘুপচি পথে যে টাকা খরচ হয়ে যায়! এই টাকা খরচের জন্য তো আমি দায়ী না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু রবিবাবু ব্যয়কে মনে করত অপব্যয়। ব্যয়ের সকল দায় সে আমার ওপর চাপাত। এ জন্য আমাকে মন্দ কথা লিখতেও দ্বিধা করত না। ওই চিঠিতেই রবিবাবু আমাকে লিখেছে, 'তোমরা তো কেবল খরচ কর্ত্তে জান—এক পয়সা ঘরে আনতে পার?'

শুধু তা-ই নয়, রবিবাবুর বদ্ধমূল ধারণা—আমি তার চেয়ে বেলা-রথীকে কম ভালোবাসি, কম যত্ন করি।

বিয়ের ছয় বছর পরে লেখা চিঠিটা, সাজাদপুর থেকে। বেলার বয়স তখন তিন বছর তিন মাস আর রথীর এক বছর দুই মাস। এরকম সময়ে একজন স্বামীর সঙ্গে তার সন্তানবতী স্ত্রীর মধুময় সম্পর্ক গাঢ়তর হবার কথা। কিন্তু রবিবাবুর পক্ষ থেকে তা হয়নি। যদি হয়ে থাকে, তাহলে এই রকম মর্মবেদনাদায়ক চিঠি কেন? এইভাবে লেখা এটাই তার শেষ চিঠি নয়। আমার সঞ্চয়ে তার গালমন্দে ভরা আরও চিঠি আছে।

রবিবাবু যখন দূরদেশে থাকত, আমার চিঠির জন্য অস্থির হয়ে পড়ত। সে-ও চিঠি লিখত প্রচুর, আমাকে। এক দিনে তিন-তিনটে চিঠি লিখেছে, এমন নজিরও আছে। প্রতিটি চিঠির উত্তর চাইত সে, সপ্তাহে অন্তত দুটো চিঠি কামনা করত। চিঠি না পেলে অভিমানে একটু ক্ষুব্ধ হতে উঠত যে আমাকে অকৃতজ্ঞ সম্বোধন করতেও দ্বিধা করত না। কিন্তু রবিবাবুকে আমি বোঝাতে পারি না—কী যন্ত্রণার মধ্যে আমার দিনযাপন; কী রকম কর্মব্যস্ততার মধ্যে যে আমার প্রতিটি পল-মুহূর্ত-মিনিট-ঘণ্টা-দিন-সপ্তাহ কাটে, সেটা তাকে দিব্যি কেটেও বোঝাতে পারি না।

অকৃতজ্ঞ মানে যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। দীর্ঘদিনের দাম্পত্য জীবনের অনেকটা পথ পাড়ি দেওয়া শেষে রবিবাবু আমাকে এই বিশেষণে বিশেষায়িত করতে পারে না। কিন্তু সে করেছে। ক্ষুব্ধ কলমে রবিবাবু লিখেছে—অনেকগুলো চিঠি লেখার পরও তোমার মনে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয় না।

আমি যে তার প্রতি কত কৃতজ্ঞ, তাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে আমি যে কী গভীর আনন্দে মগ্ন, অন্য কেউ না বুঝুক, রবিবাবুর তো তা টের পাওয়ার কথা। মস্ত বড় কবি সে, *বঙ্গদর্শন*-এর সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ, সর্বোপরি, আমার পাঁচ-পাঁচটি সন্তানের জনক। এসব কিছু আমি ভুলি কী করে? একজন অখ্যাত গৃহবধূর স্বামী জগদ্বিখ্যাত। স্বনামে প্রসিদ্ধ স্বামীর প্রতি আমার মতো একজন সাধারণ নারী অকৃতজ্ঞ হব কী করে?

আমি তো পতিদেবতা হিসেবে আমার হৃদয়াসনে রবিবাবুকে স্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছি। যেদিন ঠাকুরবাড়িতে কনিষ্ঠ পুত্রবধূ হিসেবে এসেছিলাম, সেদিন থেকে। কিন্তু আমার চেয়ে তেরো বছরের বড় যুবাপুরুষটি কি আমার মতো নয় বছর নয় মাসের খুদে বালিকাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সখারূপে গ্রহণ করেছিল? বিয়ের মন্ত্র পড়ে কুমারী ভবতারিণী রায় চৌধুরী পদবি ও নাম পাল্টে শ্রীমতী মৃণালিনী ঠাকুর হয়েছিলাম, কিন্তু মনের দিক থেকে কি রবিবাবু আমাকে তার মনের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করেছিল? করেনি। তারও কারণ আছে। আমাদের উভয়ের মধ্যে শিক্ষা, মানে সংস্কৃতিগত বিরাট ফারাক ছিল। জীবনের প্রথম থেকে শেষাবধি এই ফারাকটি ক্রমশ বিশাল হয়েছে। নানা মানুষের সঙ্গে মিশে, দেশি-বিদেশি অনেক বইপত্র পড়ে, বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করে রবিবাবুর ভেতরের আলোটা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। সে রূপান্তরিত হয়েছে যথার্থ আধুনিক মানুষে। কিন্তু আমার ভেতরটা রবিবাবুর মতন করে আলোকিত হবার সুযোগ পায়নি। বিয়ের পরপরই তো অন্দরমহলে আমার স্থান নির্ধারিত হয়েছে, বিশাল পরিবারের সকল দায়ভার ধীরে ধীরে আমার ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছে। তা ছাড়া স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কখনো বা একই বছরে আমাকে পাঁচ-পাঁচটি সন্তান প্রসব করতে হয়েছে, তাদের বড় করে তোলার সকল দায় আমাকেই নিতে হয়েছে। এই রকম চক্রব্যূহের মধ্যে জীবনযাপন করে আমার বইটই পড়ার মতো সংস্কৃতিচর্চার তেমন সুযোগ কোথায়? আর বাইরের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশারও সুযোগ পেলাম কোথায়? যেভাবে জ্ঞানদা বউদি বা নতুন বউঠান মেলা বইপত্র পড়ে বা অন্য শিক্ষিত মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করে নিজেদের গড়েপিটে নিতে পেরেছিলেন, সে সুযোগ আমি তো পাইনি! তা ছাড়া বিদেশ ভ্রমণের সুযোগও তো আমার জীবনে হয়ে ওঠেনি! আমার ভ্রমণ তো সাজাদপুর, শিলাইদহ, নিদেনপক্ষে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত। বিদেশ ভ্রমণে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়, মনের জগৎ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়। কিন্তু আমার বিদেশ ভ্রমণের ভাগ্য হয়ে ওঠেনি। অন্তত রবিবাবু সেই সুযোগ তৈরি করে দেয়নি। বিয়ের পর কতবারই তো সে বিদেশ ভ্রমণ করেছে, আমাকে তো সে কখনো তার সঙ্গী করবার ব্যবস্থা নেয়নি। যদিও বিয়ের প্রথম দিকে সে নানাভাবে বিদেশ ভ্রমণের জন্য আমাকে প্রলুব্ধ করেছে। তার সাক্ষ্য আমার কাছে আছে, তার চিঠিগুলোই এই সাক্ষ্যের পক্ষে প্রমাণ।

আমাদের উভয়ের মধ্যে বয়সের বিরাট তফাত ছিল। এই পার্থক্যটা আমার আর রবিবাবুর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। আঠারো বছরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে আর চব্বিশ বছরের যুবকের মধ্যে মানসিক ব্যবধান যতটুকু না তার চেয়ে ব্যবধান অনেক বেশি দশ ও তেইশ বছরের স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে। দশ বছরের বালিকা বন্ধু হিসেবে চাইবে দশ বা বারো বছরের বালককে, তেইশ বছরের যুবককে দশ বছরের বালিকার পক্ষে বন্ধু হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তার পরও তেরো বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ স্বামীকে বন্ধু হিসেবে, স্বামী হিসেবে মেনে নেওয়ার বা মানিয়ে নেওয়ার বিপুল প্রচেষ্টা ছিল আমার। রবিবাবুর পক্ষ থেকে এই প্রচেষ্টার যথেষ্ট খামতি ছিল।

বিয়ের পর ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে কাউকে আমি একান্ত বন্ধু হিসেবে পাইনি। জ্ঞানদা বউদির কথা এখানে এসে যেতে পারে। আমি আগেই বলেছি, বিয়ের পর পর জ্ঞানদা বউদিই প্রধানত আমাকে শিক্ষিত মানে এই বাড়ির উপযুক্ত বউ হিসেবে গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আমার জীবনে তাঁর ভূমিকা ছিল শিক্ষকের, বন্ধুর নয়। তাঁর হাবভাব, চলন-বলনের মধ্যে একধরনের অভিভাবকত্ব ছিল। খবরদারি করার ব্যাপারটি তাঁর রক্তে মিশে ছিল। অভিভাবকরা যেমনটি করেন, জ্ঞানদা বউদিও তা-ই করতেন। জ্ঞানদা বউদি আমার অভিভাবকই থেকে গেছেন, বন্ধু হতে পারেননি। জীবনের প্রথম দিকে তাঁর নিবিড় সাহচর্য পেলেও আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতুটি তৈরি হয়নি। কারণ একই, বয়সের ব্যবধান আর শিক্ষার ফারাক।

নতুন বউঠান আমার ভালো বন্ধু হতে পারত। সে সুযোগ ও সময় আমাদের হাতে ছিল। কিন্তু নতুন বউঠানের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তেমন উদ্যোগ আমি লক্ষ করিনি। বিয়ের পর থেকে এমনিতেই আমি তাকে মনমরা দেখে আসছিলাম। তার অন্তরঙ্গ হবার জন্য আমি যে দু-চারবার উদ্যোগ নিইনি, এমন নয়; কিন্তু নতুন বউঠানের পক্ষ থেকে তেমন করে সাড়া মেলেনি। সাড়া না পাওয়ার কারণ খুঁজেছি কিন্তু উত্তর খুঁজে পাইনি সেই সময়। কিন্তু এখন আমার কাছে নতুন বউঠানের সাড়া না দেবার কারণটি স্পষ্ট, যেমন করে স্পষ্ট ঠাকুরবাড়ির ভেতরের আর বাইরের মানুষজনের কাছে। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে নতুন বউঠান আর রবিবাবুর সম্পর্কের বিষয়টি আমার কাছে খোলসা হয়েছে।

এ ছাড়া ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য কন্যা আর বউয়েরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে অবিরাম। আমার বন্ধু হবার মন ও সময় তাদের হাতে কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগারো

ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার মধুর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সে বলেন্দ্রনাথ। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবিবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। রবিবাবুর বড় প্রিয় ছিল সে। তার চতুর্থ দাদা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উন্মাদরোগগ্রস্ত। বিয়ের আগে থেকেই বীরেন্দ্রদার মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ বর্তমান ছিল। শুধু বীরেনদা কেন সোমেন্দ্রনাথ দাদার মধ্যেও মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ ছিল। আমার শাশুড়িমাতার ছোট ভাই ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ রায়। বড় ভালোবাসতেন শ্বশুরঠাকুর তাঁকে। ভগ্নিপতির তিনি স্নেহভাজন এবং বিশ্বাসভাজন দুটোই ছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের সংসারের জমা-খরচের তহবিল দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন শ্বশুরঠাকুর তাঁকে। কালক্রমে ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিয়েছিল। মাতুলানুক্রমে রবিবাবুর এই দুই দাদা বীরেন্দ্র ও সোমেন্দ্রের মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার পরও বীরেনদা এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন, প্রেসিডেন্সিতে ভর্তিও হয়েছিলেন। এন্ট্রান্স পাস করার পর ঠাকুরবাড়ির সেরেস্তার হিসাব পরীক্ষকের কাজও করেছিলেন। একুশ বছর বয়সে শ্বশুরঠাকুর বিয়েও দিয়ে দিয়েছিলেন বীরেনদাকে। প্রফুল্লময়ী বউদি বড় ভালো মানুষ ছিলেন। কী হয়েছিল কে জানে—বিয়ের দুবছরের মধ্যে বীরেনদার মাথার গোলমালটা প্রচণ্ড রকমে বেড়ে গিয়েছিল।

ভয়াবহ উন্মাদগ্রস্ততার মধ্যেই বীরেনদা জন্ম দিলেন বলেন্দ্রকে। বলেন্দ্রকে পেয়ে প্রফুল্লময়ী বউদি ঘোর আঁধারে প্রদীপ খুঁজে পেল। বিয়ের পর থেকেই আমি বীরেনদাকে উন্মাদ অবস্থায় দেখছি। প্রফুল্ল বউদিকে দেখে আমার ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। ভাবতাম, বউদির কী দুর্ভাগ্য! একজন পাগল স্বামীকে নিয়ে তাকে ঘর করতে হচ্ছে। ঠাকুরবাড়িতে এসে আমার যখন একটু বোধবুদ্ধি হলো, আমার মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগল। শ্বশুরঠাকুর তো জানতেন বীরেনদা উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ নয় হয়তো, কিন্তু উন্মাদের লক্ষণ তো স্পষ্ট ছিল বীরেনদার মধ্যে, জেনেও কেন বীরেনদাকে বিয়ে করালেন? কেন প্রফুল্লময়ীর মতো একটা মেয়ের জীবনকে বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিলেন? কেনই বা প্রফুল্ল বউদিও এ বিয়েকে মেনে নিয়েছিল?

একদিন এই বিষয়ে প্রফুল্ল বউদির সঙ্গে কথা হয়েছিল এই রকম :

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা বউদি, তুমি জানতে না বীরেনদা উন্মাদ?'

'জানতাম।' সংক্ষিপ্ত উত্তর বউদির।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে?'

'তাহলে কী?' প্রফুল্ল বউদি নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল।

আমি বললাম, 'তোমার মতন একজন রূপসীর এরকম একজন লোকের সঙ্গে বিয়ে হলো—ব্যাপারটা জানতে খুব মন চাইছে।'

আমার কথা শুনেও প্রফুল্ল বউদি নীরব রইল। অনেকক্ষণ পর আবার বললাম, 'কিছু বলছ না যে, বউদি?'

'কী বলব? কী বলব আমি, হ্যাঁ?' হঠাৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল বউদি। কী যেন গভীরভাবে ভাবল। তারপর আমার কাছ ঘেঁষে বসল। আমার ডান হাতটি ধরে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'আমার কপাল রে, ভাই!'

তখন আমি একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম। বউদির চাহনি আর কথা শুনে আমার মনে হলো—এর মধ্যে গভীর কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। এই রহস্য আমাকে উদ্‌ঘাটন করতেই হবে। আমি বউদির দুহাত চেপে ধরে করুণ কণ্ঠে বললাম, 'বলো বউদি, কী কারণে তুমি বীরেনদাকে বিয়ে করতে রাজি হলে?'

'রাজি আমি হইনি। আমার বাবাই একজন উন্মাদের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।'

'মানে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ আমার।

প্রফুল্ল বউদি বলল, 'তুমি তো জানো, হেমেনদার সঙ্গে নীপময়ী দিদির বিয়ে হয়েছে। ছোট বোন হিসেবে এই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল। স্বর্ণদি আর শরৎদির সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হতো। ওদের বোধ হয় পছন্দ হয়েছিল আমাকে। তোমাদের বীরেনদাকে বিয়ে করবার জন্য বারবার অনুরোধ করত ওরা। একদিন আমার স্বামী ওদের কথা শুনে কী রকম যেন পাগলা ঢঙে বলে উঠল—আমি ওকে বিয়ে করব না, কলা বউকে বিয়ে করব। হেসে গড়িয়ে পড়েছিল দিদিরা, আমিও তাদের সঙ্গে হেসেছিলাম। ওই হাসিটাই আমার কাল হয়েছিল।'

আমি বিস্ফারিত চোখে প্রফুল্ল বউদির দিকে তাকিয়ে থেকেছিলাম। কোনো কথা বলতে পারিনি সে সময়। বউদি বোধ হয় আমার মনের কথা আঁচ করতে পেরেছিল। আপনাতেই বলা শুরু করেছিল, 'তাদের সঙ্গে সংগত দিচ্ছি ভেবে স্বর্ণদি ও শরৎদি ধরে নিয়েছিল, তোমাদের দাদাকে বুঝি বিয়ে করতে আমি রাজি। কথাটা গোটা পরিবারে চাউর করে দিয়েছিল ওরা। তাদের কথা শুনে শ্বশুরঠাকুর বিয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।'

'আর তাতেই তুমি রাজি হয়ে গেলে? বাড়ির সবাই তো বলে জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম থেকেই বীরেনদার মধ্যে পাগলামি ভাবটা ছিল। জেনেশুনে তুমি পাগলাটে বীরেনদাকে বিয়ে করলে?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠ আমার।

এবার নরম গলায় বউদি বলল, 'বিশ্বাস করো, আমি জানতাম, তার মধ্যে একটু পাগলামি ভাব আছে। ব্যাপারটাকে তেমন একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি। ভেবেছিলাম, শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ওরকম ভাব একটু-আধটু থাকতেই পারে। কিন্তু তোমাদের দাদা যে এরকম উন্মাদ, টের পাইনি। তবে একজন আগাপাছতলা সবই জানত।'

'কে তিনি,' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

'আমার বাবা হরদেব চট্টোপাধ্যায়। শ্বশুরমশায়ের ভক্তবন্ধু ছিল বাবা। বাবা বড় দরিদ্র ছিল। প্রয়োজনে শ্বশুরমশায়ের কাছে হাত পাততেও দ্বিধা করত না বাবা। শ্বশুরের টাকাতেই পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিল। এই সুযোগটাই নিয়েছিলেন শ্বশুরমশাই। তোমাদের বীরেনদার কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে বাবাকে অনেকটা বাধ্য করেছিলেন শ্বশুর ঠাকুর।' উষ্মার আঁচ প্রফুল্ল বউদির কথায়।

আমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। অবাক চোখে আমি তাকিয়ে থাকি বউদির দিকে।

আমি জানতাম—শ্বশুরঠাকুরের সঙ্গে হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রগাঢ় সখ্য ছিল। শ্বশুরমশায়ের নেতৃত্বে যে কজন প্রতিজ্ঞা করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, প্রফুল্ল বউদির বাবা তাঁদের একজন। তিন-তিনটি বিয়ে করেছিলেন তিনি। প্রথম পক্ষের দুই কন্যা—অন্নদা ও সৌদামিনী। দ্বিতীয় স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃগৃহ থেকে স্বামীর ঘরেও আসেননি তিনি। হরদেবের তৃতীয় পক্ষের তরফে আট কন্যা ও তিন পুত্র। এই পক্ষেরই দুই কন্যা নীপময়ী ও প্রফুল্লময়ীকে বিয়ে দিয়েছিলেন শ্বশুরঠাকুরের দুই পুত্র হেমেন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। হেমেনদা না হয় স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু বীরেনদা! বীরেনদা তো উন্মাদ! কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি। প্রফুল্ল বউদির কথায় বাস্তবে ফিরলাম।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেছিল বউদি। তার কণ্ঠে উপহাসের ছোঁয়া, 'তবে শ্বশুরমশাই আমাকে ঠকাননি। সোনাদানা দিয়ে আমার গা-গতর ভরিয়ে দিয়েছিলেন। সমস্ত গহনা পরিয়ে দিয়ে আমার মা পালকিতে তুলে দিয়েছিল আমাকে। শাশুড়িও আমাকে বিপুল আগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন। সেই আগ্রহ ছিল বাড়াবাড়ি রকমের।' তারপর স্বগত কণ্ঠে বলল, 'আগ্রহ দেখাবে না! পাগলের জন্য বউ খুঁজে পেয়েছে যে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃখী প্রফুল্লময়ী বউদির একমাত্র সন্তান বলেন্দ্র। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে যক্ষ্মায় মারা গিয়েছিল। প্রফুল্ল বউদি দিশেহারা। একদিকে সবেধন নীলমণি পুত্রের মৃত্যু, অন্যদিকে বিকৃতমস্তিষ্ক স্বামী। আর বিধবা পুত্রবধূ সাহানা। প্রফুল্ল বউদির বিষণ্নতা আর বিপন্নতার মধ্যে জীবনযাপন তখন।

এই সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এক অভাবনীয় সংবাদ পেল বউদি। শ্বশুর দেবেন্দ্রনাথ শেষ উইলে তার পরিবারকে বঞ্চিত করেছেন। উন্মাদ বীরেন্দ্রকে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন শ্বশুরমশাই। তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য মাত্র এক শ টাকা মাসোহারা নির্দিষ্ট করেছেন তিনি। নিজের, স্বামীর আর পুত্রবধূর জীবন বাঁচাবার চিন্তায় বউদি অস্থির হয়ে ওঠে এই সময়। গভীরভাবে বৈষয়িক চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে সে। শ্বশুরঠাকুরের অবর্তমানে জমিদারির দায়দায়িত্ব যার ওপর বর্তেছে, সেই রবিবাবুও প্রফুল্ল বউদির এরকম বৈষয়িক চিন্তায় মগ্ন হবার ব্যাপারটিকে সহজভাবে মেনে নেয়নি। সে বউদির আচরণ দেখে আশ্চর্য আর বিরক্ত হয়েছে। রবিবাবু বিরক্ত হয়েছিল ঠিক আছে। বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। বিকৃত মস্তিষ্ক বীরেনদাকে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ দিলে তো রবিবাবুদের ভাগে কম পড়বে। কিন্তু রবিবাবু আশ্চর্য হলো কেন? শ্বশুরমশাইয়ের সম্পত্তিবঞ্চিত, নিতান্ত এক শ টাকা মাসোহারা প্রাপ্ত, বিধবা পুত্রবধূ আর উন্মাদ স্বামীকে নিয়ে অনিশ্চিত জীবনের পথে পাড়ি দিতে হচ্ছে প্রফুল্ল বউদিকে। এরকম অবস্থায় প্রফুল্ল বউদি যা করছে, তা-ই তো স্বাভাবিক। এতে বিস্মিত হবার কী আছে? কিন্তু তার পরও বউদির আচরণ দেখে রবিবাবু বিস্মিত হয়েছে।

শুধু পুত্র রবীন্দ্রনাথ কেন, পিতা দেবেন্দ্রনাথের কথাও আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। বলেন্দ্র যখন মারা যায়, তার স্ত্রী সাহানার বয়স তখন মাত্র পনেরো। সাহানার বাপের বাড়ি এলাহাবাদে। বিধবা হবার কিছুদিন পর পিতৃগৃহ এলাহাবাদে ফিরে যায় সাহানা। কিছুদিন পর শ্বশুরঠাকুরের কাছে সংবাদ আসে—সাহানাকে পুনরায় বিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুরঠাকুরের টনক নড়ে তখন। ঠাকুরবাড়ির বিধবা বধূর পুনরায় বিয়ে! এ কী করে সম্ভব! এটা যে ঘোর অন্যায়! মর্যাদা হানিকর! তিনি ব্রাহ্মসভার প্রধান পুরুষ। ব্রাহ্মধর্মে বিধবাবিবাহ অস্বীকৃত। শুধু তা-ই নয়, গর্হিতও। যে পরিবারকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে দ্বিধা করেননি, সেই পরিবারের নীতিনির্ধারণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধান্বিত হলেন না শ্বশুরমশাই। রবিবাবুকে এলাহাবাদে পাঠিয়ে সাহানার বিয়ে রদ করালেন। শুধু তা-ই নয়, ভবিষ্যতের অমর্যাদার কথা চিন্তা করে রবিবাবুর সরাসরি সহায়তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহানাকে শিলাইদহে নিয়ে এসে তবেই স্বস্তি পেলেন তিনি।

বলেন্দ্রনাথকে তার পরিবারের এসব দুর্গতি দেখে যেতে হয়নি। তার আগেই মারা গেল সে। তার মৃত্যুতে তার পরিবারের যতটুকু ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আমার। বলেন্দ্র আমার মানসিক অবলম্বন ছিল যে। সে ছিল আমার স্বস্তি, সে আমার স্নেহ, সে আমার ভালোবাসা। রবিবাবুর অনুপস্থিতিতে আমি যখন সন্তান আর ঠাকুরবাড়ির অন্তঃকোন্দল—এসব নিয়ে দিশেহারা, তখন বলেন্দ্র আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে আঁকড়ে ধরে আমার ভিতর পানে চোখ রাখবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

বলেন্দ্র আমার চেয়ে তিন বছর চার মাসের বড় ছিল। নাম ধরেই ডাকতাম আমি তাকে। ডাকতাম বলু বলে। নিকটাত্মীয় হলে, সর্বক্ষণ পাশাপাশি থাকলে এবং বয়সের পার্থক্যটা খুব বেশি না হলে দুজন তরুণ-তরুণীর মধ্যে যা হয়, সেরকম একটা প্রীতি ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল আমাদের মধ্যে।

আটাশ বছর বয়সে রবিবাবু তার বাবার কাছ থেকে জমিদারি পরিদর্শনের ভার পেল। বিলম্ব না করেই সে শিলাইদহের উদ্দেশে যাত্রা করল। ওখানেই ঠাকুরবাড়ির উল্লেখযোগ্য জমিদারি। ওই যাত্রাতেই রবিবাবু আমাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের মধ্যে ছিলাম—আমি, আমার এক সহচরী, বেলা আর রথী। আর ছিল বলেন্দ্র। বলেন্দ্র আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে শুনে আমার আনন্দের সীমা থাকছে না। এই আনন্দবোধের যথার্থ কারণ আমার জানা নেই। কেন আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম? সে যাত্রায় আমার স্বামী ছিল সঙ্গে, ছিল আমার পুত্র-কন্যারা। এদের সঙ্গী হিসেবে পেয়েই তো আমার সবচাইতে বেশি আনন্দিত হবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের কারণে নয়, আমার সবচাইতে বেশি আনন্দ হতে লাগল বলুকে সঙ্গে পেয়ে। বলুর মৃত্যুর এত দিন পরও আমি যখন একাকী থাকি, তখন ভাবি, কেন বলুর জন্য সেদিন আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম! সেদিন যেমন উত্তরটা আমার জানা ছিল না, আজও উত্তরটার হদিস তেমন করে আমার জানা হলো না। জানি না, আমার অন্তর সেই প্রশ্নের উত্তরটা একদিন আমাকে যথার্থভাবে জানাবে কি না! যদি জানায়ই বা তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার ক্ষমতা বা নির্লজ্জতা আমার মধ্যে নেই।

আমরা শিলাইদহে পৌঁছে কিন্তু গৃহে বসবাস শুরু করিনি। আশ্রয় নিয়েছিলাম পদ্মার ওপরে এক বিশাল বোটে। তীরের কাছাকাছি বোটটি রাখা হয়েছিল। হাত বাড়ালেই গাঁ; প্রকৃতি তার সর্বোত্তম সম্ভার দিয়ে পদ্মার তীরলগ্ন স্থানটিকে সাজিয়ে দিয়েছে। দূর গাঁয়ের গাছপালার রং সবুজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, যেন ঘোর কালো। প্রকৃতির অতলান্ত সবুজতার জন্যই বোধ হয় এরকম লাগছে। আর বোটের অপর দিকে থইথই জল। শীতকাল বলে নিস্তরঙ্গ। কিন্তু প্রবহমান। পদ্মা এখানে এত বিশাল যে অপর পাড়ের তীর দৃষ্টিগ্রাহ্যতা হারিয়েছে।

আমি তো তখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম, রবিবাবু যখন বলল, 'তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।'

আমি চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'কী সারপ্রাইজ?'

রবিবাবু স্বভাবসুলভ কৌতুক মেশানো কণ্ঠে বলেছিল, 'আজ থেকে তোমাদের ঘরছাড়া করলাম।'

'মানে?'

রবিবাবু বলল, 'মানে আজ থেকে তোমরা বাস্তুহারা হলে। স্থল হারিয়ে জলের মানুষ হলে।'

আমার চোখমুখ থেকে বিস্ময় কাটছে না দেখে রবিবাবু আবার বলল, 'আজ থেকে আমরা ওই বোটেই বসবাস শুরু করব। খুব মজা হবে না? কী বলো?'

'হ্যাঁ, খুব ব্যতিক্রমী বসবাস। কিন্তু ছেলেমেয়েরা! ওরা ভয় পাবে না?' আমি বললাম।

রবিবাবু উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'আরে না। ওরা আমার সন্তান না! আমি যেমন নদী, জল, প্রকৃতি—এসব ভালোবাসি, রথী আর বেলাও তেমনি করে ভালোবাসবে। দেখে নিয়ো, ওরা খুব আনন্দ পাবে।'

আমরা ওই বিশাল বোটেই ঠাঁই নিলাম। সত্যি রথী-বেলা ভয় পেল না। বরং বসবাসের ভিন্ন রকম জায়গা পেয়ে ওরা ভীষণ রকমের উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আমাদের বৈচিত্র্যময় জলজীবন শুরু হলো।

জমিদারি দেখাশোনা শেষে রবিবাবু যখন বোটে ফেরে, তখন খুব ক্লান্ত দেখায় তাকে। তবে সব সময় নয়। মাঝেমধ্যে খুব আনন্দ নিয়ে যখন বোটে ফেরে, তখন তার আনন্দভরা চোখমুখ আমার বেশ ভালো লাগে। কখনো কখনো ভীষণ ক্ষোভ নিয়ে সে বোটে ফেরে। বোটের আরামকেদারায় বসে আমাকে বলে, 'দেখেছ, দেখেছ বেলার মা, হিন্দুদের জাতপাতের নোংরামিটা এখনো গেল না!' রবিবাবুর চোখমুখ দিয়ে প্রবল ঘৃণা ঝরে পড়ে।

এ সম্পর্কে আমার আগামাথা জানা নেই। রবিবাবুর কথার কী উত্তর দেব, ঠিক করে উঠতে পারছি না। রবিবাবু আমার মনোভাব বুঝতে পারে। বলে, 'আজ কাছারিতে দু-চারজন ব্রাহ্মণ এসেছিল। জলযোগ করার পর বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ব্রাহ্মণ পাড়া ঘেঁষে দু-চার ঘর মুচি বাড়ি আছে। তাদের উচ্ছেদ করুণ, জমিদারবাবু। ওদের জন্য আমাদের কৌলীন্য নষ্ট হচ্ছে। কী অদ্ভুত প্রস্তাব, দেখেছ! যেন তারাই মানুষ, মুচিরা মানুষ না? আমিও উত্তেজিত কণ্ঠে দু-চার কথা শুনিয়ে দিয়েছি। বলেছি, এক পাড়ায় মুচিদের নিয়ে থাকতে পারলে থাকুন। নইলে...। এক বামুন বলে উঠল, নইলে? আমি কড়া গলায় বললাম, অন্য কোথাও চলে যান, যেখানে শুধু ব্রাহ্মণরা বাস করে। বেটারা তামুক না খেয়ে উঠে গেল!'

'তাহলে?' আমি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

'তাহলে আর কী? নিজেদের গাঁয়ে গিয়ে আমার দুর্নাম করা শুরু করবে ওরা। এর চেয়ে বেশি কিছু তো নয়!'

এরপর হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে রবিবাবু তার লেখার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। তখনই আমার মনটা বেদনায় ভরে উঠতে থাকে। গোটা দিন সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সংসারের ছোট-বড় নানা কাজে ব্যাপৃত থাকতে থাকতে দেহটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বিশ্রাম না নিয়ে পথ চেয়ে থাকি রবিবাবুর। তাকে আসতে দেখলে মনটা নেচে ওঠে। চকিতে আমার দেহের ক্লান্তি কেটে যায়, মন সতেজ হয়ে ওঠে। আমি সিঁড়ির গোড়ায় এগিয়ে যাই। হাত বাড়িয়ে দিই তার দিকে। আমার হাত ধরে বোটে উঠে আসে রবিবাবু। আমার মন নাচতে নাচতে তার পিছু নেয়। মুখে-হাতে জল দিয়ে বোটের ছাদে আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে গল্পে মাতে। থইথই আনন্দ আমাকে ঘিরে ধরে তখন। বিপুল সুখের ঘূর্ণাবর্তে আমি ঘুরপাক খেতে থাকি।

কিন্তু আমার এই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে রবিবাবু বলে ওঠে, 'যাই, লিখতে বসতে হবে। *ভারতী*র জন্য একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে। কালকে সূচনাটা লিখে রেখেছিলাম, দেখি আজকে শেষ করা যায় কি না।'

বলেই কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রবিবাবু। আমার মুখের দিকে তাকায় না। কক্ষের দিকে রওনা দেয়। আমার মুখের দিকে তাকালে রবিবাবু দেখতে পেত—গভীর বিষণ্ণতা আমাকে গিলে খাচ্ছে তখন। আমি বোটের ছাদে বসে থাকি। সন্ধে রাতের দিকে এগোয়। তারার আবছা আলো নদীজলে খেলা করে। তীরের গাছের ডালে ডালে কাকরা হঠাৎ ডেকে ওঠে, কা কা। এসব নিয়ে আমি একা বসে থাকি ছাদে, দীর্ঘক্ষণ।

সারা দিনের ক্লান্তি আর রবিবাবুর অবমূল্যায়ন আমাকে কুরে কুরে খেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। এই দূরদেশে আত্মীয়স্বজন-বঞ্চিত আমি পদ্মার বোটে জীবনযাপন করছি। যদি স্থলভূমিতে থাকতাম, তাহলে ঘর থেকে বেরিয়ে দূরে কাছে ঘুরতে পারতাম, নানা মানুষজনের সঙ্গে দেখা হতো, আলাপ হতো। কিন্তু এই পদ্মার বোটে সেই সুযোগ নেই। তীরে যেতে হলে সিঁড়ি বেয়ে নানা কায়দা-কসরত করে ছোট নৌকায় উঠতে হয়। তারপর সরু তক্তা বেয়ে কূলে নামা। শরীরটা এখন আমার একটু মোটা হওয়ার দিকে। ভারী শরীর নিয়ে নৌকায় নামা, তক্তা পেরিয়ে কূলে ওঠা আমার পক্ষে সত্যি দুষ্কর। তাই আমি সহজে তীরে উঠি না। এই বোটে ওপর-নিচ করে সময় কাটাই; বসে থাকি রবিবাবুর জন্য। কিন্তু সেই রবিবাবু আমাকে দেখে না, দেখে নিজের স্বার্থ। স্ত্রী-সান্নিধ্য তার কাছে তেমন আকাঙ্ক্ষিত নয়, যতটা ঈপ্সিত লেখাজোখা। তাই বলে আমি রবিবাবুর লেখালেখির বিপক্ষে নই। সে লেখার জন্য সময় তো ব্যয় করবেই, কিন্তু আমাকে কিছুটা সময় দেওয়া কি তার উচিত নয়? পরবাসে স্ত্রীকে সময় দেওয়া স্বামীর তো কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু রবিবাবু সেই কর্তব্যকে আমলে আনত না। আমার সঙ্গে দু-চার দণ্ড অবস্থান না করেই লেখার ঘরে চলে যেত সে। শুধু চলে যেত নয়, ঘরের দরজা বন্ধ করে দিত, যাতে আমি বা সন্তানরা ও-ঘরে ঢুকতে না পারি। আমরা ঢুকলে যে তার লেখার ব্যাঘাত হবে!

আমার কী করা উচিত তখন? আমারও তো সঙ্গ চাই, কথা বলার সঙ্গী চাই। ছেলেমেয়ে বা সহচরীর সঙ্গে কতক্ষণ আর কথা বলা যায়? কোন বিষয়টা নিয়েই বা কথা বলা যায়? কেজো কথা ছাড়া তাদের সঙ্গে আর কী কথা থাকতে পারে আমার? রথী-বেলাও পিতার সঙ্গে কথা বলার জন্য হাঁসফাঁস করে। কিন্তু করলে কী হবে? রবিবাবু তো তখন বহির্জগদ্‌বিচ্ছিন্ন। স্ত্রীসঙ্গ তার কাছে তখন তেতো, তার কাছে তখন সন্তানবাৎসল্যের চেয়ে লেখাবাৎসল্য শ্রেয়তর।

বলুকে আমি কথা বলার সঙ্গী হিসেবে বেছে নিই। প্রবল আগ্রহে সে আমার আহ্বানে সাড়া দেয়। আমি তার সঙ্গে আলাপচারিতায় মশগুল হয়ে পড়ি। সমবয়সী বিদ্যানুরাগী বলু আমার মর্মবেদনা বোঝে। কাকার সান্নিধ্যবঞ্চিত কাকিমার সঙ্গ দরকার, সঙ্গী দরকার, বলু তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে সহজে।

ছোটবেলায় আমার ছেলেমেয়েরা পিতার সান্নিধ্য তেমন করে পায়নি। তাদের পিতার স্নেহ-কার্পণ্যের কারণে ওই জায়গাটি দখল করে নিয়েছিল বলু। রবিবাবু থাকত লেখাপড়া নিয়ে, আমি থাকতাম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসার নিয়ে। নানাজন নানা সমস্যা নিয়ে আমার কাছে ছুটে আসত। সবার দুঃখ-কষ্টের কথা আমাকে শুনতে হতো। ভেতরবাড়ির সকলে আমাকে ভালোবাসায় জড়িয়েছিল। এই জটিলতার মধ্যে বলু ছিল আমার স্বস্তির জায়গা, তৃপ্তিরও।

আমি কখনো স্কুলে যাইনি। আমার যা শিক্ষা, তা পেয়েছিলাম রবিবাবুর কাছ থেকে। কিন্তু আমার দীক্ষাগুরু ছিল বলেন্দ্রনাথ। সংস্কৃত, বাংলা আর ইংরেজিতে ভালো যে বইটি সে পড়ত, আমাকে তা পড়ে না শোনানো পর্যন্ত তার তৃপ্তি হতো না। তার কাছে শুনে শুনে এই তিন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে আমার ভালো করে পরিচয় ঘটে। এ ছাড়া আমার সন্তানদের দেখভালের সকল দায়দায়িত্ব যেন বলুর। তারা বলুদা-অন্তঃপ্রাণ। সর্বদা তার পেছন পেছন ঘুরঘুর করত তারা। আমি তাদের মাথা আঁচড়ে দিলে, প্রসাধন করানোর দায়িত্ব নিত বলু।

শুনেছি, এই বলু যখন জন্মায়, তখন তার মা মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত ছিল। তখন তার মনে নানা রকম অশান্তি। অশান্তির মধ্যে জন্মেছিল বলে বলুর স্বাস্থ্য তেমন ভালো ছিল না। পা দুটোও একটু বাঁকামতন ছিল। পা ঘষে ঘষে হাঁটত বলু। মাথায় একটু উঁচু হলে বাপের বিষয়টি সে বুঝে ফেলে। এসব ক্ষেত্রে সন্তানের মনটি জড়তায় ভরে যায়। কিন্তু বলু অন্য দশজন ছেলের তুলনায় আলাদা ছিল। বাপের এরকম অবস্থা হওয়াতে ছোটবেলা থেকেই বড় হবার প্রবল বাসনা তার মধ্যে কাজ করত। সে আমাকে বলত, 'কাকিমা, আমাকে অনেক বড় হতে হবে। বাবা পাগল বলে সবাই তাকে অবহেলার চোখে দেখে। কেউ তাকে ভালোবাসে না। এমনকি দাদাঠাকুরও বাবাকে প্রীতির চোখে দেখেন না।'

'এটা তুমি কী বলছ, বলু? শ্বশুরঠাকুর কেন তোমার বাবাকে প্রীতির চোখে দেখবেন না? নিজের সন্তানকে কি কেউ ঘৃণার চোখে দেখে?' আমি বলেছিলাম।

বলু বলেছিল, 'আমার কেন জানি এরকমই মনে হচ্ছে। হয়তো এটা আমার ভুল ধারণা।'

বলুর ধারণা ভুল ছিল না। তার ধারণাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়েছিল। বলুর মৃত্যুর পর শ্বশুরঠাকুর সত্যি তার মা-বাবা-স্ত্রীকে ঠকিয়েছিলেন। সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। পূর্বে নির্ধারিত মাত্র এক শ টাকা মাসোহারা অব্যাহত থেকেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্মার চরের কথা বলি। একদিন পদ্মার চরে একটি ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনায় রবিবাবু ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সেই ক্ষোভের কথা আমি জানতে পেরেছিলাম ইন্দিরাকে লেখা রবিবাবুর চিঠি থেকে। ঘটনার দিন রাতে আমি রবিবাবুর টেবিলে ওই চিঠিটা পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। চর থেকে ফিরে সামান্য আহার গ্রহণ করে রবিবাবু শুয়ে পড়েছিল। আমি ঘরকন্নার কাজ চুকিয়ে শুতে আসতে আসতে একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল। বাতি নেভাতে যাব, ওই সময় চিঠিটার ওপর আমার চোখ পড়েছিল। খামে ঢোকানো নয় চিঠিটা। খোলা অবস্থায় টেবিলে পড়ে ছিল। কৌতূহলী হয়ে আমি ওটা পড়ে ফেলেছিলাম। পড়ে আমার মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ কী লিখেছে রবিবাবু! ঘটনাটা এরকমের—

এক বিকেলে রবিবাবুর আকাঙ্ক্ষা জাগল পদ্মার চর ঘোরার। বোটে করে আমরা সেই চরে পৌঁছেছিলাম। বিস্তীর্ণ বিস্তৃতির মধ্যে ছাড়া পেয়ে আমরা আত্মহারা। চরের বিশালতা আমাদের পেয়ে বসল। যে যেদিকে পারে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। সন্ধের ছায়া নামতে শুরু করেছে তখন চরে। বৃহৎ চরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে অনুচরসমেত ছোটা যায় একদিকে, রবিবাবু অন্যদিকে। সহচরীকে নিয়ে আমি যাই অন্যদিকে। বলু যায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। একসময় সন্ধের অন্ধকারে বালুকারাশির সমুদ্রে বলেন্দ্র, সহচরী আর আমি হারিয়ে গেলাম। গাঢ় অন্ধকার নেমে এল। আমরা দিশে হারিয়ে ফেললাম। উদ্বেগাকুল হয়ে উঠল রবিবাবু। খোঁজাখুঁজির পর আমাদের পাওয়া গেল বটে, তাতে রবিবাবুর ক্ষোভ কমল না। সে সময় কিছু বলেনি সে আমাকে। কিন্তু বোটে ফিরে সে মনের সকল ক্ষুব্ধতা ঝেড়ে দিয়েছে এই চিঠিতে। সে লিখেছে, 'মনে হতে লাগল—আত্মরক্ষায় অসমর্থ যারা, নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলুম—বেশ বুঝতে পারলুম, বলু বেচারা ভালো মানুষ, দুই বন্ধনমুক্ত রমণীর পাল্লায় পড়ে বিপদে পড়েছে।'

চিঠির এই অংশটিতে রবিবাবুর পক্ষপাতিত্ব, আমার প্রতি তার কঠোর মনোভাবের কথা স্পষ্ট। হারিয়ে গেছে দুটি নারী আর একটা পুরুষ। তিনজনেই বিপদে পড়েছি। কিন্তু রবিবাবুর কাছে মনে হলো বিপদটা শুধু একা বলুর, নারী দুটোর নয়। তাই যত উপহাস আর ধিক্কার আমার আর সহচরীর ওপর বর্ষণ করল রবিবাবু। শুধু তা-ই নয়, যে রবিবাবু নারী-স্বাধীনতার পক্ষে উচ্চকণ্ঠ, সেই রবিবাবুই লিখেছে, 'স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলুম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে দীর্ঘদিন পর গ্রামীণ পরিবেশ, নদী, জল আর বিস্তীর্ণ চরের সংস্পর্শে এসে আমার ঘোর লেগে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, উড়ে উড়ে বেড়াই গোটা চরে; যদি দুটো পাখা থাকত আমার, হয়তো তা-ই করতাম আমি। বিপুল একটা আবেশ আমাকে ঘিরে ধরেছিল। আমি বলু আর সহচরীকে প্ররোচিত করেছিলাম হারিয়ে যেতে। হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। সময়জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তখন আমার। বলু দু-একবার সাবধান করে দিতে চেয়েছে, 'চলো কাকিমা, আঁধার লেগে আসছে। কাকাবাবু উদ্বিগ্ন হবে। ফিরে যাই, চলো।'

আমি চঞ্চল কণ্ঠে বলেছি, 'আর একটু বলু, আর সামান্য। চর যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানটায় গিয়েই ফিরে আসব।'

কিন্তু আমরা ফেরার আগেই ঝুপ করে আঁধার নেমে এল চরজুড়ে। আর আমরা হারিয়ে গেলাম।

রবিবাবু আমার বাসনার মূল্য দিল না। এমনভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যে, নারী-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কথা ব্যক্ত করতে মোটেই দ্বিধা করল না।

জীবনের বহু পথ হেঁটে হেঁটে আমি এই প্রত্যয়ে পৌঁছেছিলাম যে বলু আমার একজন সুহৃদ। সে আমাকে শুধু চোখ দিয়ে দেখেনি, হৃদয় দিয়েও দেখবার চেষ্টা করেছে। সে আমার সুখ-দুঃখের অংশীদার ছিল। বলু কখনো আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। আমার সন্তানদের সে আপন ভাইয়ের মতো স্নেহ-ভালোবাসায় আবৃত করে রেখেছিল, আমৃত্যু। রবিবাবুকে নিজের পিতার জায়গায় বসিয়েছিল। সর্বাধিক আনুকূল্যও পেয়েছিল এই কনিষ্ঠ কাকাটির। বালক-বয়স থেকেই বলুর সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হতে শুরু করেছিল। রবিবাবু বুঝতে পেরেছিল—এই বালক একদিন তার গুণপনার পরিচয় দিতে সক্ষম হবে। সত্যি সত্যিই বলু তার সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল একদিন।

'ঋতুসংহার' প্রবন্ধে বলুর সাহিত্যিক প্রতিভা সর্বাধিক স্ফুরিত হয়েছিল। *সাধনা* পত্রিকার অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিল সে। এই পত্রিকার সম্পাদক ও কার্যাধ্যক্ষ হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথের নাম থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কাজ করত রবিবাবু আর বলু। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সাহিত্যক্ষেত্রে বলু যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিলেও বৈষয়িক ব্যাপারে সে ছিল আনাড়ি। সুরেন্দ্রনাথ ও সে মিলে একটা সময়ে 'টেগর অ্যান্ড কো'-এর পত্তন করে। এই কোম্পানির প্রাথমিক কাজ ছিল পাট কেনাবেচা। ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একদিন রবিবাবুও এই কোম্পানির সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু পরিচালকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনভিজ্ঞতা আর কর্মচারীদের অসাধুতার কারণে একদিন এই কোম্পানির ভরাডুবি হয়। বহু টাকার লগ্নি ছিল রবিবাবুর, এই ব্যবসায়। বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয় তাকে। তার পরও রবিবাবু বলুর ওপর থেকে স্নেহের ছায়া সরিয়ে নেয়নি। ব্যবসার কাজে কঠোর পরিশ্রম শুরু করল বলু। সময়মতো স্নানাহারও ভুলে গেল। একসময় বলু যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলো। এরকম অবস্থায়ও সে আমাকে সাহচর্য দিয়ে গেছে। ভেতরে রোগের যন্ত্রণাকে দাবিয়ে রেখে হাসিমুখে কথা বলেছে।

তখন মীরা আমার পেটে। সন্তানধারণের যে অস্বস্তি আর অসুস্থতা, তখন তা আমাকে ভালোভাবে পেয়ে বসেছে। কোনো কিছুই ভালো লাগে না আমার। বিপুল উদাসীনতা আমাকে ঘিরে ধরেছে। রবিবাবু তখন উড়িষ্যায় গেছে, জমিদারি পরিদর্শনের কাজে। একদিন গভীর বিষণ্নতা নিয়ে বসে আছি। কাতর শরীর নিয়ে পা ঘষে ঘষে বলু আমার ঘরে এল। আস্তে করে আমার সামনে বসে স্থির চোখে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। তারপর হঠাৎ করে বলল, 'কাকি, যদি আমার ভুল না হয়, তাহলে বলি, তোমার মধ্যে কী যেন একটা অপূর্ণ বাসনা রয়ে গেছে। ঠিক বলছি না? আচ্ছা বলো, সে বাসনাটা কী?'

আমি চকিতে তার মুখের দিকে তাকালাম। ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিলাম। মুখে কিছু বললাম না। বলু আবার জিজ্ঞেস করল, 'বলো না, কাকিমা।'

এবার আমি বললাম, 'শুনে কী করবে তুমি? এই বাসনা পূরণের নয়। তুমি কখনো আমার এই বাসনা পূরণ করতে পারবে না।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'রবিবাবু যেখানে ব্যর্থ হয়েছে!'

বলু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে সংহত করে বলল, 'পূরণ করতে না পারি, শুনতে তো পারব?'

'শুনে কী করবে তুমি?'

'হয়তো কিছুই করতে পারব না। হয়তো কিছু করতে পারব। তোমার মধ্যে বাসনা অপূরণের যে কষ্ট, আমাকে বললে তার কিছুটা হয়তো লাঘব হবে। তা ছাড়া তোমার অপূর্ণ বাসনার কথা শোনার অধিকার তো আমার আছে। কী বলো?'

আমি বললাম, 'শোনার অধিকার অবশ্যই তোমার আছে।'

'তাহলে বলো।' বলুর কণ্ঠে অধিকারের সুর।

'আমার খুব ফুলতলি যেতে ইচ্ছে করে রে, বলু। যেখানে আমি জন্মেছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে গ্রামটা একবার ঘুরে দেখতে খুব ইচ্ছে করে আমার। আমার সামনে সামনে রবিবাবু হাঁটবে। তার পেছন পেছন আমি। আর আমাকে ঘিরে আমার সন্তানরা। রথী-বেলা কলকল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করবে—এটা কী, মা? এটা কোন গাছ? ওই যে উড়ে যাচ্ছে ওই পাখিটার নাম বলো-না, মা। আমি তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে এগোব। গাঁয়ের মানুষজন রবিবাবুকে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেবে। আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কেমন আছ, ভব? আমি টুপ করে প্রণাম করে বলব, ভালো আছি, জেঠা। আপনি কেমন আছেন? হাসিমুখে এগিয়ে যাবেন ওরা। আর আমি, আমি...।' বলে থেমে গিয়েছিলাম।

বলু জিজ্ঞেস করেছিল, 'তারপর, তারপর কী, কাকিমা?'

আমি বোকা বোকা চেহারা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বলেছিলাম, 'পাগলপনায় পেয়ে বসেছে আমাকে। হঠাৎ করে শৈশবের কথা মনে পড়ল তো, তাই...।'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলু বলল, 'তোমার এই বাসনার কথা রবিকাকাকে বলোনি কোনো দিন?'

'বলেছিলাম। তার সময় কোথায়? জমিদারি, লেখালেখি! তার পরও আশ্বাস দিয়েছিল আমাকে, একদিন শোরের ফুলতলিতে নিয়ে যাবে।' তারপর একটু থেমে বলেছিলাম, 'এ জীবনে তার সময় হয়ে উঠবে না। আমিও কোনো দিন আমার জন্মভিটেটা ছুঁতে পারব না।' একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস আমার বুক চিরে বেরিয়ে এসেছিল।

বলু বলেছিল, 'কী যে বলো না, কাকিমা! এটা কি খুব একটা কঠিন কাজ? কাকার সময় না থাকুক, আমার তো আছে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব ফুলতলিতে। তোমার আকাঙ্ক্ষা কাকা না পূরাক, আমি পূরাব।' আমার দিকে মমতাভরা চোখে তাকিয়ে বলু আবার বলেছিল, 'তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো, কাকিমা। রবি কাকাকে আমি রাজি করাব। তোমাদের ফুলতলি নিয়ে যাবেই যাবে রবিকাকা একদিন। তখন কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিতে ভুলো না।' বলেই সে খুকখুক করে কাশতে লাগল।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলাম, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তা হবেখন। তোমার এখন বিশ্রামের দরকার। তুমি ঘরে যাও। বিশ্রাম নাও।'

বলু ম্লান হেসে বলেছিল, 'আমাকে তোমার পাশে একটুক্ষণ বসতে দাও, কাকিমা। এখানে আমার খুব ভালো লাগছে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বসো তুমি।' আমি স্নেহার্দ্র গলায় বলেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলু আমার পাশে চুপচাপ বসে থেকেছিল অনেকক্ষণ। তারপর অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বলেছিল, 'আমারও একটা আকাঙ্ক্ষা আছে, কাকিমা।'

'কী, কী সেটা?' আমি ব্যগ্রভাবে জানতে চেয়েছি।

বলু বলেছিল, 'শান্তিনিকেতনে একটা ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন করা। দাদামশাই আমার প্রস্তাব শুনে খুব খুশি হয়েছেন। তাঁরও বয়স হয়ে গেছে। রবিকাকার ওপরই সব নির্ভর করছে। যদি রবিকাকা শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম বিদ্যালয়টি চালু করে, তাহলে আমার চেয়ে বেশি আনন্দ আর কেউ পাবে না।'

আমি আবেগভরা গলায় বলে উঠেছিলাম, 'তোমার বাসনা পূরণ হবে। তোমার কাকাকে অনুরোধ করে আমি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করব।'

বলুর বাসনা পূরণ হয়েছিল একদিন। রবিবাবু শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি।

কোম্পানি-সম্পর্কিত দুশ্চিন্তা আর কঠোর পরিশ্রমের ফলে শরীর দ্রুত ভাঙতে শুরু করেছিল বলুর। এই সময় তার দেহে যক্ষ্মার প্রকোপ তীব্র হয়ে উঠেছিল। অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিন আর রাত কাটতে লাগল তার। আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা নিয়ে ভাবনার মানসিক অবস্থা তখন হারিয়ে ফেলেছে বলু।

আমি তখন ছেলেমেয়ে নিয়ে শিলাইদহে, রবিবাবু কলকাতায়। বলুর অসুস্থতার কথা রবিবাবু ও অন্যান্যের চিঠিপত্রেই যা পাই। জানতে পারি, ঠাকুরবাড়ির অদ্ভুত প্রথানুযায়ী অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি আর কবিরাজি—এই ত্রিধারায় চিকিৎসা চলছে বলুর। শহরের বড় বড় ডাক্তাররা তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। বলুর দেহের উন্নতির তেমন লক্ষণ নেই। প্রবল যন্ত্রণায় সে দিন দিন কুঁকড়ে যাচ্ছে। তার শরীর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। কাশতে কাশতে সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ছে। রক্তবমি হচ্ছে। শিলাইদহে আমি ছটফট করছি। বলুকে দেখার জন্য আমার ভেতরটা আকুলিবিকুলি করছে। আমি ঘন ঘন রবিবাবুকে চিঠি লিখছি—আমাকে নিয়ে যাও তুমি। আমাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। বলুকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে এখন। এই সময় তার পাশে থাকা উচিত আমার। লিখি আর কাঁদি। ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করা ভুলে গেছি। নাওয়াখাওয়া বন্ধ করে দিয়ে অবিরাম কেঁদে যাচ্ছি। ঈশ্বরের কাছে জোড়হাত তুলে বলছি, হে ঈশ্বর, তুমি আমার বলুকে ভালো করে দাও। আমার আয়ু দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখো, প্রভু। বলু মায়ের একমাত্র সন্তান, ঈশ্বর। প্রফুল্ল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বউদির বলেন্দ্র ছাড়া আর কেউ নেই, প্রভু। পাগলস্বামী তার। সাহানা বিধবা হলে এক গভীর বেদনা নেমে আসে বলেন্দ্র-পরিবারে। তুমি এই পরিবারটিকে ধ্বংস কোরো না, প্রভু। আমার বলুকে ভালো করে তোলো।

মাধুরীলতা চিঠি লেখে তার বাবাকে—বাবা, চিঠি দিয়ে বলু দাদার ভালো হয়ে ওঠার সংবাদটি জানাও। মা গত তিন-চার দিন কেঁদেকেটে অস্থির। খাওয়া-ঘুম ছেড়ে দিয়েছে মা।

রবিবাবু চিঠি দেয় মেয়েকে। লেখে—তোমার মাকে উদ্বিগ্ন হতে বারণ করো। বলুর অবস্থা তেমন খারাপের দিকে না। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে সে। এই চিঠি মাধুরীলতার হাতে পৌঁছানোর দুদিন আগেই বলু পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে চলে যায়। উনত্রিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই সে চলে যায়।

আমার জীবনের অপূরণীয় ক্ষতিটি হয়ে যায়। এখন আমি কাকে বোঝাব আমার নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের কথা! কে আমার পুত্রকন্যাদের পরম মমতায় কাছে টেনে নেবে! কে এখন থেকে আমাকে সঙ্গ দেবে! কার সান্নিধ্যে আমার ভেতরের যত অতৃপ্তি আর হাহাকার ভুলব! আমার সব শেষ। পৃথিবীর সকল কিছু আমার কাছে নিতান্ত নগণ্য বলে ঠেকছে। যে আমার জীবনে পরম গ্রহণীয় ছিল, ঈশ্বর তাকে কেড়ে নিল আমার কাছ থেকে! এই আকস্মিক আঘাত সইবার শক্তি আমাকে দাও, প্রভু। বলুর মায়ের পুত্রশোক কমিয়ে দাও। ঈশ্বর, সাহানার মনের জোর বাড়িয়ে দাও।

আমি আকুল হয়ে চিঠি লিখি রবিবাবুকে—আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও কলকাতায়। বলুর মৃতমুখ দেখলাম না, তার চিতাটা যাতে আমি দেখতে পাই। কবির কোনো জবাব আসে না। আমি পথ চেয়ে থাকি রবিবাবুর আগমনের আশায়। আসা তো দূরের কথা, আমার চিঠির কোনো জবাব পর্যন্ত দিল না রবিবাবু। অসীম হাহাকারের মধ্যে আমি ডুবে থাকলাম। এক দিন যায়, দুদিন যায়। এইভাবে দশ-দশটা দিন পেরিয়ে গেল। বলুর শ্রাদ্ধ চুকে গেল। রবিবাবু আমাদের কাছে এসে পৌঁছাল শ্রাদ্ধের আরও দুই সপ্তাহ পরে। শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা আর রবিবাবুর শিলাইদহে আসার মাঝামাঝি সময়ে তার একটা চিঠি আমার হাতে পৌঁছায়। তাতে 'গীতা'র উল্লেখ করে সে আমাকে বিষাদ আর ক্রোধ থেকে মুক্ত থাকতে উপদেশ দিয়েছে। রবিবাবুর উপদেশ শুনে আমার কী লাভ? যার জন্য আমার প্রাণের ভেতরে আলাদা একটা জায়গা নির্দিষ্ট আছে, মৃত্যুর সময় তার কাছে থাকতে পারলাম না, এর চেয়ে বড় কষ্টের ব্যাপার আর কী হতে পারে? রবিবাবুর উপদেশ আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তর্বেদনাকে প্রশমিত করতে পারল না। এক বিপুল ক্ষোভ আমার মধ্যে ঘূর্ণিত হতে থাকল। রবিবাবু বলুর মৃত্যুর আগে আমাকে নিয়ে গেল না, মৃত্যুর পর পর তো আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত! আচ্ছা, না নিয়ে যাক, শ্রাদ্ধ চুকিয়ে সে তো তাড়াতাড়ি শিলাইদহে চলে আসতে পারত! কিন্তু এর কোনোটাই করেনি রবিবাবু। সে যদি শিগগির আমার কাছে চলে আসত, তাহলে আমার ভেতরের তীব্র বেদনা স্বামীসান্নিধ্যে কমে আসত। সান্ত্বনা দেওয়ার লোককে কাছে পেতাম আমি। স্বামীর প্রত্যক্ষ সান্ত্বনায় আমার শোকবিহ্বলতা অনেকটাই কমে আসত। রবিবাবু তাড়াতাড়ি না ফিরে আমাকে বঞ্চিত করেছে।

এ বঞ্চনা কি রবিবাবুর ইচ্ছাকৃত? ইচ্ছে করেই কি সে আমাকে বলেন্দ্রের অন্তিম সান্নিধ্য পেতে দেয়নি? যদি তা-ই হয়, তাহলে কেন? রবিবাবু কি বলু আর আমার সম্পর্ককে ঈর্ষার চোখে দেখত? অথবা অন্য চোখে? বলুর মৃত্যুর দুবছর পর পর্যন্ত আমি এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করে গেছি। কিন্তু রবিবাবুর মনের হদিস পাইনি। একদিন উত্তর এসে আমার কাছে ধরা দিল।

বলুর মৃত্যুর দুবছর পর রবিবাবু একটা গল্প লিখল *ভারতী* পত্রিকায়। গল্পটির নাম 'নষ্টনীড়'। ভূপতি নামের একজনকে নিয়ে গল্পটির শুরু। ভূপতি একটা ইংরেজি দৈনিকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। পত্রিকাটির জন্য সে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। সংসারের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই তার। বালিকাবধূ চারুলতা দিনের পর দিন তার সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করে। জীবনের বসন্তগুলো উদাস-নিঃসঙ্গতায় কাটতে থাকে চারুলতার। স্বামীর অবহেলার অবসরে চারুলতার জীবনে আসে অমল। অমল ভূপতির পিসতুতো ভাই। দুজনের মধ্যে ভালোবাসাবাসি গভীর থেকে গভীরতর হয়। ভূপতি-চারুলতার দাম্পত্য জীবনের ট্রাজেডিই 'নষ্টনীড়' গল্পের মূল বিষয়। গল্পের সম্পাদক তো রবিবাবু স্বয়ং। কিন্তু গল্পের অমল কে? কার ছায়া অবলম্বনে চারুলতা চরিত্রটি তৈরি করেছে রবিবাবু? গল্পে দেবর-বউঠানের যে কাহিনি, তা রবিবাবু-কাদম্বরীর পুরাতন সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। গল্পটি প্রথমবার পড়ে আমার তা-ই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অন্য। গল্পের সম্পাদক ভূপতি যে স্বয়ং রবিবাবু, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বামীসঙ্গ বঞ্চিত চারু যে আমি, তা এই গল্পে স্পষ্ট। আর অমল চরিত্রটি রবীন্দ্র আর বলেন্দ্রর মিশেলে তৈরি। আমার আর বলুর সহজতর সম্পর্কটিকে কুটিল উপায়ে দেবর-বউঠানের সম্পর্কে রূপান্তরিত করেছে রবিবাবু। আরেকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। 'নষ্টনীড়'-এর অমল ভূপতি-চারুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিদেশে চলে যায়। আর বাস্তবের বলু আমার আর রবিবাবুর কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে পরপারে চলে যায়। গল্পের চরিত্র, পরিণতি, কাহিনি কিসের ইঙ্গিত করে? আমার সম্পর্কে রবিবাবুর মনের কোন চিত্রটি তুলে ধরে গল্পটি?

বারো

এক রাতে রবিবাবু আমাকে বলে, 'বেলার বিয়ে দিতে চাই।'

আমি চমকে তার দিকে ফিরে তাকাই। রাতের খাবার শেষ করে শুতে এসেছি দুজনে, নিজেদের কক্ষে। রবিবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে। আমি বিছানা ঝেড়েঝুড়ে শোয়ার ব্যবস্থা করছি। ওই সময় রবিবাবু কথাটি বলল। অপ্রস্তুত আমি তড়িতাহতের মতো রবিবাবুর দিকে ফিরলাম। অস্থির চোখে তার দিকে তাকিয়েই থাকলাম। আমার অস্থিরতা দেখে সে নরম কণ্ঠে বলে, 'তুমি আমার কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারোনি?'

আমি অত্যন্ত শীতল গলায় বলি, 'বুঝতে পেরেছি।'

'তাহলে কিছু বলছ না যে?'

'কী বলব?'

'ওই যে বেলা, মানে মাধুরীর বিয়ে দিতে চাই। তোমার মত ছাড়া তো বিয়ে হবে না! তাই তোমার মতামত চাইলাম।'

'মতামত শব্দটির মধ্যে মতও আছে, অমতও আছে। সত্যি করে বলি, মাধুরীর এই মুহূর্তে বিয়েতে আমার অমত আছে। সম্মতি নেই এত ছোট মেয়ের বিয়েতে।' মর্মযাতনার ছোঁয়া আমার কণ্ঠে।

রবিবাবু হালকা চালে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'আমার বিয়ে হয়েছে অল্প বয়সে। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার যাতনা আমি বুঝি।'

'বেলার বয়স অল্প নয়, চৌদ্দ। ঠিক চৌদ্দ নয়, চৌদ্দ পুরতে কিছু দিন বাকি আছে।' রবিবাবু বলল।

'চৌদ্দ কি খুব বেশি বয়স? কিশোরী একটা মেয়ে! সংসার-স্বামী-শাশুড়ি-শ্বশুর—এসব সম্পর্কে সে কীই-বা বোঝে?' আমার কণ্ঠে উষ্ণতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিবাবু বলল, 'ছোট বউ, ভুলে যেয়ো না, আমাদের বিয়ের সময় তোমার বয়স আরও কম ছিল। নয় বছর নয় মাস। বেলার বয়স চৌদ্দ পুরাতে চলল।'

'ওই বয়সে আমাকে বিয়ে দেওয়া আমার মা-বাবার ভুল ছিল। খেলার বয়সী মেয়েকে ধরে এনে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছিল তারা। দৈহিক কষ্ট ছাড়া প্রথম প্রথম কিছুই বুঝিনি।' বললাম আমি।

'সমাজের প্রথাই এই। কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিতে হয়।'

'ভাবনায় যারা পিছিয়ে, তাদের সমাজভীতি বেশি। তুমি তো আধুনিক মানুষ। বিদেশ ঘুরেছ অনেকবার। তোমার তো আদ্যিকালের সামাজিক নিয়মপ্রথা মানা উচিত নয়। বিশেষ করে যে প্রথা নারীর জীবনে অমঙ্গল ডেকে আনে!'

আমার কথা শুনে রবিবাবু চুপ মেরে গেল। নিজের ভেতরে চোখ রেখে কী যেন গভীরভাবে ভাবল। তারপর মাথা তুলে ধীরে ধীরে বলল, 'দেখো, আমার বন্ধুদের কন্যাদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এই সেদিন শ্রীশচন্দ্র জানাল, তার কন্যা মৈনুর বিয়ে হয়ে গেছে। মৈনু বেলার সমবয়সী। ভাবলাম, মৈনুর যদি বিয়ে হয়ে যেতে পারে, তবে বেলার নয় কেন? তাই ভাবলাম, বেলার বিয়েটা দিয়ে দিই।'

'ও, তুমি অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বেলার বিয়ে দিতে চাইছ? নিজের বিবেচনায় নয়?' বললাম আমি।

রবিবাবু দ্বিধান্বিত গলায় বলল, 'ঠিক প্রভাবিত হয়ে নয়, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাকেও কাজে লাগিয়েছি।'

আমি তেজি গলায় বললাম, 'সে কী রকম?'

'ছেলেটি ভালো। বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে। আমার স্বপ্নপুরুষ বিহারীলাল। তাঁর পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে যুক্ত হতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। তুমি অমত কোরো না, ছোট বউ। দেখে নিয়ো, বেলা শরতের ঘরে সুখে থাকবে।'

'শরৎ? শরৎ কে?', বিছানা গোছানো থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

রবিবাবু উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র। পাত্র হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান। বয়স এই বছর ত্রিশে পড়ল।'

'ছেলে কী করে?'

আমার প্রশ্নের ধরন দেখে রবিবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠল। হড়বড় করে বলতে থাকল, 'শরৎকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র। মজঃফরপুর আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এবার শীতল কণ্ঠে বললাম, 'সব তো বললে। একটি কথা তো বললে না! ওটা আবার লুকিয়ে লাভ কী?'

রবিবাবু বিস্মিত চোখে বলল, 'একটি কথা! কোন কথাটি লুকালাম তোমার কাছ থেকে?'

'শরৎকুমার বিহারীলাল চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র। মা কাদম্বরী চক্রবর্তীর কথামতো শরৎকুমার ওঠবস করে। কাদম্বরী দেবী জটিল প্রকৃতির। ছেলেকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান।' আমি বললাম।

'এসব কী বলছ তুমি? এসব মিথ্যে তথ্য তুমি পেলে কোথায়? শরৎ বিহারীলালের দ্বিতীয় ঘরের ছেলে—এটা ঠিক আছে। কিন্তু পরের কথাগুলো ঠিক নয়।' রবিবাবু বলল।

আমি বললাম, 'প্রথমের কথা যেমন সত্য; শেষের কথাগুলোও সত্য।'

রবিবাবু যে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে, সে আমি আগেই টের পেয়েছিলাম। বৈঠকখানায় দু-চারজন বন্ধুর কাছে সে তার মনোভাব ব্যক্তও করেছিল। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে তার আলাপচারিতার কথা এক দাসী এসে আমাকে বলেছিল। তার কাছ থেকেই শুনতে পেয়েছিলাম বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে শরৎকুমারের নাম। ওই সময় থেকেই আমি বিহারীলাল-পরিবারের খোঁজখবর নিতে শুরু করি। জানতে পারি এসব কথা। আরও জানি, কাদম্বরী দেবী অত্যন্ত কুটচালের মহিলা। লোভী। বিয়ের বাজারে কাদম্বরী তার ছেলেকে হিরের টুকরো মনে করেন। লোভী পরিবারের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক হলে তা সুখের হবে না। এই বিশ্বাস আমার মধ্যে জন্মে গিয়েছিল তখন থেকেই।

এবার ম্লান গলায় রবিবাবু বলল, 'যদি তোমার কথা সত্যও হয়, তার পরও এ বিয়ে হওয়া উচিত। মা আর কত দিন বাঁচবে? মাধুরীর সংস্পর্শে শরতের মাতৃঘোর কেটে যাবে।'

'আমি কখনো তা মনে করি না। লোভী মায়ের রক্তের ধারা শরতের মধ্যে বইছে। সে কী করে অস্বীকার করবে তার মায়ের রক্তের দাবিকে!'

'করবে, করবে। শিক্ষিত ছেলে, আমার বেলাকে সুখে রাখবে।' রবিবাবু তার সিদ্ধান্তে অটল।

বুঝলাম, রবিবাবুকে তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়ানো যাবে না। আমি আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে গেলাম, 'ছোট মেয়ে আমার, ওরকম পরিবারে বিয়ে দিলে বিড়ম্বনায় পড়বে। ওই বিড়ম্বনার আঁচ থেকে তুমিও রেহাই পাবে না, আমিও না।' তারপর শান্তকণ্ঠে বললাম, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার সিদ্ধান্তে অটল। তোমাকে একটা অনুরোধ করি, ওই পরিবারকে বলো, বছর দুয়েক অপেক্ষা করতে। মাধুরী আর একটু পাকাপোক্ত হয়ে উঠুক। তখন না হয় বিয়ে দিয়ো।'

রবিবাবু এবার রাগত কণ্ঠে বলল, 'সেই প্রথম থেকে বেলার বয়স কম বয়স কম বলে যাচ্ছ, এই পরিবারে কি কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়নি?'

'হয়েছে। তবে তা অনেক আগে। এখন হয়নি। প্রতিভার বিয়ে হয়েছে একুশ বছর বয়সে, প্রজ্ঞাসুন্দরীর আঠারোতে, অভিজ্ঞার বিশে। আর তোমার ইন্দিরার বিয়ে তো হলো ছাব্বিশ বছর বয়সে। বয়সের দোহাই দিয়ে মাধুরীকে বিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক।'

আমার কথা শুনে রবিবাবুর চেহারা ম্লান হয়ে গেল। অপ্রস্তুত হওয়ার একটা আভা তার চোখেমুখে ঝিলিক দিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। তারপর অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বলল, 'অন্য একটা কারণ আছে, বেলাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার।'

আমি চমকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী সেই কারণ?'

'এখন বলব না, পরে একদিন বলব। অনেক রাত হলো। ভোরে উঠতে হবে। চলো ঘুমিয়ে পড়ি।' সে বলল।

রবিবাবু শুয়ে পড়ল। আমি তার পাশে। কিছুক্ষণ পর টের পেলাম সে ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে খুব ধীর লয়ে রবিবাবুর নাক দিয়ে একটা আওয়াজ বেরোতে থাকে। এখন সেই আওয়াজটি বেরোচ্ছে।

আমার কিন্তু ঘুম আসছে না। মাধুরীলতার জন্মের সময়ের কথা মনে পড়ছে। মোমের পুতুলটি যেন। রবিবাবুর রং পেয়েছিল সে। কত টাকা খরচ করে বেলার অন্নপ্রাশন হয়েছিল! পড়ার প্রতি ভীষণ টান ছিল তার। রবিবাবু তার এই কন্যাকে প্রাণাধিক ভালোবাসত। বেলা গান শিখুক—এটা খুব চাইত সে। অসাধারণ সুন্দরী হয়ে মেয়েটি বড় হতে লাগল। বড় স্নেহশীল আর দয়ার্দ্র সে। একদিনের কথা মনে পড়ে যায় আমার। স্বয়ম্প্রভারা একবার ছোট বাংলোতে মাছ রাঁধতে গিয়েছিল। পাগলামতন একজন লোক আগে থেকেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। মেয়েরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল খুব। তারা ওকে লাঠির ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এটা মাধুরীলতার সহ্য হয়নি। বাপের কাছে এসে কাতরকণ্ঠে সে বলেছিল, বাবা, ও তো গরিব লোক, বড় খিদে পেয়েছে তার। তাকে ওরা লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে দিলে! তার কিচ্ছু নেই, বাবা! পরনে এতটুকু কাপড়। মনে হয় শীতকালে কিছুই পরতে পারে না, বাবা। আহা রে, মেয়ে আমার! মানুষের জন্য ওই বয়সে কত ভালোবাসা তোমার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের জন্য যেমন, কীটপতঙ্গের জন্যও তার ভালোবাসার শেষ ছিল না। পিঁপড়ে মারতেও তার ভীষণ আপত্তি। রবিবাবু একদিন বলেছিল, আমার বেলা আমার স্বভাব পেয়েছে। ছেলেবেলায় আমিও কীটপতঙ্গকে কষ্ট দেওয়া সহ্য করতে পারতাম না।

আজ আমার সেই বেলাকে বিয়ে দিয়ে দিতে রবিবাবু এত তৎপর হয়ে উঠল কেন? যে মেয়েকে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসে, তাকে শুধু ভালো ছেলে পেয়েছে বলেই কি বিয়ে দিতে চাইছে, না অন্য কিছু? নিষ্পলক চোখ আমার। চিত হয়ে শুয়ে আছি। জানালা দিয়ে চাঁদের তির্যক আলো বিছানায় এসে পড়েছে। গভীর ভাবনায় মগ্ন ছিলাম বলে খেয়াল করিনি। চাঁদের আলোর বন্যা নেমেছে বুঝি এই বসুন্ধরায়। পূর্ণিমা বোধ হয়। না হলে এত অঢেল জোছনা কোত্থেকে আসবে?

আমার মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসতে থাকল। আমি পাশ ফিরে শুলাম। তন্দ্রা লেগে আসছে। বেলাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার অন্য একটি কারণ আছে—রবিবাবুর এই কথাটি আমার কানের পাশ থেকে সরছে না। কী সেই কারণ? কী সেই কারণ? হঠাৎ আমার মন বলে ওঠে, ঠিকই ধরেছ তুমি। ভালো ছেলে আর বিহারীলালের ছেলে যেমন একটা কারণ, তার চেয়ে মুখ্য কারণ হলো টাকাপয়সা।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। জানালার দিকে মুখ করে খাটে হেলান দিয়ে বসলাম। রবিবাবুর মুখের একাংশে জোছনা এসে পড়েছে। কী অপরূপ সুন্দর লাগছে তাকে! তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উত্তরটা আমার মাথায় এসে গেল।

ঠাকুর কোম্পানি ঋণভারে জর্জরিত। মাড়োয়ারির কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা ধার নিয়ে ডুবে যাওয়া কোম্পানির ঋণ শোধ করা হয়েছে। রবিবাবু নিজের মাসোহারা থেকে তার সুদ গুনছে। শ্বশুরঠাকুরের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো না। শ্বশুরঠাকুর তাঁর শেষ উইল লিখে ফেলেছেন। বিলিব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রবিবাবুর আর্থিক অবস্থা সংকটের মুখোমুখি হবে। ঈশ্বর না করুন, শ্বশুরঠাকুরের মৃত্যু হলে রবিবাবুর পক্ষে যথামর্যাদায় কন্যার বিয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। এই কারণেই কি শ্বশুরঠাকুর বেঁচে থাকতে থাকতে রবিবাবু কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেতে চাইছে? পিতার জীবিতকালের মধ্যে শুভকর্মটি সমাধা করে ফেলতে পারলে খরচটি এস্টেটের তহবিল থেকেই পাওয়া যাবে। এ কারণেই বোধ হয় রবিবাবু অল্পবয়সে মাধুরীকে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বোধ হয় কেন, মূলত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কারণেই মাধুরীকে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রবিবাবু। শরৎকুমারের আকর্ষণ তো আছেই।

কিন্তু বেলা কি সুখী হবে! শরতের ঘরে! সুখী হবে কি না, তা ভবিষ্যৎই বলবে।

কিন্তু এ বিয়েতে আত্মীয়-কুটুম্ব, রবিবাবুর বন্ধুবান্ধব, এমনকি খোদ শ্বশুরঠাকুরও খুশি হননি।

কুলশীলের দিক থেকে বিহারীলালের পরিবার ঠাকুর-পরিবারের চেয়ে পিছিয়ে। কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাবার আশায় রবিবাবু নিজেদের বর্ণমর্যাদার চেয়ে হীন ঘরে কন্যাকে বিয়ে দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু আত্মীয়স্বজন তার এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেননি। যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে বেলার বিয়ে ঠিক করেছে সে, তা কুটুম্বদের মনঃপূত হয়নি। সামাজিকেরাও এই বিয়েকে সমাজবিরুদ্ধ বলে মনে করেছে। সমাজের মানুষজন, এমনকি কুটুম্ববাড়ির আত্মীয়রাও মাধুরীর বিয়েতে আসেনি।

এ ছাড়া শরতের মা কাদম্বরী দেবী সম্পর্কে আমার যে মন্তব্য, তা বিয়ের আগেই অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। কাদম্বরী দেবী যে জটিল এবং লোভী প্রকৃতির, তা তিনি তাঁর পরবর্তী কর্মকাণ্ডে প্রমাণ করেছেন।

এই বিয়ের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করছিলেন রবিবাবুর বন্ধু প্রিয়নাথ সেন। তার অতি আগ্রহের ফলে প্রিয়নাথবাবু কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন। কাদম্বরী দেবী বিয়ের বাজারে ছেলের দর সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি বিয়েতে মোটা অঙ্কের টাকা যৌতুক চেয়ে বসলেন।

একদিন প্রিয়নাথবাবু এসে বলেন, 'রবিবাবু, তোমার মেয়ের বিয়ে বুঝি হয় না।'

রবিবাবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে দ্রুত জিজ্ঞেস করে, 'কেন, কেন বিয়ে হবে না?'

'ওঁদের লোভের অন্ত নেই।' প্রিয়বাবু বলেছিলেন।

'ওঁদের মানে, কাদের?'

প্রিয়নাথ সেন রাগত স্বরে বলেছিলেন, 'ওই তোমার ভবিষ্যৎ বৈবাহিকী। তোমার প্রিয় কবি বিহারীলালবাবুর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী! তাঁর লোভের আগুনে আবার ফুঁ দিচ্ছে তাঁর বড় ছেলে অবিনাশ।'

'তাহলে!' রবিবাবুর হতাশ কণ্ঠ।

'আমি আর কী বলব, ভেবে দেখো, এরকম পরিবারে মেয়ে বিয়ে দেবে কি না?' কাটা কাটা কণ্ঠে কথাগুলো বললেন প্রিয়বাবু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবল রবিবাবু। বেশ কিছুক্ষণ পর ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কত টাকা পণ চাইলেন কাদম্বরী দেবী?'

'বিশ হাজার।'

'বিশ হাজার! বিশ হাজার টাকা যৌতুক চাইলেন কাদম্বরী দেবী! বিহারীলাল চক্রবর্তীর স্ত্রী!' রবিবাবুর বিস্ময়ের সীমা নেই।

প্রিয়নাথবাবু এবার পরিহাসভরা কণ্ঠে বললেন, 'স্ত্রী নন, দ্বিতীয় স্ত্রী। বিহারীলালের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছে বলে মনে হলো না তাঁর সঙ্গে কথা বলে।'

রবিবাবু বলল, 'বিশ হাজার টাকা কোথা থেকে দেব? চেয়েচিন্তে হাজার দশেক টাকা জোগাড় করতে পারব। তুমি ভাই দেখো না, দশ হাজার টাকা দিয়ে কাদম্বরী দেবীকে মানাতে পারো কি না।' তারপর বেদনাভরা কণ্ঠে বলল, 'হায় রে, এই সময় যদি বিহারীলাল বেঁচে থাকতেন!'

প্রিয়নাথ বাবুর গলা থেকে হেঁয়ালি তখনো সরে যায়নি। আমার দিকে আড়চোখে একটু করে তাকিয়ে প্রিয়নাথবাবু বললেন, 'দেখো রবি, একই নাম, অথচ কত তফাত!'

'মানে!' রবিবাবু জিজ্ঞেস করল।

'না, বলছিলাম কি, তোমার নতুন বউঠানের নামও কাদম্বরী আবার তোমার হতে যাওয়া বৈবাহিকীর নামও কাদম্বরী। অথচ প্রকৃতিগতভাবে একই নামধারী দুজন নারীর মধ্যে কত বিশাল ফারাক! একজন দিয়ে গেছে, অন্যজন আঁচল ভরে নিতে আগ্রহী।' প্রিয়বাবু বললেন।

প্রিয়বাবুর কথা শুনে রবিবাবু একেবারে চুপ মেরে গেল। গভীর ভাবনা তার সারা মুখে। কী ভাবছে সে এখন? তার পুরোনো প্রেয়সী কাদম্বরীকে? না লোভাতুর বৈবাহিকী কাদম্বরীকে? মানুষের মনের কথা তো স্পষ্ট করে জানার কোনো উপায় নেই! আমিও রবিবাবুর ওই সময়ের মনের কথা জানতে পারলাম না।

হঠাৎ ভাবনা থেকে বেরিয়ে এল রবিবাবু। দুদিকে মাথা ঝাঁকাল। বলল, 'দেখো ভাই প্রিয়, ছেলেটা যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায়। ভালো করে চেষ্টা চালাও তুমি।'

'দেখি' বলে সেদিন উঠে গেলেন প্রিয়নাথবাবু। তাঁরই চেষ্টায় বিয়েটা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। তবে জল অনেক ঘোলা করার পর।

প্রিয়নাথবাবু চেষ্টা ত্যাগ করেননি। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর ওই এক কথা—বিশ হাজার টাকা পণ দিতে হবে। প্রিয়বাবুর কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিবাবু বড় কাতর হয়ে পড়ে। কোত্থেকে সে বিশ হাজার টাকা দেবে? টেনেটুনে দশ হাজার জোগাড় করাও তার পক্ষে মুশকিল। তার পরও রবিবাবু প্রিয়নাথকে লেখে—আমি ভাই কতক নগদে আর কতক কিস্তিতে হাজার দশেক টাকা পর্যন্ত দিতে পারব। তুমি ওঁদের বুঝিয়ে বল।

প্রিয়নাথবাবু লেখে—দেখো ভায়া, পাত্র যখন তোমার পছন্দ, অন্য কারও কাছে হাত পাতো। কথাটা গোপন রাখলেই হলো। পরে ধীরে ধীরে তুমি ঋণের টাকা শোধ করবে। আর হ্যাঁ, অনেক চেষ্টায় তাঁদের দশ হাজার টাকায় রাজি করিয়েছি।

পিতার কাছে কথাটা গোপন রাখতে রাজি নয় রবিবাবু। বাবাকে সে খুব ভক্তি করে। বাবার সঙ্গে মিথ্যাচার করাকে সে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে মনে করে। সে তার বাবার কাছে সকল কথা খুলে বলে। ছেলের কথা শুনে শ্বশুরঠাকুর খুবই বিরক্ত হন। তিনি বলেন, 'যৌতুকটা বর-কনেকে দিতে হয় আশীর্বাদস্বরূপ। এ বাড়ির প্রত্যেকের বিয়েতে আমি আশীর্বাদস্বরূপ যৌতুক দিয়েছি। কারও বিয়েতে চার হাজার, কারও বিয়েতে পাঁচ হাজার। কোনো বরপক্ষ কখনো আপত্তি করেনি। দশ হাজার টাকা যৌতুক চাওয়া, সে তো বাড়াবাড়ি।' বলে শ্বশুরঠাকুর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। রবিবাবু সে সময় আর কিছু বলতে সাহস করেনি।

কাদম্বরী দিদির বাড়াবাড়ির অন্ত ছিল না। বিয়ের এক-দুই দিন আগে ঠাকুরবাড়ির জামাতাদের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রথা প্রচলিত। শরৎকুমারের বড় ভাই অবিনাশ বেঁকে বসল—দীক্ষা গ্রহণের আগে যৌতুকের দশ হাজার টাকা দিয়ে দিতে হবে। নইলে দীক্ষা নেবে না শরৎ। শ্বশুরঠাকুর বিয়ের আগে দশ হাজার টাকা দিতে রাজি হলেন না। কিন্তু আগুপিছু না ভেবে রবিবাবু এর আগেই রাজি হয়ে গিয়েছিল যে দীক্ষার দিনেই যৌতুকের দশ হাজার টাকা দিয়ে দেবে। যৎপরোনাস্তি অস্বস্তিতে পড়ে গেল রবিবাবু। এই সময় আবির্ভূত হলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। তিনি বিহারীলাল ও দ্বিজেনদার প্রিয় বন্ধু। তিনিই পণের জামিনদার হলেন। বিয়ের তারিখ ঠিক হবার পর ওবাড়ি থেকে প্রস্তাব এল—দশ হাজারের ওপর আরও দুহাজার দিতে হবে। রবিবাবু ভেঙে পড়ল। আমার হাত ধরে বলল, 'এ কী করলাম আমি, ছোট বউ! কোন ঘরে আমি মেয়ে বিয়ে দিতে সম্মত হলাম! এত নোংরা মন তাদের! এত ক্ষুদ্র তারা!' তাদের নাম মুখে আনতেও যেন রবিবাবুর ঘেন্না হচ্ছে।

এর আগে আমাদের পরিবারে আরও অনেক বিয়ে হয়েছে। কিন্তু কন্যার বিয়ের প্রতিটি কথা নিয়ে এমন দরদস্তুর আর কখনো হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরমাত্মীয়কে প্রসন্ন মনে দান করার মধ্যে যে সুখ, সে সুখ আর আমাদের রইল না। এ যেন পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের সকল স্বস্তি ও আনন্দ নিংড়ে নেওয়া। বেলার বিয়ে আমার এবং রবিবাবুর বুকের মধ্যে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিল। আমাদের ভেতরের সকল উৎসাহ নিমেষেই নিভে গেল।

এ সকল কিছুর জন্য রবিবাবুই দায়ী বলে আমি মনে করি। সে বড় সাহিত্যিক, জমিদারও বটে। কিন্তু সংসার অনভিজ্ঞ। অদূরদর্শী। পদে পদে সে ভুল করেছে। তার ভালোমানুষির সুযোগ নিয়েছে বিহারীলাল-পরিবার। রবিবাবু বেলার বিয়েতে তেমন করে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে দেয়নি আমাকে। বলেছে, বিয়েটিয়ে বড় জটিল ব্যাপার। লক্ষ কথার ব্যাপার এখানে। তুমি এসবে মাথা ঘামিয়ো না। আমি সব চালিয়ে নেব। দেখবে কোনো ভজকট হবে না। রবিবাবু আমাকে অনভিজ্ঞ বুদ্ধি-বিবেচনাহীন একজন নারী ছাড়া আর কিছুই ভাবেনি, জীবনের প্রথম থেকে এই পর্যন্ত। নইলে কেন কন্যার বিয়ের প্রস্তুতির ব্যাপারটি থেকেই আমাকে দূরে সরিয়ে রাখল? যদি আমাকে বিয়ের আয়োজনে জড়াত বা নানা সময়ে পরামর্শ নিত, তাহলে ওঁরা গৃধ্নুর মতো খাবলে ধরতে পারতেন না রবিবাবুকে। কিন্তু গভীর অবহেলায় সে আমার পরামর্শ মানেনি। তাই তাকে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। এত বড় একজন মানুষের সঙ্গে হীন আচরণ করতে দ্বিধা করেনি বিহারীলাল-পরিবার। আসলে রবিবাবুর দুর্বলতা কোথায়, তা ওঁরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তার সারল্যকে পুঁজি করে বেলার পাকা দেখার সময়েও কাদম্বরী দেবী একটা প্যাঁচ কষেছিলেন। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কন্যাকে বিহারীলালের বাড়িতে এনে পাকা দেখা দেখাতে হবে। শরৎ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যাবে না।

আমি ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম এই প্রস্তাবে। সকল সৌজন্য বিসর্জন দিয়ে আমি রবিবাবুর সামনে চিৎকার করে উঠেছিলাম, 'কী পেয়েছ তুমি? আমার মেয়ের জীবন নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলতে তোমাকে কে বলেছে? বেলাকে আর কত অপমান করবে তুমি? আর কত অপমানিত হবে নিজে?' বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলাম আমি।

রবিবাবু তাড়াতাড়ি আমার হাত দুটো ধরে ফেলেছিল। করুণ কণ্ঠে বলেছিল, 'ধৈর্য ধরো তুমি। এরকম আকুল হোয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কাঁদতে কাঁদতেই আমি বলেছিলাম, 'সব ঠিক হয়ে যাবে না। তুমি দেখে নিয়ো, সব ঠিক কখনো হবে না। এই শরৎ শান্তি দেবে না আমার মেয়েকে, স্বস্তি দেবে না আমাদের।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিবাবু শুধু বলে যাচ্ছিল, 'শান্ত হও, ছোট বউ। এরকম সময়ে আমরা যদি উতলা হই, তাহলে শুভকর্মে বিঘ্ন ঘটবে। তুমি শান্ত হও।'

রবিবাবুর কথায় আমি আশ্বস্ত হলাম না। কঠোর কণ্ঠে বললাম, 'বেলার পাকাদেখা এই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই হবে। তুমি জানিয়ে দাও—এ প্রস্তাবে রাজি না হলে বিয়ে ভেঙে দেবে তুমি।'

আমার রুদ্রমূর্তি দেখে ওভাবেই প্রস্তাব পাঠিয়েছিল রবিবাবু। এবং পাত্রপক্ষ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসেই পাকা দেখার অনুষ্ঠান সেরে গিয়েছিল।

যথাতারিখে বিয়ে সম্পন্ন হয় বেলার। গুনে গুনে দশ হাজার পাঁচ টাকা বরপক্ষের হাতে তুলে দেয় রবিবাবু। বিয়েতে খরচ হয় তিন শ সাতষট্টি টাকা দুই আনা নয় পাই। সব টাকাই সরকারি কোষাগার থেকে দেওয়া হয়। রবিবাবুর নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ হয় সামান্য। কন্যা-জামাতাকে সে যৌতুক হিসেবে একটি লাইব্রেরি উপহার দিয়েছিল। ওই লাইব্রেরির ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত বই কিনতে যা লেগেছিল, সেটা নিজের তহবিল থেকে খরচ করেছিল রবিবাবু।

বিয়ের পর শরৎকুমার মজঃফরপুর ফিরে গেল, মাধুরী থেকে গেল জোড়াসাঁকোতে। মাস খানেক পর রবিবাবু বেলাকে স্বামীগৃহে পৌঁছে দিতে যায়। আমার মনে একটা আনচান ভাব। এত সহজ-সরল বেলা ওরকম কুটিল পরিবারে গিয়ে শান্তি পাবে তো? স্বস্তিতে ঘরকন্না করতে পারবে তো সে? কাদম্বরী দিদি যথামর্যাদায় আমার মেয়েকে গ্রহণ করবেন তো? শরৎ তার মা-নেওটা স্বভাব ত্যাগ করে প্রাণের থেকে আমার মেয়েকে ভালোবাসবে তো? এসব কথা চিন্তা করতে করতে আমার অস্থির অস্থির লাগে। প্রচণ্ড আলোড়ন হতে থাকে আমার মধ্যে। বেলা স্বামীগৃহে যাওয়ার আগে আগে উদ্বিগ্নতা আমাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে। আমার ভেতরের আলোড়ন হয়তো আমার চেহারায় প্রভাব ফেলেছিল, নইলে কেন রবিবাবু জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকে এত উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে কেন? কোনো অসুখবিসুখ করেনি তো?'

আমি ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ি।

রবিবাবু জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে?'

আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না। হড়বড় করে আমার শঙ্কার কথা জানাই রবিবাবুকে।

রবিবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে জোরে জোরে মাথা নাড়ে। শঙ্কার ছায়া নামে তার চোখেমুখেও। আগে হলে হয়তো উড়িয়ে দিত আমার কথাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বেলার বিয়েতে নানাভাবে অপদস্থ হবার পর আমার আশঙ্কাকে রবিবাবু উড়িয়ে দেয় না। মৃদু কণ্ঠে বলে, 'ঈশ্বরকে বলো, তোমার আশঙ্কা যাতে মিথ্যে হয়। মেয়ে যাতে সুখে-শান্তিতে স্বামীর ঘর করে।'

এসব কথার হপ্তা খানেক পর রবিবাবু বেলাকে নিয়ে মজঃফরপুর যায়। আমার উৎকণ্ঠা কাটাবার জন্য সেখান থেকে সে আমাকে চিঠি লিখে এই বলে—

"বেলা বোধ হচ্ছে এখন বেশ স্থির হয়ে নিজের ঘরকন্নাটি জুড়ে নিয়ে বসেছে। গোছান গাছানর কাজে এখন ওর দিনকতক বেশ কাটবে। সন্ধ্যাবেলায় শরতে ওতে মিলে 'কুমারসম্ভব' পড়া হবে এই রকম একটা জল্পনাও চলছে।"

রবিবাবুর চিঠি পেয়েও আমার অস্থিরতা কাটে না। বিয়ের প্রথম প্রথম তো শ্বশুরবাড়িতে নতুন বউয়ের একটা কদর থাকেই। তবে তা মিলিয়ে যেতেও বেশিদিন সময় লাগে না। সব শ্বশুরবাড়ি হয়তো আমার ভাবনার মতো নয়, কিন্তু শরৎ-পরিবারকে তো আমার চেনা হয়ে গেছে। লোভ-লালসা তাদের রক্তে রক্তে। পৃথিবীতে তাঁরা শুধু টাকাই বোঝেন, মানুষ তাঁদের কাছে মূল্যহীন। এই এত নামীদামি ঠাকুর-পরিবারকে পর্যন্ত অপদস্থ করতে দ্বিধা করলেন না!

আমার অস্থিরতার কথা জানাই রবিবাবুকে। তখন সে মজঃফরপুর থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছে। আমার চিঠি পেয়ে রবিবাবু আমাকে আবার লেখে—

'বেলাকে রেখে এলুম। তোমরা দূরে থেকে যতটা কল্পনা করচ ততটা নয়—বেলা সেখানে বেশ প্রসন্ন মনেই আছে—নতুন জীবনযাত্রা তার যে বেশ ভালোই লাগচে তার আর সন্দেহ নেই। এখন আমরা তার পক্ষে আর প্রয়োজনীয় নই। বেলা বেশ সুখে আছে সেই কথা মনে করে তোমার বিচ্ছেদ-দুঃখ শান্ত করতে চেষ্টা করো।'

রবিবাবুর চিঠি পড়ে আমার উদ্বেগ প্রশমিত হলো। একেবারে প্রশমিত হলো, এমন নয়। মাঝেমধ্যে আতঙ্ক আর আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল আমার মনে। আমি তখন রবিবাবুর চিঠি নিয়ে বসি। যেখানে যেখানে বেলার সুখের কথা লেখা আছে, বারবার সেই অংশগুলো পড়ি। তার পরও আমার মন থেকে আশঙ্কা একেবারে কাটে না। মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি। জানি না, শরৎ এবং তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা আমাদের সঙ্গে কত দিন সুসম্পর্ক বজায় রাখবে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলার বিয়ের এক মাস চব্বিশ দিন পর রবিবাবু রেণুকার বিয়ে দেয়। রেণুকা আমাদের তৃতীয় সন্তান, দ্বিতীয় কন্যা। বিয়ের সময় রেণুকার বয়স দশ বছর ছয় মাস চব্বিশ দিন। অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে আমার প্রচণ্ড আপত্তি আছে। বেলার বিয়ের সময় আমার আপত্তির কথা রবিবাবুকে জানিয়েছিলাম, শোনেনি। রেণুকার বিয়ের ব্যাপারে আমার অমত থাকা সত্ত্বেও রবিবাবু তড়িঘড়ি করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। বর সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রবিবাবুর বিবেচনায় সত্যেন্দ্রনাথ ছেলেটি ভালো, বিনয়ী এবং কৃতী। পূর্বের স্বার্থচিন্তাটাই হয়তো রবিবাবুর মনে কাজ করেছে—বিয়ের সমুদয় খরচ বহন করা হবে এস্টেটের তহবিল থেকে। সেখান থেকে খরচাদি মেটানো হলেও, তা বেলার বিয়ের মতো নয়। সত্যেন্দ্র-পরিবার কোনো যৌতুক চায়নি। একটি শর্ত ছিল বটে—সত্যেন্দ্রকে আমেরিকায় পাঠাতে হবে। পণের কোনো টাকা দিতে হবে না, স্বাভাবিকভাবেই রেণুকার বিয়ে ধুমধামের সঙ্গে হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিয়েটা সেরকম হয়নি। একই রাতে সুনৃতার বিয়ে হয়েছিল। সুনৃতা হেমেন্দ্রনাথ দাদার ষষ্ঠ কন্যা। সুনৃতার বিয়ে রাত নয়টায় আর রেণুকার বিয়ে রাত এগারোটায়। একই পরিবারে, প্রায় একই জায়গায় বিয়ে। তার পরও এ দুজনের বিয়েতে আড়ম্বর আর খরচের বৈষম্য ছিল। যেখানে রেণুকার বিয়েতে শ্বশুরঠাকুর খরচ করেছিলেন পাঁচ শ টাকা, সেখানে সুনৃতার বিয়ের খরচ বরাদ্দ ছিল এক হাজার দুই শ পঁয়ষট্টি টাকা।

এই বৈষম্যের কারণ নিয়েও ভেবেছি আমি। এই সেদিন বেলার বিয়েতে প্রচুর টাকা খরচ হলো, দ্বিতীয় মেয়ের বিয়েতে তেমন করে বরাদ্দ দিতে হয়তো রাজি ছিলেন না শ্বশুরঠাকুর। তাই তাইরে নাইরে করে রেণুকার বিয়েটা সারতে হলো রবিবাবুকে।

দ্বিতীয় মেয়েকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। রানী—রেণুকাকে আমরা রানী বলেই ডাকতাম, কিছুটা অস্বাভাবিক চরিত্রের বলে। আর পাঁচটি সাধারণ মেয়ের মতো নয় সে। ঐশ্বর্যের মধ্যে সন্ন্যাসিনী হয়ে যেন সে জন্মেছিল। শিশুকাল থেকেই সাজগোজ ভালো লাগত না তার। চুলবাঁধাকে এক বিরক্তিকর ব্যাপার বলে মনে করত। জেদ তার প্রচণ্ড। মাধুরীর মতো সুন্দরী নয় সে। রং একটু চাপা। দুই বোনের মধ্যে একটু রেষারেষি ছিল। তা অস্বীকার করার উপায় নেই আমার। তবে তাদের রেষারেষি মন-কষাকষিতে রূপ নেয়নি কখনো। মাধুরী যেমন শান্ত নিরীহ, রেণুকা তেমন নয়। কোনো কিছু করবে না বলে যখন সে ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়াত, তার সংকল্প থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুতেই ফেরানো যেত না তাকে।

রবিবাবু চেয়েছিল রেণুকাকে বিয়ে দিয়ে দূরের শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিতে। তাত্ত্বিকভাবে সে মেয়েদের যৌবনকালে বিবাহে উৎসাহী ছিল, অকাল বিয়ের বিরুদ্ধে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সে নিজের কন্যাদের বিয়ের বেলায় পিছু হটেছে। তার যুক্তি, তার অভিপ্রায় শুধু কাগজে-কলমে সীমিত থেকেছে, বাস্তবে অবয়ব পায়নি।

কেন রেণুকাকে রবিবাবু তাড়াতাড়ি শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতে চেয়েছিল, তা আমার বোধগম্য হয়নি। ঠাকুরবাড়ির রেওয়াজই এই—জামাতাকে শ্বশুরবাড়িতে থেকে যেতে হবে। আমাদের কন্যাদের ক্ষেত্রে তা অবশ্য হয়নি। বিয়ের পর বেলা চলে গেছে শ্বশুরবাড়িতে, রেণুকার বেলায়ও রবিবাবু একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যদিও সত্যেন্দ্র আমেরিকায় রওনা হওয়ায় রেণুকা আমাদের সঙ্গেই থেকে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিয়ে মানে ফুলশয্যা পর্যন্ত। মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোর কারণ হিসেবে রবিবাবু আমাকে বলেছে—আমাদের পরিবারের শিক্ষা রুচি অভ্যেস ভাষা সবই অন্য সমস্ত বাঙালি পরিবার থেকে আলাদা। বিয়ের পর মেয়েরা অন্য পরিবারে ঘরকন্না করতে যায় না বলে তারা সংসার-অনভিজ্ঞ থেকে যায়। নতুন পরিবারে গেলে সংসারের নানা খুঁটিনাটি আর অল্পস্বল্প পীড়নের মুখোমুখি হতে হবে তাদের। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বাধ্য হবে তখন তারা। বাপের বাড়িতে থাকলে মেয়েরা স্বামীনির্ভর থাকে না। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেই মেয়েরা নিজের দিকে তাকাতে বাধ্য হবে। এতে নিজেদের শুধরে নেবার সুযোগ পাবে তারা। এসব কথা ভেবে আমি মেয়েদের যত শিগগির শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোর পক্ষে।

এতক্ষণ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে রবিবাবুর কথাগুলো শুনে গেলাম। কথাগুলো মোক্ষম বলে আমার মনে হলো। রবিবাবুর অন্তর্দৃষ্টি দেখে আমি মোহিত হলাম। কিন্তু তার শেষ কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। রবিবাবু বলল, 'তুমি নিজের কথা ভেবে দেখো না। আমি যদি তোমাকে বিয়ে করে ফুলতলিতে থাকতাম, তাহলে তোমার স্বভাব ও ব্যবহার অন্যরকম হতো।'

রবিবাবু কিসের মধ্যে কিসের অবতারণা করল! মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোর পক্ষে যে যুক্তিগুলো সে দিল, তাতে তো আমি অমত করিনি! বরং তার দূরদৃষ্টি দেখে মনে মনে প্রশংসা করেছি। হঠাৎ করে মেয়েদের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে গিয়ে আমার প্রসঙ্গ টানল সে। বলল, স্বভাব ও ব্যবহার অন্যরকম হতো। এখানে 'অন্যরকম' শব্দটির অর্থ কী? অভব্য, গেঁয়ো, অপরিশীলিত, ভদ্রজনোচিত নয়—এসব তো! আমি গ্রামের মেয়ে ছিলাম। সেখানকার যে জীবন তা সহজ সরল, সেখানকার ভাষা অকৃত্রিম, মানুষের স্বভাবের মধ্যে মেকিপনা নেই। সরলতা, সহজাত জীবনাচরণ, মাটির ভাষায় কথা বলা কী দোষের কিছু? হ্যাঁ, এটা সত্য যে ফুলতলির মানুষদের ধনসম্পদ নেই, আচার-ব্যবহারে শহুরে কৃত্রিমতা নেই, চিবিয়ে কথা বলে না তারা, এগুলো অভব্যতার বৈশিষ্ট্য নয়। অথচ রবিবাবু খোঁচা দিয়ে আমাকে জানিয়ে দিল যে, আমি যেখান থেকে এসেছি, সে জায়গার মানুষজন অত্যন্ত অপরিশীলিত। জানি না, রবিবাবু কী অর্থে 'অন্যরকম' শব্দটি ব্যবহার করেছে, আমার কিন্তু সদর্থক বলে মনে হয়নি। আর মনে হবেই বা কী করে? রবিবাবু তো খোঁচা দিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত। ওই যে অনেক দিন আগে রথীর লেখাপড়ার কথা বলতে গিয়ে বাঙাল বলেছিল আমাকে, সে কথা তো মনের কোণে এখনো গেঁথে আছে।

AMARBOI.COM

তেরো

বেলা ও রানীর বিয়ে হয়ে গেল দুমাসের মধ্যে। শ্বশুরবাড়িতে চলে গেল বেলা। বিয়ের পর রানী আরও অন্তর্মুখী হয়ে গেল। কারও সঙ্গে তেমন মেলামেশা করে না। একা একা থাকে। ঠাকুরবাড়িতে রানী তার অস্তিত্বকে সংকুচিত করে এনেছে। বেলা আমার ঘরদোর আলোতে ভরিয়ে রাখত। এখন সে নেই, যেন কিছুই নেই। শূন্যবাড়ি হাঁ হাঁ করছে। মনে করেছিলাম দীর্ঘদিনের নানা গোলমালের পর একলা বাড়ি পেয়ে নির্জনে আরাম বোধ করব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার ধারণা ভুল। নির্জনতা সব সময় সুখ আনে না। কর্মব্যস্ততা আর জনবাহুল্যের মধ্যেও সুখ আছে। বিশেষ করে, সে মানুষগুলো যদি আপনজন হয়। আমার চারপাশে তখন অন্য তিনজন সন্তান—রথী, মীরা আর শমী। রথী তো মাথা তোলা হয়েছে। দূরে দূরে থাকে সে। কৈশোর ছাড়িয়ে সে তারুণ্যে পা রাখছে। এই বয়সে ছেলেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগে। একা একা থাকতে চায়। রথীর মধ্যে তারুণ্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীরা নিতান্ত বালিকা। সাত পেরোল মাত্র। মীরার একটা পোশাকি নাম আছে—অতসীলতা। রবিবাবুই শেষ মেয়েটির নাম রেখেছিল—অতসীলতা। এই নামটি মীরা নামের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। মীরা বড় জ্বালাতন করত রবিবাবুকে। যখন হাঁটতে শিখল, তখন থেকেই রবিবাবুর খাতাপত্র, পাণ্ডুলিপি, কলম, দোয়াত—এগুলো তছনছ করবার দায়িত্ব নিল সে। শুধু তা-ই নয়, রবিবাবুকে থাবড়েথুবড়ে, তার বুকের ওপর নেচেকুঁদে, তার দাড়ি, গোঁফ, চুলের সিঁথি—সবকিছু এলোমেলো করাতেই মীরার সুখ। এই মীরাই এখন আমার সঙ্গী। সে একা অন্য দুই মেয়ের শূন্যস্থান পূরণ করে যাচ্ছে। বেলা আর রানী এখন আমার কাছে অধরা। যে হাতের কাছে, তাকে স্নেহপাশে বন্দী করেছি।

শেষ সন্তান বলেই হয়তো শমীর প্রতি রবিবাবুর গভীর স্নেহ ছিল। কলকাতাতেই জন্মেছিল শমী। ঠাকুরবাড়ির প্রথা—কোনো শুভকর্মে ব্রাহ্মসমাজ তহবিলে দান করতে হবে। রবিবাবু শমীর জন্ম উপলক্ষে ওই তহবিলে দশ টাকা দান করেছিল। জন্মের প্রায় পনেরো মাস পর শমীর অন্নপ্রাশন হয়েছিল। বেশ সমারোহ হয়েছিল তার অন্নপ্রাশনে। ছোট নাতির অন্নপ্রাশনে দরাজ হাতে খরচ করেছিলেন শ্বশুরঠাকুর। পাঁচ বছরের শমী এখন আমার পাশে পাশে থাকে। অন্য ছেলেমেয়েরা যতটুকু পিতার সাহচর্য পেয়েছে, শমী সেটুকুও পাচ্ছে না। রবিবাবু এখন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় গড়ায় মগ্ন। সেখানেই তার অধিকাংশ সময়ের বসবাস। আমরা থাকি কলকাতায়। রবিবাবুকে দেখভাল করার কেউ নেই। সমস্ত দিনের শ্রম শেষে শ্রান্ত দেহে ঘরে ফেরে সে। একজন পাচক যা পারে রেঁধে দেয়। এতে ভোজনরসিক রবিবাবুর তৃপ্তি মেটে না। ক্ষুধা নিয়ে শয্যায় যায়। এসব সংবাদে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়ি। ঠাকুরবাড়ির প্রাচুর্যের মধ্যে আমি বাস করছি আর আমার স্বামী বিভুঁইয়ে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে!

আমি রবিবাবুকে অনুনয় করে চিঠি লিখি—আমাকে নিয়ে যাও। এই সময় আমি তোমার পাশাপাশি থাকতে চাই।

আমার শরীরে জ্বর-জ্বর বোধ হয়। আমি তা গোপন রাখি। গোপন না রাখলে রবিবাবু যে আমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবে না। শান্তিনিকেতনে যেতে না পারলে আমার প্রার্থিত কাজ যে সম্পন্ন হবে না। আমি যে বলুকে কথা দিয়েছিলাম—তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন করব আমি। সে শান্তিনিকেতনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবদ্দশায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এখন রবিবাবু শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজটি শুরু করেছে। এই কাজে আমার সক্রিয় ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। তাতে বলুর আত্মা তৃপ্তি পাবে।

একদিন রবিবাবু আমার আবেদন গ্রাহ্য করল। সসন্তান আমাকে নিয়ে গেল শান্তিনিকেতনে। নিয়ে যাবার ব্যাপারে রবিবাবু হয়তো আরও কিছুদিন গড়িমসি করত। কিন্তু নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে সে ভাবল—এই সময় তার স্ত্রী-সন্তানদের জোড়াসাঁকোয় থাকা উচিত হবে না। নীতীন্দ্র রবিবাবু আর আমার খুব প্রিয়পাত্র ছিল। সে ছিল বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র। আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় ছিল। আমার ছেলেমেয়েদের গান শেখাত নীতীন্দ্র। হঠাৎ করেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সিরোসিস অব লিভার হয়েছিল তার। নির্ঘুম রাত কাটত নীতীন্দ্রের। যন্ত্রণায় সারা রাত ছটফট করত। ঠাকুরবাড়ির প্রথানুযায়ী ত্রিধারায় চিকিৎসা করিয়েও তাকে বাঁচানো গেল না। চৌত্রিশে মারা গেল নীতীন্দ্র।

শান্তিনিকেতনে পৌঁছে বিপুল উৎসাহে আমি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মহৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। স্থাপিত হলো ব্রহ্ম বিদ্যালয়। তখন আমাদের থাকার তেমন সুবন্দোবস্ত ছিল না শান্তিনিকেতনে। সাধারণ মানের অতিথিশালার কয়েকটি ঘর নিয়ে আমরা থাকতে শুরু করেছিলাম।

সকাল থেকে রবিবাবু কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার সকল ধ্যানজ্ঞান যেন ব্রহ্ম বিদ্যালয়টি। আমিও পিছিয়ে থাকি না। এত বড় কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের নাম করে রবিবাবু এর-ওর কাছে সাহায্য চায়। অনেকে সাহায্য করে আবার অনেকে এড়িয়ে যায়। যারা একবার অর্থ সাহায্য করে দ্বিতীয়বার করতে গিয়ে তারা কার্পণ্য দেখায়। কিন্তু রবিবাবুর দৃঢ়সংকল্প—যেভাবেই হোক শান্তিনিকেতনে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় চালু করতে হবে। পড়ুয়াদের থাকার জন্য ঘর বানাতে হবে। এ কাজে সহযোগিতা করবেন বলে একজন কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি কথা রাখেননি। রবিবাবু ভেঙে পড়ল—হায় হায়, এখন আমি কী করি! এতগুলো ছোট ছোট বাচ্চা। তাদের আমি কোথায় রাখি!

পাশে বসে আমি তাকে আশ্বস্ত করি, 'তুমি ভেঙে পড়ো না। আমি আছি।'

রবিবাবু চমকে আমার দিকে তাকায়। বলে, 'তুমি আছ মানে! তুমি কী করবে?'

আমি রবিবাবুর প্রশ্নের জবাব দিই না। আস্তে করে তার পাশ থেকে উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই। ঘরের ভেতর থেকে কিছুক্ষণ পর ফিরে আসি। বলি, 'ধরো। এগুলো দিয়ে প্রয়োজন মেটাও।'

রবিবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বলে, 'এগুলো কী?'

আমি পোঁটলাটি রবিবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বলি, 'গহনা। এখানে কিছু গহনা আছে। এগুলো বিক্রি করে শিক্ষার্থীদের জন্য ঘর তোলো।'

'পাগল হয়েছ তুমি! তোমার গহনা বেচে ঘর তুলব!'

'নয় কেন? তোমার আপত্তি কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করি।

আমার কণ্ঠ শুনে রবিবাবু যেন একটু ভড়কে যায়। ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বলে, 'তোমার গহনা! এগুলোর সঙ্গে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে! শুধু তোমার কেন, মায়ের স্মৃতিও এগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে! তোমার অধিকাংশ গহনা তো মায়ের।' বলতে বলতে থেমে গেল রবিবাবু। তারপর সতেজে বলল, 'না না, এ গহনা আমি বেচতে পারব না।'

আমি শান্ত স্বরে বলি, 'স্মৃতির কথা বলছ তুমি! গহনার টাকায় যখন ঘর বানাবে, ওই ঘরই তো তখন গহনার স্মৃতি ধারণ করে থাকবে। ওই ঘরই তোমাকে মনে করিয়ে দেবে তোমার মায়ের কথা, আমার কথা।'

আপন মনে কী যেন ভাবল রবিবাবু। তারপর গহনার পোঁটলাটি নিয়ে উঠে গেল।

এইভাবে শান্তিনিকেতন গড়তে রবিবাবু যখন যখন ঠেকেছে, আমি গহনা বের করে দিয়েছি। রবিবাবু গড়িমসি করেছে। আমি বলেছি, 'গহনা তো আমি তেমন করে পরি না। শুধু শুধু বাক্সবন্দী হয়ে আছে। ওখানে ওগুলোর কদর নেই। ওই গহনাগুলোর মূল্য বাড়বে, যখন তুমি এর টাকায় বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ করবে।' রবিবাবু গহনা বেচবার উদ্যোগ নেয়।

আমি মনে মনে বলি, 'বলু, তোমার আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যালয়টি তৈরি হচ্ছে শান্তিনিকেতনে। তুমি তা-ই চেয়েছিলে। আমি বলেছিলাম—তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করব আমি। আমার হাতে সুযোগ এসেছে। গহনা আমার কাছে দামি নয়, যেমন মূল্যবান ছিলে তুমি।'

ছেলেদের থাকার বোর্ডিং তৈরি হলো। পড়ুয়ারা থাকতে শুরু করল সেখানে। রথী এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। একদিন রবিবাবু আমাকে এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিল, 'রথীও অন্য সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে বোর্ডিংয়ে থাকবে।'

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'আমাদের তো থাকার জায়গা আছে। রথী আমাদের সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কী? তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে থাকার অধিকার তো তার আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অধিকার আছে বটে, তার পরও আমি চাই রথী ওখানেই থাকুক। তাতে করে অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পাবে সে। ফলে ওর ভেতরটা আলোকিত হয়ে উঠবে। মানুষের মতো মানুষ হতে থাকবে সে।'

আমি আমার শেষ চেষ্টা করলাম। বললাম, 'শুনেছি, বোর্ডিংয়ের খাওয়াদাওয়ার মান খুব খারাপ। রথী ওই খাবারে অভ্যস্ত নয়। তার খুব কষ্ট হবে।'

রবিবাবু বলল, 'আমি চাই রথী সেই কষ্টটা পাক। বুঝুক, জীবন কাকে বলে।' তারপর একটু থেমে সিঁথিতে একটু করে হাত বুলিয়ে রবিবাবু বলল, 'তা ছাড়া...।'

'তা ছাড়া?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

রবিবাবু ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার যখন এই বিশ্বাস যে, ছাত্রাবাসে তোমার ছেলে ভালো খেতে পাবে না, তখন তোমার মধ্যে উদ্বিগ্নতা কাজ করবে। এই উদ্বিগ্নতার কারণে তুমি অন্যান্য ছাত্রের দেখভাল করবে। তাতে আমার লাভ, ছাত্রদের লাভ।'

'সে কেমন?' আমি বলি।

'দূরদেশে ওরা একজন মা পাবে। মায়ের স্নেহ ছেড়ে এসে অন্য আরেকজন মায়ের স্নেহাঞ্চলে বন্দী হবে তারা। তাতে আমার আর ছাত্রদের লাভ নয় কি?' স্মিত হেসে রবিবাবু বলল।

সেই থেকে ছাত্রাবাসের ছাত্রদের সুখ-দুঃখের দায়দায়িত্ব আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি। তাদের বৈকালিক আহারের দায়িত্ব আমি নিই। টুকটুক করে আমি আমার অবশিষ্টাংশ গহনা বিক্রি করতে থাকি। ওই টাকা দূরাগত পড়ুয়াদের ভরণপোষণে খরচ করি।

একজনের কথা বলি, সে ধীরেন। একদিন রথী এসে বলল, 'ধীরেন নামে একজন ছাত্র বোর্ডিংয়ে থাকে। তার খুব জ্বর।'

রথীর কথা শুনে আমি খুব বিচলিত বোধ করলাম—আহা রে! ধীরেনের মা যদি কাছে থাকত, তাহলে সন্তানের সেবা করত। এখন সে কাজ আমার করা উচিত। একজন ভৃত্যকে ডেকে রথীকে বললাম, 'একে সঙ্গে করে নিয়ে যাও রথী। ধীরেনকে ধরাধরি করে এখানে নিয়ে এসো।'

ধীরেনকে নিয়ে এলে যত্ন করে বিছানায় তাকে শুইয়ে দিলাম আমি। দুধসাবু খেতে দিলাম। তিন-চার দিন জ্বরে ভীষণ কষ্ট পেল ছেলেটা। শেষ পর্যন্ত ভালো হয়ে উঠল। শুধু ধীরেন কেন, এরকম আশ্রমে কোনো বালকের পীড়া হলে তার রোগ নিরাময়ের দায়িত্ব নিলাম আমি। যত কষ্টই হোক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিমুখে শান্তিনিকেতনের কাজে আমি নিজেকে নিযুক্ত করেছিলাম। এই নিযুক্তি শুধু শারীরিক নয়, বৈষয়িকও। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজে হাতের কয়েক গাছা চুড়ি ও গলার একটি চেইন ছাড়া আর সবই বিক্রি করে দিয়েছিলাম। আমার কাছে কম গহনা ছিল না। শ্বাশুড়িমাতার পুরোনো আমলের ভারী ভারী গহনাগুলো আমার কাছেই ছিল।

অবিরাম কায়িক শ্রমে আমার শরীর দুর্বল হতে লাগল। সেই দুর্বলতা বাইরে প্রকাশ করি না আমি। হাসিমুখে সেবা-শুশ্রূষা করে যাই পড়ুয়াদের, অতিথিবৃন্দের এবং রবিবাবুর। খোঁজখবর নিই দাসদাসীদের।

সমস্ত দিন নানা কাজে ব্যস্ততার মধ্যে কাটে রবিবাবুর। ঘরে কোনো কোনো দিন খাওয়া হয় তার, বেশির ভাগ দুপুরের খাবার ঘরে খায় না। সন্ধের আগে আগে ঘরে ফিরে শ্রান্ত দেহটি এলিয়ে দেয় কৌচে। আমি হাতপাখা নিয়ে কাছে বসি। শ্রান্তি কেটে গেলে হাতমুখ ধুতে যায় রবিবাবু। আমি জলখাবার এগিয়ে দিই।

আর আমি তার পেছনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে তার চুলে হাত বোলাতে থাকি। সে আরাম বোধ করে। চোখ বন্ধ করে আমার হাত বোলানো উপভোগ করে।

রাতে পাশে শুয়ে কাছে টানে রবিবাবু আমাকে। আমার শারীরিক অসুস্থতা আমি গোপন রাখি। তার ডাকে সাড়া দিই। সে পরম তৃপ্তি নিয়ে ঘুমায়। আমি পাশে শুয়ে তার দেওয়া তৃপ্তি উপভোগ করতে থাকি।

একদিন আমি বুঝতে পারি—আমি মা হতে চলেছি। রবিবাবুর ষষ্ঠ সন্তানের আগমন ঘটেছে আমার গর্ভে। বিষয়টি আমি সঙ্গে সঙ্গে রবিবাবুকে জানাই না। কিন্তু গর্ভধারণের একটা ছাপ তো চোখে মুখে শরীরে পড়ে! রবিবাবু একদিন জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কি শরীর খারাপ? তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন?'

আমি আসল কথা গোপন করে বলি, 'বেশি পরিশ্রমের কারণে বোধ হয় ওরকম দেখাচ্ছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রবিবাবু আশ্বস্ত হয়। নিজের কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয় না। একদিন দুর্ঘটনাটা ঘটে যায়।

তখন ভাদ্র মাস। হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির ধারায় গোটা শান্তিনিকেতন ভেসে যাচ্ছে। অধিক বৃষ্টিপাত বলে সেদিন রবিবাবু কোথায়ও বের হয়নি। বুধবার। আশ্রমের ছুটির দিন। ফলে বাইরে বেরোনোর কোনো তাড়া নেই তার। জলের ছিটা বাঁচিয়ে বারান্দায় তার লেখার টেবিলটা পাতা। ভোরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শয্যা ত্যাগ করে কী যেন লেখালেখি করছে রবিবাবু।

লেখালেখি নিয়ে সাধারণত সে আমার সঙ্গে তেমন আলাপ করে না। তার সঙ্গে আমার যত কথা, তার সিংহভাগ বৈষয়িক এবং পারিবারিক। শান্তিনিকেতনের জন্য আরও টাকা দরকার, সত্যেন্দ্রের জন্য এ মাসের টাকা পাঠাতে হবে বিদেশে, মাধুরীর একটু জ্বর-জ্বর বোধ হয়েছিল, সেরে উঠেছে কি না, রথীর পড়াশোনার খোঁজ নিতে পারিনি, তুমি খোঁজ রেখেছ কি না বা নিদেনপক্ষে রান্নাবান্নার খোঁজখবর। এ ছাড়া জমিদারি বা তার বইপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করত না রবিবাবু। আমিও এসব বিষয়ে জানতে চাইতাম না। রবিবাবু হয়তো মনে করত—জমিদারি, সাহিত্য এসব জটিল বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে লাভ কী? জমিদারির কাজে মৃণালিনী আবার কী পরামর্শই বা দেবে?

জমিদারি চালাতে কুটিলতার প্রয়োজন, প্রয়োজন নিষ্ঠুরতার। এ বিষয়ে আমার জ্ঞান তো সামান্য। তাই আমার সঙ্গে আলাপে জমিদারি প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেত সে। রবিবাবু মনে করত—আমার সাহিত্যজ্ঞান নগণ্য। আমি তো নতুন বউঠান বা ইন্দিরা নই! এরা কবিতা বুঝত; প্রকৃতি আর সৌন্দর্য অনুধাবন করার মতো গুণ ছিল তাদের। আমি তো সামান্য গিন্নি। রবিবাবুর গৃহের পাহারাদার। আমি তো তার সন্তানধারণের ক্ষেত্রভূমি। বিচক্ষণতায় আমি কাদম্বরী বা ইন্দিরা নই, সৌন্দর্যে তো নই-ই। তাই কোনো দিন তেমন করে আমার সঙ্গে তার লেখালেখি নিয়ে কথা বলত না রবিবাবু। আমার যখন একটু জ্ঞানগম্যি হলো, আমি প্রথম প্রথম রবিবাবুর লেখালেখি নিয়ে দু-চারটা কথাবার্তা বলতে চেয়েছি। ওই সময় সে অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। একধরনের করুণার ভাব তার চোখেমুখে ফুটে উঠত। আমার প্রশ্নের কোনো জবাব দিত না সে। আমি ভড়কে যেতাম। এরকম দু-একবার হবার পর আমি প্রতিজ্ঞা করলাম—আর না, আর কখনোই রবিবাবুর সঙ্গে তার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব না।

আজও তাই। রবিবাবু নিবিড় মনোযোগে লিখে যাচ্ছে, আমি দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছি। একচল্লিশ বছর বয়স এখন রবিবাবুর। অধিক বয়সের কোনো চিহ্ন তার অবয়বে নেই। তার শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল বলছে—এইমাত্র তারুণ্যের দরজায় পা রেখেছে সে। কী সরু আর সুন্দর আঙুল তার! কাগজের ওপর এই আঙুলগুলো দ্রুত সঞ্চরমাণ, এপাশ থেকে ওপাশে।

হঠাৎ মাথা তুলল রবিবাবু। আমার ওপর চোখ পড়ল তার। স্মিত হেসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখছ?'

'কিছু না।' আমি লজ্জিত গলায় বললাম।

'কিছু তো একটা বটে। তোমার চোখমুখ বলছে, তুমি আমার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবছ।' রবিবাবু রসিক গলায় বলে উঠল।

আমি শাড়ির আঁচল গায়ে জড়াতে জড়াতে বললাম, 'বললাম তো, কিছু না। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

'না, বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি আমাকে নিয়ে শিহরণমূলক কিছু একটা ভাবছ, এরকম বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে আমার।'

রবিবাবুর কথা শুনে আমি চট করে পেছনে তাকাই। ছেলেমেয়ে আশপাশে নেই তো! আজ সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে রথী এসেছে। এই সময় ভাইবোনদের নিয়ে ওই পাশের ঘরে আড্ডা দিচ্ছে সে। তার পরও রবিবাবুর কথা শুনে আমি পেছনে তাকালাম, যদি ছেলেমেয়েদের কেউ তার কথা শুনে ফেলে! কাউকে না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। প্রসঙ্গ এড়িয়ে দ্রুত বললাম, 'খাওয়ার সময় হয়ে এল। তোমার স্নানের জল দেওয়া হয়েছে। স্নানটা সেরে এসো। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে খেতে বসবে।'

এর মধ্যে রবিবাবু নিজেকে সামলে নিয়েছে। আমার কথা শুনে সহজ কণ্ঠে বলল, 'খাওয়ার কথা বলায় একটা কথা মনে পড়ল আমার। কাল বোলপুরের মুন্সেফবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ, মনে আছে তো তোমার? কদিন আগে বলেছিলাম।' তারপর কাগজ-কলম গোটাতে গোটাতে বলল, 'মনে রেখো, কাল দুপুরে যেতে হবে।'

আমি বললাম, 'যে অঝোরধারায় বৃষ্টি ঝরছে, অত দূরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া কি সম্ভব?'

'কী করব বলো, মুন্সেফবাবুর এক কথা—বউদিদিমণিকে সঙ্গে আনতে হবে। নইলে আমার সব আয়োজন ব্যর্থ বলে মনে করব।' রবিবাবু বলল।

আমি বললাম, 'সে দেখা যাবেখন। এখন তুমি যাও। স্নান করে এসো। ছেলেমেয়েদের খিদে পেয়েছে।'

পরদিন আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলাম, বোলপুরের মুন্সেফবাড়িতে। একনাগাড়ে বৃষ্টি ছিল না। কিন্তু যখন পড়ছিল ঝুপঝুপ করেই পড়ছিল। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই যেতে হলো আমাদের। আমার যেতে মন চাইছিল না। শরীরটা বাগে নেই। দুমাস হলো আমার রজঃ বন্ধ হয়েছে। কথাটা রবিবাবুকে এখনো বলা হয়ে ওঠেনি। ঠিক করেছি, কথাটা আর চেপে রাখব না। বোলপুর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে সব খুলে বলব।

মুন্সেফবাড়িতে বিশাল আয়োজন। এলাহিকাণ্ড যাকে বলে। নানান পদের তরকারি। খাওয়াদাওয়া শেষে নারীমহলে অনেক গল্পগুজব করলাম। ফেরার সময় হলো। রবিবাবু তাড়া পাঠাল, দেরি হয়ে যাচ্ছে। শান্তিনিকেতনে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যাবে।

তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে গেল আমার। উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম আমি। পড়ে যাওয়া পর্যন্ত মনে ছিল আমার। পরবর্তী সময়ের কোনো কথাই মনে নেই। উপুড় হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

আমার যখন জ্ঞান ফিরল, আমি তখন শান্তিনিকেতনে। রবিবাবুর কাছে শুনলাম—অনেক কষ্টে আমাকে এখানে আনা হয়েছে। আমার প্রচুর রক্তস্রাব হচ্ছে। রবিবাবু নিজেই চিকিৎসা করছে আমার। তার চিকিৎসায় সামান্য সুস্থ বোধ করলে রথীকে কাছে ডাকলাম একদিন। বালিশের তলা থেকে লেখার খাতাটা বের করে তাকে দেখিয়ে বললাম, 'এখানে আমার একটি লেখা আছে। অল্প অল্প করে লিখেছি। যদি আমার কিছু হয়, রক্ষা করো খাতাটি। আর যদি আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়, খাতাটি সঙ্গে নিয়ে যেয়ো তুমি। কেউ যাতে টের না পায়।'

রথী নীরবে মাথা নাড়ল।

আমি আবার বললাম, 'আমার বালিশের নিচে রাখলাম খাতাটি। দেখে রাখো।'

AMARBOI.COM

শান্তিনিকেতনে আমার অসুখ ভালো হলো না। দিন দিন আমার অবস্থা খারাপের দিকে গেল। রবিবাবু ঠিক করল, আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবে।

সেই মোতাবেক আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা নেওয়া হলো। রথী ছাড়া অন্য সন্তানরা শান্তিনিকেতনেই থেকে যাবে—এটা রবিবাবুর সিদ্ধান্ত। ওরা আমার সঙ্গে আসুক—আমি মনেপ্রাণে চাইলাম। আকুতিভরা অনুনয় পাঠালাম তার কাছে। কিন্তু সে সম্মত হলো না। রথী আমাকে পরম যত্নে বোলপুর স্টেশনে আনল, সঙ্গে দ্বিপেন্দ্রনাথও ছিল।

রবিবাবু তখন কলকাতায়। রথী আর দ্বিপেন্দ্র আমাকে নিয়ে রওনা দিল, রেলে। শান্তিনিকেতন থেকে এই-ই আমার শেষ যাওয়া। মনে হতে লাগল—আমি আর কখনো শান্তিনিকেতনে ফিরে আসতে পারব না। আমার খুব করে মনে পড়তে লাগল গাছদের কথা, ছোট ছোট বিদ্যার্থীদের কথা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছায়াঢাকা মেঠো পথগুলোর কথা, অধ্যাপকবৃন্দের কথা। আমার হঠাৎ করে মনে পড়ল ভাদ্রের সেই বৃষ্টি ঝরা সকালের কথা। রবিবাবুর সেদিনের প্রণয় সম্ভাষণের কথা।

মাঝেমধ্যে অসুখের প্রকোপে আমি কাতর হয়ে পড়ছি। একটা ঘোর আমাকে ঘিরে ধরছে। আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর ঘোর কেটে যায়। চোখ খুলি। দেখি, রথী একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি দয়ার্দ্র চোখে তার দিকে তাকাই। একধরনের আতঙ্ক তার চোখেমুখে। শুয়ে শুয়েই সময় পার করে যাচ্ছি আমি। ওই অবস্থাতেই আমি রথীর ডান হাতটা নিজের দিকে টেনে নিই। কোমল কণ্ঠে বলি, 'ভয় পেয়ো না, বাবা।'

রথী আমার কথার কোনো জবাব দেয় না। আমার হাতের ওপর তার বাঁ হাতটা রাখে। বাইরে চোখ তার। তার চোখের সামনে দিয়ে কত তালগাছ, বুনো খেজুরের ঝোপ, কত বাঁশঝাড়ঘেরা গ্রাম দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে! একসময় উচ্ছ্বসিত গলায় সে বলে ওঠে, 'দেখো দেখো মা, মাঠের মাঝখানে একটা পুকুর। অসংখ্য পদ্মফুলে পুকুরের সব জল ঢেকে গেছে।' আমার মাথার নিচে হাত দিয়ে মাথাটা উঁচু করে পদ্মফুলের পুকুরটি দেখাতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে রথী।

আমি চাপা কণ্ঠে রথীকে জিজ্ঞেস করি, 'খাতাটি এনেছ তো, রথী?'

রথী ওপরে-নিচে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। আমি আশ্বস্ত হই। ভাবি, কলকাতায় পৌঁছে একটু সুস্থ হলেই আমার এই রেলভ্রমণের কথাগুলো লিখব।

আশ্বিনের শেষ শনিবারে আমি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পৌঁছাই। আমাকে রাখা হয় লাল বাড়ির দোতলায়। এটা রবিবাবুর নিজস্ব বাড়ি। দোতলার লম্বা ঘরটিকে আলমারির পার্টিশন দিয়ে তিনটি ঘরে পরিণত করা হয়েছে। সবচেয়ে শেষের ঘরে আমার ঠাঁই হয়। ঘরটি নিরিবিলি। কিন্তু হলে কী হবে, ও ঘরে হাওয়া খেলে না। লাল বাড়িটির সামনে গগনেন্দ্রনাথদের বিরাট অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে কোনো বৈদ্যুতিক পাখা নেই। তালপাতার পাখার বাতাসে কতটুকুই বা গায়ের যন্ত্রণা কাটে!

আমার অসুস্থতা সত্ত্বেও রবিবাবুর কর্মব্যস্ততা কমে না। যেদিন পৌঁছালাম ঠিক তার পরদিন সে গেল মজুমদার লাইব্রেরিতে আর বালিগঞ্জে। তার পরদিন গেল বৌবাজারে। ওসব জায়গা থেকে ফিরেটিরে আমার পাশে বসল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতপাখা করল, ওষুধ-পথ্যের খবর নিল।

তিন-চারজন অ্যালোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ নিয়মিত আমার দেখাশোনা শুরু করল। আমি কিছুটা আরাম বোধ করতে লাগলাম। শান্তিনিকেতন থেকে আসার তৃতীয় দিন দুপুরে রথীর কাছ থেকে খাতাটা চেয়ে নিলাম। কাঁপা হাতে মুন্সেফবাড়িতে আছাড় খাওয়া থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার কথা লিখে যেতে লাগলাম।

আজকের কথাই বলি—আজ রবিবাবু শান্তিনিকেতনে চলে গেল। শুনলাম নাটোরের মহারাজা শান্তিনিকেতন ভ্রমণে আসবেন। আমার অসুস্থতাকে আমলেই নিল না রবিবাবু। মহারাজাকে সঙ্গ দিতে শান্তিনিকেতনে চলে গেল সে।

কলকাতায় এসেছি মাস খানেক হয়ে গেল। আমার রোগ নিরাময়ের কোনো লক্ষণ দেখছি না। রক্তস্রাব বন্ধ হচ্ছে না আমার। বন্ধ হচ্ছে না বললে ভুল হবে, দু-তিন ঘণ্টা বন্ধ থাকে, বেঁচে থাকার আশায় যখনই বুক বাঁধি, তখনই স্রাব শুরু হয়ে যায়। যেদিন আমার একটু ভালো লাগে পেছনে বালিশ দিয়ে খাটে আধশোয়া করে রাখা হয় আমাকে। আমি বিছানার তলা থেকে খাতাটা বের করি। দুর্বল হাতে লিখতে থাকি আমার জীবনের কাহিনি।

এর মধ্যে মীরা-শমীদের আনিয়ে নেওয়া হয়েছে শান্তিনিকেতন থেকে। তাদের আমার পাশের ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

নাটোরের মহারাজাকে সঙ্গ দিয়ে রবিবাবু কলকাতায় ফিরে এসেছিল। আমি আশা করেছিলাম, এবার ধীরস্থিরভাবে সে আমার শয্যাপাশে বসবে। আমার সেবা না করুক, খোঁজখবর অন্তত নেবে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। কলকাতায় ফিরেই সে তার ভ্রাম্যমাণতা অব্যাহত রাখল। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, বৌবাজার, সুকিয়া স্ট্রিট, বাদুড়বাগান, পার্শিবাগান, রায়বাগান, রাজাবাগান, জোড়াপুকুর, বিডন স্ট্রিট—এসব জায়গায় রবিবাবু দিব্যি ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমার সেবার জন্য সে অবশ্য এর মধ্যে একজন ভাড়াটে শুশ্রূষাকারিণী রেখে দিয়েছে।

আমার দিকে তেমন করে নজর রাখতে না পারলেও শমীর লেখাপড়ার দিকে কড়া নজর ছিল রবিবাবুর। পড়ার ক্ষতি হচ্ছে—এই অজুহাতে শমীকে সুবোধচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিল সে। আমার মন অশান্ত হয়ে উঠল। আমি কিন্তু বাইরে অশান্ত ভাব দেখালাম না। চুপচাপ শয্যা নেব বলে ঠিক করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আমার জীবনের শেষ কথা লিখে যেতে চাই। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। আমার দেহ, আমার আঙুল আমাকে সহযোগিতা করছে না। আমার আঙুল গুটিয়ে আসছে। হয়তো আজকের পর আমি আর লিখতেও পারব না। শরীরে প্রচণ্ড দাহ। ঘুম আসে না। কোনো ওষুধেই কিছু হচ্ছে না আমার। এই সময় ঠাকুরবাড়ির নানা কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। শ্বশুরঠাকুর, সন্তানরা, জ্ঞানদা বউদি, নতুন বউঠান—এঁরা একে একে আমার চোখের সামনে দিয়ে হাঁটাচলা করছেন। অনেকের কথা আমার মনে এসে বাজছে। বারবার ঘুরেফিরে আসছে রবিবাবু।

আমার প্রাণের দেবতা রবিবাবু। আমার সন্তানের জনক হিসেবে, দেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসেবে আমি তাকে শ্রদ্ধা করে এসেছি আজীবন। সে আমার স্বামী, কিন্তু প্রেমিক স্বামী নয়। তার শরীরের কিয়দংশের ওপর আমার অধিকার ছিল, সম্পূর্ণত নয়। তার মন পড়ে ছিল অন্য নারীতে। সবকিছু বুঝেও আমি প্রতিবাদ করতাম না। মৃণালিনী হয়ে তার ঘর করে গেছি আমি; কিন্তু তার হৃদয়ে মৃণালিনী স্থান পায়নি। দ্রোণাচার্য যেমন গুরুদক্ষিণা হিসেবে একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙুল কাটিয়ে নিয়েছিলেন, আমার স্বামী রবীন্দ্রনাথও আমার ভবতারিণী নাম, যেটায় আমার মৌলিক অধিকার ছিল, সেটা কেড়ে নিয়ে মৃণালিনী নামটি লেপ্টে দিয়েছিল আমার গায়ে। কিন্তু ওই নাম পাল্টানোতেই সারা, ও নামে কখনো রবিবাবু আমাকে সম্বোধন করেনি। এই বেদনা লুকোবার জায়গা নেই আমার। সারাটা জীবন রবিবাবুর মনোতুষ্টিতে কাটল আমার। আমার ভালো লাগার দিকে দৃকপাত করেনি কখনো সে। এই মুহূর্তে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে—আমি মৃণালিনী নই, আমি ভবতারিণী। রবিবাবুর স্ত্রী ছাড়াও আমার নিজস্ব একটা সত্তা ছিল, সেই সত্তার প্রতি রবিবাবু কোনো দিন সুবিচার করেনি।

আমার হাত নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছে। লেখা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমি খাতাটা বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখছি। আমি চাই না, আমার এ লেখা রবিবাবু পড়ুক। আমি জানি, আমার মৃত্যুর পর রথী আমার এই খাতা খুঁজে বের করবে।

রথী, তোমাকে অনুরোধ করছি, এই খাতাটি তুমি নিজের করে রাখবে। যেদিন মন টানবে সেদিন এটা খুলে তোমার দুঃখিনী জননীর জীবনকাহিনি পড়বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রথীর কথা

আমার মা ভবতারিণী দেবীর মৃত্যু হয়েছে তিন দিন আগে। প্রায় দশ বছর বয়সে মা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এসেছিল। সতেরো দিন কম উনিশ বছর দাম্পত্য জীবন যাপনের পর মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে মা মারা গেল। রবিবার দিন রাতে মা তার সকল বাৎসল্য আমাদের জন্য এই পৃথিবীর কাছে জমা রেখে অপার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হতে হতে মারা গেল। আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মা খুব উদ্বিগ্ন ছিল। বাবার অনেকটা যাযাবরের জীবন। তার অবর্তমানে আমাদের যত্ন-আত্তিতে ঘাটতি হবে—এ কথা মা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। বড় দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। আমার বয়স চৌদ্দ, ছোট বোন মীরা আট আর ভাই সাড়ে পাঁচ বছরের। আমাদের দেখাশোনা করবে কে? এক দুপুরে রাজলক্ষ্মী দিদিমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল মা। অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে দিদিমার হাত ধরে বলেছিল, 'পিসিমা, আমি শয্যাগত। বাঁচব কি না, জানি না। ছেলেমেয়েদের বড় কষ্ট হবে। মীরা আর শমী শিশু মাত্র। আপনি তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিন, পিসিমা! আপনি তাদের দায়িত্ব নিলে শান্তিতে মরতে পারব আমি।'

রাজলক্ষ্মী দিদিমা বলেছিলেন, 'তুমি চিন্তা কোরো না। তোমার সংসারের ভার আমি নিলাম।'

স্বস্তিতে মা চোখ বুজেছিল।

AMARBOI.COM

মৃত্যুর রাতেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল মায়ের। মাত্র আটাশ টাকা দুই পয়সা খরচ করা হয়েছিল তার দাহকার্যে। মুখাগ্নি করার দায়িত্ব বাবার। বাবা অসম্মতি প্রকাশ করলে আমার। অবিশ্বাস্যভাবে বাবা মায়ের মুখাগ্নি করতে অস্বীকৃতি জানাল। আমি আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বাবাকে বললাম, 'তাহলে বাবা, আমি যাই শ্মশানে? মায়ের মুখাগ্নি আমি করি?' বাবা কঠোর কণ্ঠে বলেছিল, 'তোমাকে শ্মশানে যেতে হবে না।'

অথচ বাবা তার মায়ের মৃত্যুতে শ্মশানে যাবার অধিকার পেয়েছিল। মায়ের মতো রাতেই সারদা ঠাকুমার মৃত্যু হয়েছিল। গভীর রাতে আমার চৌদ্দ বছরের বাবা শ্মশানযাত্রী হবার অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু তার মনগড়া আইনের কারণে আমি মায়ের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলাম।

মৃত্যুর দিন তিনেক আগে মায়ের খাতাটি আমি হস্তগত করতে পেরেছিলাম। তার সঙ্গে আমাদের দেখা করার ব্যাপারে বাবার কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সুযোগ খুঁজছিলাম—মায়ের কাছে যাওয়ার। সেই বিকেলে বাবা কী একটা কাজে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল। আমি মায়ের শয্যাপাশে গিয়ে বসেছিলাম। ওই সময়, মা জড়ানো কণ্ঠে বলেছিল, 'রথী, বিছানার নিচে খাতাটা...।' যন্ত্রণার তোড়ে আর কিছু বলতে পারেনি মা। আমি মায়ের অভিপ্রায় বুঝে গিয়েছিলাম। বিছানার তলা থেকে খাতাটা নিয়ে আমি লুকিয়ে ফেলেছিলাম।

আজ সকালে মায়ের লেখা খাতাটা নিয়ে বসেছি। এক বসায় পড়ে ফেললাম। চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে। এত বেদনার ঝড় বুকে চেপে মা এত দিন বাবার ঘর করে গেল! আমার মহৎ বাবা কী নিদারুণ অবিচারটাই না করেছে মায়ের ওপর!

এই সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে গেল। মা তখন আধা চেতন আধা অচেতনের মধ্যে। আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শুনলাম, মা বাবাকে অস্ফুট স্বরে বলছে, 'আমার শমী কোথায়? তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো।'

বাবা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মীরারা আছে পাশের ঘরে। শমী শান্তিনিকেতনে। আমি তাকে আনিয়ে নিচ্ছি। তুমি একটু ধৈর্য ধরো। মন শান্ত করো। তুমি একটু সুস্থ হয়ে ওঠো। তারপর তোমার ছেলেমেয়েদের তোমার কাছে নিয়ে আসব।'

আমি বুঝতে পারছিলাম না, পাশের ঘরে থাকা সত্ত্বেও কেন মীরাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছে না বাবা? কেনই বা আমার মায়ের ঘরে যাওয়া নিষেধ? মায়েদের অসুখ হয় না এই পৃথিবীতে! তাই বলে অসুস্থ মায়ের শয্যার কাছে সন্তানদের যেতে নেই?

মা ছটফট করে আর বাবা বারবার আশ্বাস দেয়, 'আনব আনব। ওদের আমি তোমার সামনে আনব। তোমার এসব আগে বন্ধ হোক।' বিছানার চাদরের দিকে আঙুল তুলে বাবা কিসের যেন ইঙ্গিত করে। আমি বুঝতে পারি না।

বাবার কণ্ঠ আবার শুনতে পাই, 'তুমি একটু ঘুমাবার চেষ্টা করো। ঘুমালে আরাম পাবে। উৎকণ্ঠা কেটে যাবে।'

মা কোঁকানো গলায় বলে, 'তুমি বলছ ঘুমাও ঘুমাও। ঘুমকে ডাকলে কি ঘুম আসে! আমার শমী-মীরা চোখের আড়ালে। তাদের দেখতে চাই আমি, অথচ তুমি তাদের আমার ঘরে আনছ না। তুমি তাদের আমার সামনে নিয়ে আসো গো। আমি তাদের শেষবারের মতন চোখের দেখা দেখতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার শমী, আমার মীরা, আমার... ।'

মায়ের কণ্ঠ মিলিয়ে যায়। বাবার জবাব আমি শুনতে পাই না। উঁকি দিয়ে দেখি, বাবা বাঁ হাত দিয়ে পাখা করতে করতে ডান হাতে মায়ের চুলে বিলি কাটছে। তার চুলে বাবার ফরসা আঙুলগুলো সঞ্চরমাণ দেখে আমার খুব ভালো লাগে।

মায়ের অসুখের বাড়াবাড়ি দেখে শমীকে শান্তিনিকেতন থেকে আনিয়ে নেয় বাবা। মজঃফরপুর থেকে আসে বেলা। কিন্তু বাবার ধনুকভাঙাপণ—এই মুহূর্তে সন্তানরা মায়ের কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না।

মৃত্যুর আগের দিন বাবা আমাকে মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার শয্যাপাশে বসবার অনুমতি দিল। মা তখন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আমাকে দেখে তার দুচোখ থেকে অশ্রুধারা বইতে লাগল। হঠাৎ তার ঠোঁট নড়ে উঠল। একটা অস্ফুট শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'শ— ।'

মা কাকে চাইছে আমি স্পষ্টত বুঝতে পারলাম, বাবার বুঝতে না পারার কোনো কারণ নেই। আমি চকিতে বাবার দিকে তাকালাম। দেখলাম, তার চোখেমুখে কঠোরতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সেই প্রাচীরে মায়ের আকুতি আছড়ে পড়ছে। অনড় সে প্রাচীর। বাবা নির্লিপ্ত চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ বাবা আমাকে বলে, 'যাও রথী, মায়ের পাশে আর বেশি সময় বসার দরকার নেই।'

আমার মন চাইল—মায়ের পাশে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতে। অশেষ এক বেদনায় আমার চোখ দিয়ে বারবার অশ্রুর ফোঁটা বেরিয়ে আসতে চাইছিল। অব্যক্ত গভীর কষ্ট আমাকে ক্লিষ্ট করছিল। আমি আমার ভেতরে মৃদু কম্পন অনুভব করতে লাগলাম।

বাবা আবার তাড়া দিল, 'রথী, ও ঘরে যাও। হাতেমুখে জল দাও।'

বাবার আদেশ লঙ্ঘন করার শক্তি আমার নেই। আমি মায়ের ডান হাতটা গভীর এক মমতায় স্পর্শ করি। মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি আমি।

মায়ের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। আমি সৌভাগ্যবান। আমার তুলনায় মীরা-শমী দুর্ভাগা। মায়ের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সুযোগটুকুও বাবা তাদের দেয়নি।

যে রাতে মা মারা যাবে, সেই রাতে বাবা আমাদের ভাইবোনদের সবাইকে পুরোনো বাড়ির তেতলায় পাঠিয়ে দিল। একটা করাল আশঙ্কা আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘিরেবেড়ে ধরল সে রাতে।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হলো। তাকিয়ে দেখলাম, ভাইবোনেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু আমার চোখে ঘুম নেই।

রাতের আঁধার সবে কাটতে শুরু করেছে। আবছা আঁধার থাকতে থাকতেই বারান্দায় গেলাম। বারান্দার শিক ধরে গভীর মগ্নতায় লাল বাড়িটির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলাম। ও বাড়িতে যে আমার জননী আছে!

কোনো সাড়াশব্দ নেই সে বাড়ির দোতলায়। নিঝুম-নিস্তব্ধতা লাল বাড়িটাকে যেন গিলে খাচ্ছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~